রাজা ভট্টাচার্য
বাল্মীকির রামায়ণে নেই

বাল্মীকির রামায়ণে নেই

রাজা ভট্টাচার্য

বাল্মীকির রামায়ণে নেই

পত্রভারতী®

বৈবাহিক সূত্রে প্রাপ্ত
বাবা এবং মাকে...

অস্তি কশ্চিৎ বাগবিশেষঃ...

একটু বিশেষ কথা ছিল...

'একালে দাঁড়িয়ে যে-কোনও সুস্থবুদ্ধির লোক এমনতর বই লিখতে পারে—দেখলেও প্রত্যয় হয় না!'—নিদেন বারো-আনা নিশ্চিত হয়ে বলা যায়, এই বইয়ের রকমসকম দেখে এই কথাই ভাবছেন আপনি।

এর কারণ দ্বিবিধ।

প্রথমত, রাম ইদানীং সর্বাধিক চর্চিত বিষয় হয়ে উঠেছেন বটে, কিন্তু সেই চর্চার পিছনে যতখানি আবেগ আছে, ততখানি জিজ্ঞাসা নেই। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র নয়, বিশুদ্ধ ভক্তির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেই তিনি বর্তমানে পরিগণিত হচ্ছেন। তাতে রামায়ণ সত্যিই অশুদ্ধ হয় না; কারণ এর সূত্রপাত ঘটে গিয়েছিল অতি প্রাচীন কালেই। আড়াই হাজার বছর আগেই রচিত হয়ে গিয়েছিল দশরথ-জাতক। বাল্মীকি থেকে কৃত্তিবাস ওঝা হয়ে তুলসীদাস পর্যন্ত সেই ধারাই ক্রমে বেগবান হতে হতে আজকের রূপ ধারণ করেছে। অবতার-প্রথা আমাদের মর্মে মর্মে; এবং এর মধ্যে দোষাবহ কিচ্ছু নেই। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

দ্বিতীয়ত, প্রবন্ধের যে ধরনটি বাংলাভাষী পাঠককে সবলে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, তার একটি প্রধান কারণ তার ভাষা। এই বইয়ে সচেতনভাবেই সেই বিচিত্র শৈলীকে পরিহার করা হয়েছে। কাজেই, আমাদের আজকের দিনের সদাগম্ভীর গূঢ়নক্র প্রাবন্ধিক চলন এই বইয়ে মিলবে না। যে সরল ভাষা এককালে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু থেকে সৈয়দ মুজতবা আলির হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল—আভিপ্রায়িক ভাবেই এই বইয়ে তার অক্ষম অনুসরণ করা হয়েছে। সারল্য, আমার মতে, সাহিত্যের প্রাণ।

কাজেই, এই বই পড়তে বসে দ্বিবিধ দ্বিধার সম্মুখীন হচ্ছেন আপনি—মাননীয় পাঠক!

কিন্তু কথা হল, বই লিখতে বসে সহসা এমন মুখবন্ধের কারণ? এ কি কৈফিয়ত?

উহুঁ! আদৌ নয়!

আমরা এমনিতেই সহজলভ্য জ্ঞানের সময়কালে বাস করছি। মূল গ্রন্থের পরিবর্তে তার সহায়ক গ্রন্থ আমাদের কাছে এখন ঢের বেশি মূল্যবান হয়ে উঠেছে। আর এক সমস্যার উদয় হয়েছে সম্প্রতি। নেটে সার্চ করলে, উইকিপিডিয়ার পাতা খুললে সব জানা যায়—এমন একটি ভ্রান্ত ধারণা হালে এমনি চাউর হয়ে গেছে যে, কেউ মোটকা বই নিয়ে বসেছে দেখলে আমরা হাসতে থাকি।

মুশকিল হল, ওই মোটাসোটা বইগুলো এমন কিছু গুহ্য বৃত্তান্ত জানে, যা অন্যত্র অলভ্য। একেবারে অলভ্য। কাজেই আমাদের জ্ঞান আসলে পল্লবগ্রাহিতায় পর্যবসিত হচ্ছে, এবং আমরা সেটি টের পাচ্ছি না। বইয়ের নামে ছাপিয়ে-ফেলা উইকি-সমগ্র আমাদের মনোহরণ করে আমাদের পল্লবগ্রাহিতাকে সম্মানিত করে তুলছে। এর ফলে জ্ঞানসাগরের তীরে নুড়ি-টুড়ি বাদ দিন—বালুকণা কুড়োনোও বেশ কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

রামায়ণ এক অতি প্রাচীন বৃত্তান্ত। হাজার হাজার বছর ধরে, শতেক যুগের কবিদল মিলি' তাতে নিজের নিজের অভিপ্রায় নিক্ষেপ করে এসেছেন। গোটা উত্তরকাণ্ডটাই গড়ে উঠেছে অমন করে, পরবর্তী যুগের লেখক ও শ্রোতা-পাঠকের অভিপ্রায় সিদ্ধ করার মানসে। তার উপর পলি ফেলেছেন আরও পরবর্তী কালের অনুবাদকেরা। ফলে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে এক আশ্চর্য পুরুষের অপার্থিব কর্মোদ্যোগ—এক কালে যা জাপান থেকে জাভা, হিমাচল থেকে মন্দার পর্বত পর্যন্ত তামাম মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। তিনি পুরুষ থেকে পরমপুরুষ হওয়ার পথে যতই অগ্রসর হয়েছেন, ততই আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছেন। আদর্শ হওয়ার সকল গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি অবতারে পর্যবসিত হয়েছেন। তাঁর বিপুল কর্মক্ষমতা আমাদের কাছে নিছক লীলা হয়ে উঠেছে। ফলে তিনি আর অনুকরণীয় মানুষ থাকলেন না। হয়ে উঠলেন পূজ্য দেবতা! আমরা ভুলে গেলাম, কথায় কথায় যে বইটির উল্লেখ করি আমরা, সেই বাল্মীকি-রামায়ণে স্বয়ং রামই স্পষ্ট জানিয়েছেন—তিনি দেবত্বে আগ্রহী নন। তিনি দশরথের পুত্র। *'আত্মানং মানুষং মন্যে রামং*

দশরথাত্মজং।' একজন সাধারণ মানুষ, যিনি অসাধারণ গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে দৈবকে অতিক্রম করার ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন। তিনি পথদ্রষ্টা। কিন্তু দেবতা নন!

সেই 'মানুষ' রামের বৃত্তান্তই এই বইয়ের উপজীব্য। কীভাবে তিনি ক্রমে আরোপিত দেবত্বের পিছনে ক্রমে অদৃশ্য হলেন—তাও। তাঁর অবগুণ আড়াল করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি বাল্মীকি—এই দেশ যাঁকে আদিকবির সম্মানে ভূষিত করেছে শ্রদ্ধাভরে। নইলে অন্তরাল থেকে বালীকে বধ করার বৃত্তান্ত লিখতেনই না বাল্মীকি! লিখতেন কোনও অলৌকিক ঘটনা—যা দেখে মুগ্ধ চমকিত বানরেরা তাঁকে স্বয়ংবৃত হয়ে সাহায্য করত সীতাকে উদ্ধার করার কাজে। তেমন কোনও চেষ্টাই করেননি বাল্মীকি!

রাবণ স্বয়ং যমকে যুদ্ধে হারিয়েছিলেন। আর রাম সেই রাবণকে। ঈশ্বরের বিন্দুমাত্র সাহায্য ছাড়াই। সেই মহাবীর, মহান যোদ্ধা রামকে খুঁজে বেড়িয়েছে এই বই—এইটুকুই তার গৌরব।

শুধু রাম নয়। সীতা, লক্ষ্মণ, হনুমান, শূর্পণখা, এমনকী রাবণ—এমনি করেই যুগে যুগে বদলে গিয়েছেন অনুবাদকদের অঙ্গুলিসংকেতে। যোগ দিয়েছেন তরণীসেন, বাদ পড়েছেন ভগ্নদূত অকম্পন। মাইকেল লক্ষ্মণের ললাটে গুপ্তহত্যার কলঙ্ক লেপন করেছেন, কৃত্তিবাস হনুমানকে দিয়ে রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ করিয়ে আসলে রামের বীরত্বের গৌরবই হরণ করেছেন। সেইসব বদলের পথ ধরে পিছন-পানে হাঁটা দিলে যুগবদলের ইঙ্গিত বোঝা যাবে—সেটাই স্বাভাবিক। এই বইয়ে সেই নিতান্ত স্বাভাবিক কাজটুকুই করার চেষ্টা করা হল। বলা যায়—রামায়ণের উপর যুগে যুগে কালের যে পদচিহ্ন পড়েছে, এই বই সেই চিহ্নকেই অনুসরণ করেছে।

আগাগোড়া বাল্মীকি-রামায়ণে কোত্থাও রামচন্দ্র বা শ্রীরাম শব্দটিই নেই—এ-ও কী যুগ-পরিবর্তনেরই ইঙ্গিতবহ নয়?

আমি বিশ্বাস করি, অন্তর থেকে বিশ্বাস করি—আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে একজন **রাম**, আর একজন **রাবণ** আছে। আমাদের ভিতরের রাম যেদিন আমাদের ভিতরের রাবণকে সম্মুখযুদ্ধে বধ করতে পারবে, সেইদিনই আমরা পূর্ণরূপে মানুষ হয়ে উঠতে পারব। মানুষের মতো মানুষ।

শেষে বলি—এই বইয়ের সূত্রপাত ঘটেছিল দুই কনিষ্ঠ বন্ধুর হাত ধরে। প্রিয়ম সেনগুপ্ত এবং শেখর দুবে। রাজনৈতিক মতামতের দিক দিয়ে একেবারে নিখুঁত বৈপরীত্যের প্রতীক, অথচ পরস্পরের গুণগ্রাহী এই দুই তরুণ সাংবাদিক বন্ধুকে আমার আন্তরিক নমস্কার জানাই।

প্রণাম জানাই শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীকে। তিনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন নিজের অজান্তে—ভক্তি আর জ্ঞানচর্চায় কোনও বৈরীতা নেই। পরম ভক্তি অন্তরে রেখেও আলোচনা করা যায় নিস্পৃহতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রেখেই। এই মহাপণ্ডিত অথচ স্নেহপরায়ণ মানুষটি যদি এক পুণ্যদিবসে বাল্মীকি-রামায়ণের মূল গ্রন্থটি আমার হাতে তুলে না-দিতেন—তাহলে এই বই লেখারই বিন্দুমাত্র প্রশ্ন উঠত না।

শেষ কথা এই—এই বইয়ে আলোচিত হল কেবল উত্তর ভারতে অত্যধিক প্রচলিত কয়েকটি রামায়ণ-ধারারই চলনরেখা। এমন অজস্র রেখা প্রচলিত আছে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে; এমনকী তার বাইরেও। সেই অতিবৃহৎ ক্ষেত্রের এমন সরল, কিন্তু দূরমনস্ক আলোচনার সুযোগ কিন্তু থেকেই গেল অপেক্ষায়—কোনও সত্যকারের পণ্ডিত এগিয়ে আসবেন একটি সোনার কলম নিয়ে; যাতে আমাদের মতো সাধারণ পাঠকেরাও তা পড়ে বুঝতে পারি। আভিধানিক দুরুচ্চার্য শব্দ, আর বিচিত্র বাক্যগঠনের ঊর্ণনাভের আড়ালে আত্মগোপন না-করে তিনিও আমাদের সঙ্গী হবেন জ্ঞানের জগতে।

মনুষ্যমাত্রেরই দুইটি কর্ণ থাকে, নিদেনপক্ষে থাকা উচিত—নইলে লোকে কানকাটা বলে। পত্রভারতীরও দুইজন কর্ণধার আছেন। সেই দুই কর্ণধার ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় ও চুমকি চট্টোপাধ্যায়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের প্রত্যক্ষ উৎসাহ না-থাকলে এই বই লেখার সাহসই হতো না এই অধমের।

কালিদাস উদ্বাহুরিব বামনঃ লাফালাফি করতে বারণ করে গেছেন। এই বই অনেকটাই সেই জাতীয়। তা হোক, আপনারা সেই লাফালাফিকে প্রশ্রয় দিলেই আমি ধন্য হব।

অলমিতি।

রাজা ভট্টাচার্য

মধ্যমগ্রাম
২০২০।

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।।

যতদিন এই পৃথিবীতে নদী ও পর্বত থাকবে,
ততদিন মর্তলোকে রামকথা প্রচারিত হবে।

লেখকের অন্য বই
দ্বারকানাথ। পরাধীন দেশের রাজপুত্র

সূচিপত্র

বাল্মীকির উৎস-সন্ধানে

'নারদ কহিলা হাসি, "সেই সত্য, যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।" '

রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার এই পংক্তিগুলি মুখস্থ নেই—এমন বাঙালি বিরল। ছোটগল্পের সংজ্ঞা হিসেবে মুখস্থ করে রাখা সেই অতিখ্যাত পংক্তিগুলির মতোই ('ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা' ইত্যাদি) এই পংক্তিগুলিরও প্রসঙ্গক্রম বর্তমানে অস্পষ্ট হয়ে গেছে ; বড়জোর নারদের নামোল্লেখ থেকে মনে হতে পারে—সম্ভবত এর কোনও পৌরাণিক সংযোগ থাকতেও পারে। কবি হিসেবে কাকে সম্বোধন করা হচ্ছে, তাও জানা যায় না এই খণ্ডিত অংশটি থেকে। আদিকবির উত্থানের প্রথমতম দৃশ্যটি থেকে যে বিশ্বকবি কাব্যসৃষ্টির মূল তত্ত্বে পৌঁছতে চাইছেন, তা সম্পূর্ণ কবিতাটি না-পড়লে বোঝা অসম্ভব।

কিন্তু এটুকু আমরা সব্বাই জানি—রত্নাকরই 'মরা মরা' জপ করতে করতে শেষে রামনাম করে উঠেছিলেন, আর সেই পুণ্যবলেই হয়ে উঠেছিলেন মহর্ষি (এবং পরবর্তীতে আদিকবি) বাল্মীকি। আমাদের আশ্চর্য সরল এবং বিশ্বাসপ্রবণ মস্তিষ্ক এটুকুও জিজ্ঞাসা করতে চায় না—সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ রচনা করা বাল্মীকি সহসা নিতান্ত কেজো বাংলায় 'মরা' শব্দটা বলে উঠলেন কেন? 'মৃত' নয়, একেবারে 'মরা'! বাল্মীকি বাংলাভাষা জানতেন বুঝি?

আজ্ঞে না, দস্যু রত্নাকরের বৃত্তান্তও আরও অনেককিছুর মতোই 'বাল্মীকি রামায়ণ'-এ নেই। এই গ্রন্থের শুরুতেই তাই বলে দেওয়া হয়—একদিন মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি দেবর্ষি নারদকে এক আশ্চর্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। লক্ষ্য করুন—একেবারে প্রথম শ্লোকেই বাল্মীকির বিশেষণ 'মুনিপুঙ্গব'। *'তপঃস্বাধ্যায় নিরতং তপস্বী বাগ্বিদাং বরম্। নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকিমুনিপুঙ্গবম্।'* এই সেই প্রশ্ন—যার বীজ থেকেই জন্ম নেবে 'রামায়ণ'

নামের বিশাল ও বিপুল মহাবৃক্ষ। কিন্তু সেই কাহিনির মধ্যে বাল্মীকির পূর্বাশ্রমের চিহ্নমাত্র নেই। তিনি এক প্রখ্যাত মুনি; দেবর্ষি ও দেবতাদের সঙ্গে যাঁর নিত্যিনিত্যি সাক্ষাৎ হয়।

তাহলে, এই রত্নাকরটি কে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের দ্বারস্থ হতে হবে কৃত্তিবাসের। হুবহু বাল্মীকির মতোই সংক্ষেপে রামায়ণের সমস্ত কাহিনি বলে নিয়ে গ্রন্থারম্ভ করেছেন কৃত্তিবাসও। তারপরেই তিনি আপন পৃথক পথ ধরেছেন। শিবের কথায় নারদ ও ব্রহ্মা খুঁজে বের করলেন এক মহাপাপীকে। রত্নাকর। 'চ্যবনমুনির পুত্র, নাম রত্নাকর। দস্যুবৃত্তি করে সেই বনের ভিতর।' দেবতা ও দেবর্ষি মিলে এলেন তাকে পরীক্ষা করতে। তাঁদের আঘাত করতে গিয়ে রত্নাকরের উদ্যত মুগুর হাতেই রয়ে গেল। ব্রহ্মা তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, সন্ন্যাসী-হত্যার ফল কী ভয়ানক হতে পারে! তারপর শুধোলেন সেই অমোঘ প্রশ্ন—'তোমার এ পাতকের কে হইবে ভাগী?' এই মহাপ্রশ্নের উত্তর খুঁজতে রত্নাকরকে যেতে হল তার বাড়িতে; এবং তার বাপ-মা-স্ত্রী—সকলেই নানান ন্যায্য কারণ দেখিয়ে সেই ভীষণ পাপের ভাগ নিতে অস্বীকার করল। এইবার বিচলিত রত্নাকর ব্রহ্মাকেই জিজ্ঞাসা করল পাপের এই অনন্ত সমুদ্র থেকে পরিত্রাণের উপায়। ব্রহ্মা তাকে রামনাম করতে বললেন। অসাড় পাপী জিহ্বা সেই পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে পারল না। তখন 'মরা মরা' বলতে বলতে রামনাম বলে উঠল মহাপাপী দস্যু রত্নাকর। ষাট হাজার বছর সেই নাম জপ করতে করতে রত্নাকর হয়ে উঠলেন মহর্ষি; বল্মীকের স্তূপ থেকে তাকে উদ্ধার করে ব্রহ্মাই তাঁর নামকরণ করলেন বাল্মীকি। ইনিই পরবর্তীতে ব্রহ্মার আদেশে এবং বরে রামকাহিনি মর্তলোকে প্রচার করে হয়ে উঠলেন আদিকবি।

এখন সমস্যাটা হল—বাল্মীকিরচিত রামায়ণে যদি স্বয়ং কবিই কোনও আত্মপরিচয় না-দিয়ে থাকেন, তাহলে কৃত্তিবাস এই পূর্বাশ্রমের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করলেন কোন সূত্রে? এটিও কি আরও বেশ কিছু কাহিনির মতোই তাঁর স্বকপোলকল্পিত?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের পাড়ি দিতে হবে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে। স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে আছে এক বিচিত্র কাহিনি। আসুন, সেই গল্পটাও সাদামাটা বাংলায় পড়ে ফেলি এবার।

প্রাচীনকালে সুমতি নামের এক ভৃগুবংশজাত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর এক অবাধ্য পুত্র ছিল, তার নাম অগ্নিশর্মা। বেদপাঠে তার মন ছিল না। এমন সময় দেশে ভয়ানক খরা হল। সপরিবারে দেশত্যাগ করে এক অরণ্যে এসে আশ্রম নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন সুমতি। জঙ্গলে আভীর দস্যুরা বাস করত, তাদের সঙ্গে অগ্নিশর্মার বন্ধুত্ব হল। অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ—অগ্নিশর্মাও অভাববশত দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করল। একদিন সপ্তর্ষিরা ওই বনপথে তীর্থে যাচ্ছিলেন। অগ্নিশর্মা তাঁদেরও হত্যা করতে গেল। মহর্ষি অত্রি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন সেই একই প্রশ্ন—তার এই পাপের ভাগী কারা হবে? অগ্নিশর্মা পিতা-মাতা-দারা-সুতের কথা বলল। *'মমান্তি মাতাঞ্চ পিতা সুতো ভার্য্যা গরীয়সী।'* যথারীতি তাঁরা পাপভাগ নিতে অস্বীকার করলেন। তখন অত্রির উপদেশে অনুতপ্ত অগ্নিশর্মা অগ্নির ধ্যান করতে লাগল। তেরো বছর পর সেই সপ্তর্ষিই ফিরে এসে বল্মীকের স্তূপ থেকে তাকে উদ্ধার করে নাম দিলেন বাল্মীকি। তারপর কুশস্থলীতে গিয়ে শিবের উপাসনা করে বাল্মীকি আয়ত্ত্ব করলেন কবিত্বশক্তি। রচনা করলেন রামায়ণ।

এরপর আর বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কৃত্তিবাস রত্নাকর-বৃত্তান্তটি গ্রহণ করেছেন এইখান থেকেই। পুরাণ আছেই যুগে যুগে নব নব রূপে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য; কাজেই নীচে (সংগৃহীত) লিখে পরের বস্তু আত্মসাৎ করার প্রশ্ন এক্ষেত্রে উঠছেই না। কিন্তু দু-একটি অন্য প্রসঙ্গ তবুও নাছোড়বান্দা, তারা থেকেই যায়।

কৃত্তিবাস কোনও কৈফিয়ত না-দিয়েই খুলে দেন তাঁর কাহিনির উৎসমুখ, এবং তা দু'টি পরস্পরবিরোধী তথ্যের মাধ্যমে। 'চ্যবনমুনির পুত্র, নাম রত্নাকর' কেন দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করল, তার কোনও উপযুক্ত কারণ দেখান না তিনি। 'আহা, মধ্যযুগীয় কবি কি আর তোমার মতো সোশালিস্ট রিয়েলিজম পড়েছেন বাছা?'—ইত্যাদি তর্ক তোলা যেতেই পারে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, স্কন্দপুরাণের প্রাচীনতর কবিটি এ ভুল করেননি। অশিক্ষা এবং দুর্বিনীত স্বভাব অগ্নিশর্মাকে উপযুক্ত আধারে পরিণত করে রেখেছিল। দুর্ভিক্ষজনিত অন্নাভাব

তাতেই ঘৃতাহুতি দান করল। ফলে ঋষিপুত্র হয়েও তার পক্ষে দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করা স্বাভাবিক হয়ে উঠল। দ্বিতীয়, অগ্নি এবং শিবের উপাসনার স্থানে কৃত্তিবাস নিয়ে এলেন শুধু রামকে। না! রাম নয়। রামনাম। রামনামের পারম্য দেখানোর জন্যই কৃত্তিবাস সজ্ঞানে বদলে দিলেন গোটা কাহিনির ভরকেন্দ্র—'রামনাম জপ ভাই অন্য কর্ম পিছে। সর্ব ধর্ম কর্ম রামনাম বিনা মিছে।' এর ফলে সমস্ত রামায়ণেরই ভরকেন্দ্র বদলে গেল। আর্যবীর রামের অতুলনীয় বীরত্ব এবং চারিত্র্যবলের কাহিনি হয়ে উঠল রামনামের মহিমাপ্রচারের কাহিনি। সেই কথা প্রচারিত হয়ে চলবে সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ জুড়েই। তারই অগ্রদূত হিসেবে জুড়ে দেওয়া হল রত্নাকরের কাহিনি—কেমন করে দস্যু রত্নাকর ষাট হাজার বছর ধরে শুধু রামনাম জপ করেই হয়ে উঠলেন আদিকবি বাল্মীকি।

অনিবার্যভাবেই আমাদের মনে পড়তে বাধ্য নবদ্বীপের সেই গৌরবর্ণ সন্ন্যাসীর উপদেশ—'একবার কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে। মানুষের সাধ্য নাই তত পাপ করে।' দেখা যাচ্ছে, নামের মহিমাপ্রচার বঙ্গদেশে শুরু হয়ে গিয়েছিল মহাপ্রভুর বহু আগেই! তা করে গিয়েছিলেন কৃত্তিবাস; আর তার জন্য তাঁকে বদলে দিতে হয়েছিল রামায়ণের মূল কাঠামোটিকেই!

আর, কী আশ্চর্য, বাল্মীকির আত্মকথন হিসাবে আমাদের চেতনায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জুড়ে-থাকা এই রত্নাকর-বৃত্তান্তটিই কিনা বাল্মীকি-রামায়ণে নেই!

রাম না-জন্মাতেই রামায়ণ

এক-একটা ঘটনা, হয়তো তেমন কিছুই নয়—মনের মধ্যে সম্পূর্ণ অকারণে থানা গেড়ে বসে যায়। তখন আর তার হাত থেকে রেহাই নেই।

বড় পরিবারে জন্মগ্রহণ করার অজস্র বড় বড় অসুবিধে আছে। অনেকের ধমক খেতে হয়, অনেক কানমলা খেতে হয়। সেসব ঠিকই। কিন্তু কয়েকটা মস্ত সুবিধেও আছে। ধরুন, গান তুলে দেওয়ার লোকের কক্ষনো অভাব হয় না। একজনের কাছে বায়না করে পাত্তা না-পেলে সময় নষ্ট না-করে অন্য একজনের কাছে গিয়ে ঘ্যানঘ্যান করা যায়—ইত্যাদি।

এই সুযোগটা পূর্ণ আকারে দেখা দিত রথের মেলার সময়। সেই ধূসর অতীতে আমাদের গুরুজনেরা প্রত্যেকে আমাদের হাতে—বলতে লজ্জা হয়—দশ পয়সা করে দিতেন মেলায় খরচ করার জন্য। কাজেই, যত গার্জেন—ততগুলো দশ পয়সা। মেলায় যাওয়ার সময় আমাদের ছেঁড়া হাপ-প্যান্টুলের পকেট থেকে মধুর নিক্কণ শোনা যেত; মনে হত—অ্যাদ্দিনে পয়সাওলা হয়েছি বটে!

তা একদিন অমনই টিপটিপ বৃষ্টিমাখা আঁধার ঘনিয়ে-আসা বিকেলে আমরা হিসেব করতে বসলাম—যথাসাধ্য পরিশ্রমের ফলে কত চাঁদা উঠল। দেখা গেল, আমার কাছে কুল্যে এক টাকা কুড়ি পয়সা আছে। অঙ্কে যে আমি মহাপণ্ডিত—সে তো আপনাদের জানাই আছে। কাজেই সম্ভাব্য হিসেব দাঁড়াল এইরকম :

১) পরভাজা (দুটো) = দশ পয়সা।
২) সেপাই পুতুল (ছোট, চটা) = পঁচিশ পয়সা।
৩) সেপাই পুতুল (বড়, দুটো) = পঞ্চাশ পয়সা।
৪) একটা পিস্তল = দু'টাকা।
৫) ক্যাপ (ফিতে, দশটা) = এক টাকা...

৬) ক্যাপ (ঝুরো, দশটা)...ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই পর্যন্ত হিসেব শুনে পাশে বসে বই পড়ার আপ্রাণ চেষ্টায় রত ছোটকাকু মন্তব্য করেছিল, 'বোঝলা বাবা, রাম না জন্মাইতেই রামায়ণ লেখছিল বাল্মীকি—এইয়া হইল গিয়া শোনা কথা। কিন্তু এক টাকা কুড়ি পয়সার ভরসায় চ টাকা পঁচাত্তর পয়সার বাজেট যে হইতে পারে—এইয়া তো নিজের চক্ষেই দ্যাখলাম! যাউক, বুড়া বয়সে বন্ধুগো কইতে পারুম, এই দরের একজন ব্যবসায়ী আমারই ভাইপো!'

এই অপমান আজও ভুলিনি আমি। একমাত্র ছোটকাকুই যে পঁচিশ পয়সা দিয়েছিল, তাও ভুলে গিয়েছিলাম শোকে। দুনিয়াশুদ্ধ লোক আমার অঙ্কের প্রতিভা নিয়ে হাসুক গে'! তুমিও—ছোটকাকু!

তা না-হয় হল। অপমান নয় হজম করলাম। কিন্তু কথাটা হল, রাম না-জন্মাতেই রামায়ণ লেখা হল কী করে? প্রবাদটা আমিও জানি বটে। কিন্তু এ হয় ক্যামনে? যে মানুষ এখনও জন্মায়নি, তার জীবনকথা রচনা করা হবে কেমন করে?

আসুন, যাঁর সম্পর্কে এই প্রবাদ, সেই বাল্মীকি ঠাকুর নিজে এ বিষয়ে কী বলেন—আগে সেইটে শুনে নেওয়া যাক!

আমরা তো আগেই দেখে ফেলেছি—রত্নাকরের ব্যাপারটা আদৌ বাল্মীকি-রামায়ণে নেই। সেখানে পয়লা শ্লোকেই বাল্মীকি একজন প্রধান ঋষি—'মুনিপুঙ্গব।' নারদের সঙ্গে তিনি যেভাবে কথা বলেন, তা প্রায় সমানে-সমানে; যদিও তিনি প্রশ্ন শুধোচ্ছেন এবং নারদ জবাব দিচ্ছেন—তার মধ্যে বাড়তি দীনতা নেই কিছু। কিন্তু তাঁর এই প্রশ্নের উত্তরে নারদ যা বলেন, তার সূত্রেই খুলে যায় এক মহাগ্রন্থের উৎসমুখ—যাকে আমরা রামায়ণ বলে জানি। সংক্ষেপে এইটুকু আমরা দেখে নিয়েছি প্রথম লেখাতেই। এবার এই 'রাম না-জন্মাতেই রামায়ণ' ব্যাপারটার রহস্যভেদ করতে আমাদের এই জায়গাটা জানতে হবে আর একটু ভালো করে, বিস্তৃত পরিসরে।

তো হল কী—বাল্মীকি তো তাঁর প্রশ্নের মধ্যেই গাদাগুচ্ছের বিশেষণ উল্লেখ করে নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, এমন মানুষ বাস্তবেই সম্ভব কিনা। নারদ জবাব দিলেন—সে বলা ভারি মুশকিল। অত গুণ এক আধারে খুঁজে পাওয়া তো আর মুখের কথা নয় বাপু! তবে হ্যাঁ, এমন একজন মাত্র মানুষের খোঁজ তিনি দিতে পারেন বটে। ইক্ষ্বাকু-বংশে জন্ম নেওয়া সেই মানুষটির নাম—রাম।

এই বলে উচ্ছ্বসিত শব্দে রামের অনন্ত প্রশংসা করে চললেন নারদ; ফের একবার বিশেষণের ঝড় বয়ে গেল। শুধু বিশেষণ উল্লেখ করেই কিন্তু নারদ থামলেন না মোটেই। তিনি এবার বলতে লাগলেন রামের জীবনকথা। সমগ্র, সম্পূর্ণ রাম-কথা বলে তবেই দম নিলেন তিনি; আর সেই সুযোগে গোটা রামায়ণের গল্পটাই একবার শুনে ফেললেন মহামুনি বাল্মীকি। আমরাও এইভাবে গোটা রামায়ণ পড়ার আগেই তার সমস্ত ঘটনাবলি জেনে গেলাম; আর হ্যাঁ, খেয়াল করে রাখলাম—নারদ ঠিক সেই পর্যন্ত ঘটনাই বলেছেন, যে পর্যন্ত যুদ্ধকাণ্ডে রয়েছে। লঙ্কা জয় করে ফিরে এসে রাম-সীতা সুখে বাস করতে লাগলেন। ব্যস।

গল্প বলে নারদ গেলেন চলে। বাল্মীকি, শিষ্য ভরদ্বাজের সঙ্গে (ইনি সেই ভরদ্বাজ নন, যাঁর সঙ্গে রাম কিংবা ভরতের দেখা হয়েছিল বনবাসের সময়। ইনি বাল্মীকির শিষ্য।) চললেন সরযু নদীতে স্নান করতে। স্নানের আগে যখন তিনি বনের শোভা দেখছেন ঘুরে ঘুরে, তখনই ঘটে গেল সেই কাণ্ড—যা আদৌ সাহিত্যের জনক-রূপে যুগে যুগে বন্দিত হয়ে আসছে। এক নিষাদ একটি ক্রৌঞ্চকে বধ করল, ক্রৌঞ্চী তার মৃতদেহের উপর উড়ে উড়ে কাঁদতে লাগল। শোকার্ত বাল্মীকি উচ্চারণ করে বসলেন সেই আদিশ্লোক—যা আমাদের সব্বার জানা :

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌।

অত্ত বড় একটা শব্দ দেখে ভড়কে যাওয়ার কিচ্ছু হয়নি। সাদা বাংলায় এর মানে হল, 'ওরে নিষাদ! এই যে তুই প্রেমে (সেকালের সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রেম' শব্দটা খুঁজে পাওয়াই ভার। সবই কাম।) উন্মত্ত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে বধ করলি, এইজন্যই সমাজে তোর কখনও প্রতিষ্ঠা হবে না।'

বলে ফেলে মুনি নিজেই বেজায় চমকে গেলেন! বলে উঠলেন, 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া!' এ আমি কী বললাম! পরে অবশ্য এর নামকরণ করলেন তিনিই। শোক থেকে জন্ম বলে এর নাম হল 'শ্লোক।'

যাই হোক, স্নান-টান সেরে বাল্মীকি ফিরলেন নিজের আশ্রমে। তখনই সেখানে এসে উপস্থিত হলেন স্বয়ং ব্রহ্মা। বাল্মীকি তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে বসালেন। তিনিই বাল্মীকিকে বললেন রামের পুণ্য জীবনকথা অবলম্বন করে রামচরিত রচনা করতে। ব্রহ্মা তাঁকে জানালেন—এইবার ধ্যানদৃষ্টিতে রামের জীবনের সমস্ত কথা তিনি জানতে পারবেন, এই কাব্যে তাঁর একটি বাক্যও মিথ্যা হবে না; রবীন্দ্রনাথ যাঁকে বিপ্রতীপ ব্যাখ্যায় বলেছেন অপার্থিব ভঙ্গিতে—'তাই সত্য, যা রচিবে তুমি।' তাই হল। ধ্যানে বসে সকল কথা জেনে নিয়ে বাল্মীকি রচনা করলেন রামায়ণম্।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমরা যারা বাংলা বা সংস্কৃত নিয়ে পড়াশুনো করেছি—তারা সকলেই গল্পটা এই অবধি জানি, রসশাস্ত্রের পাঠ্যবইতে এই অবধি তো থাকেই। মুশকিল হল, এই পর্যন্ত কোথাও এমন কোনও ইঙ্গিত নেই, যা থেকে অনুমান করা যায়—যখন এসব কাণ্ড চলছে, রাম তখন কোথায়! প্রচলিত প্রবাদ অবশ্যই বলছে—রাম তখনও জন্মগ্রহণ করেননি। সেক্ষেত্রে বুঝতে হয়, বাল্মীকির এই শ্লোকবাক্য উচ্চারিত হচ্ছে অন্তত দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আগে।

এবং এইবার আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে একটি মধুর বিস্ময়; কারণ এর পরের গল্প অলঙ্কারশাস্ত্র বা রসশাস্ত্র শিখতে লাগে না, ফলে পাঠ্যবইতে নেই, ফলে আমরা খেয়াল করিনি।

লেখালেখি সাঙ্গ হলে বাল্মীকি চিন্তায় পড়লেন—শুধু রচনা করলেই তো হল না, এখন এই গান গাইবে কে? লক্ষ্য করুন—'পড়বে কে' নয়! 'গাইবে কে?' কারণ, এটি শুধু কাব্য নয়! এটি 'গেয়'—গেয়ে শোনাতে হয় সামবেদের মতোই! *'পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং'*, এবং *'তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্'*—এটি যেমন পাঠ করে আনন্দ, তেমন গেয়ে শোনাতে আনন্দ। এতে যেমন লয় আছে, তেমন সুরও আছে। তেমন গায়ক পাই কোথা?

এই সময় বাল্মীকির কাছে এসে উপস্থিত হলেন কুশীলব। আজ্ঞে না, নতুন কোনও নাটকের পাত্রপাত্রীর কথা হচ্ছে না কিন্তু! এর মানে রাম ও সীতার দুই পুত্র—লব ও কুশ!

এ কেমন হল! লব-কুশ বাল্মীকির আশ্রমে কেন?

ঠিক ধরেছেন। এ হল ঠিক সেই সময়ের কথা—যখন প্রজাদের ভিত্তিহীন জনরবের সামনে নতিস্বীকার করলেন রাম, এবং লক্ষ্মণের সাহায্যে সীতাকে বনমধ্যে নির্বাসিত করলেন। তিনি তখন অন্তঃসত্ত্বা। বনের মাঝে একা তাঁকে বসে থাকতে দেখে বাল্মীকিকে সংবাদ দিল শিষ্যরা; ঋষি এসে তাঁকে সসম্মানে আশ্রয় দিলেন নিজের আশ্রমে। কুশ এবং লবের জন্ম হল এখানেই। এসব কাহিনি অবশ্য আদিকাণ্ডে নেই, আছে উত্তরকাণ্ডে।

তারপর?

তারপর লব-কুশ এই রামায়ণ-গান শোনালেন অরণ্যবাসী মুনিদের। তাঁরা তো শুনে বেজায় খুশি; বিস্তর আশীর্বাদ করলেন দুই ভাইকে, উপহার দিলেন কত কী! তারপর একদিন এরা দুজন যখন গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন অযোধ্যার রাজপথে, তখন গান শুনতে পেয়ে তাদের নিজের গৃহে ডেকে আনলেন স্বয়ং রাম। ভাইদের, এবং অন্যান্য অমাত্যদের ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের যা বললেন, তা হুবহু তুলে দেওয়ার লোভ সামলানো এককথায় অসম্ভব—'এই দুই রাজলক্ষণ-সম্পন্ন মুনি—কুশ এবং লব—আমার মহানুভাব-চরিতগাথা গাইছেন। তোমরাও শোনো, কারণ লোকে বলে—রামায়ণ-গান শুনলে পুণ্য হয়!'

এইরকম বিচিত্র সংলাপ গোটা রামায়ণে নেই মশাই! যে রাম খোদ অগ্নিদেবতার কথাতেও না-ঘাবড়ে নিজের উপর চাপিয়ে-দেওয়া অবতারত্ব অস্বীকার করেছিলেন, তিনি নিজের 'মহানুভাব' চরিতকথা শোনার জন্য লোক ডাকছেন, এবং আগেভাগেই বলে দিচ্ছেন, 'শোনো বাপু! এ হল আমার জীবনী, বুঝলে! শুনলে সিধে স্বর্গে যাবে!' বলে কী! খামোখাই তো আর লোকজন সন্দেহ করে না—এই প্রথম চারটি সর্গও পরে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে!

কিন্তু এটুকু অভ্রান্তভাবেই বোঝা গেল—রামায়ণ যখন রচনা করছেন বাল্মীকি, রামের যে তখন শুধু জন্ম হয়ে গেছে, তাই নয়; জীবনের প্রধানতম কর্ম—রাবণবধ ও সীতা-উদ্ধার সেরে তখন তিনি রাজা রাম হয়েছেন। উত্তরকাণ্ডে যে অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, তা অবিশ্যি এখানে নেই; তবে তাতেও বিশেষ কিছু এদিক-ওদিক হচ্ছে না। মোদ্দা কথা, রাম তখন প্রবীণ হয়েছেন, কিন্তু জীবিত—স্বয়ং নিজেরই জীবনচরিত শুনছেন।

সোজা কথায়, রামায়ণ অন্তত রাম না-জন্মাতেই লেখা হয়নি তাহলে! সেই যে নারদ মুনি সরাসরি বলেছিলেন, 'ইদানিং দশরথের পুত্র রাম অযোধ্যার রাজা হয়ে প্রজাপালন করছেন'—এ এক্কেবারে সমসাময়িক উক্তি তাহলে! বর্তমানকালের ব্যবহার অকারণে করেননি দেবর্ষি!

'পালয়ামাস চৈবেমাঃ পিতৃবন্মুদিতাঃ প্রজা।
অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমানরামো দশরথাত্মজ।।'

বুঝলাম। কথা হল—তাহলে এমন খ্যাতিমান প্রবাদটি বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে এল কোত্থেকে?

আসুন, আমাদের যাত্রাপথের দ্বিতীয় ইস্টিশনটায় একটিবার উঁকি মেরে দেখি। কৃত্তিবাস কি এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে পারেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব পারেন, বিলক্ষণ পারেন! এই বইয়ের পাতায় পাতায় ক্রমে আমরা একটা জিনিস সাফ বুঝে ফেলব—বাঙালির ভাণ্ডারে রামায়ণ-সংক্রান্ত যত প্রবাদ-প্রবচন আছে, তার চোদ্দো আনাই আসলে এঁর দান। এও তেমনি একটা ঘটনা। আসুন হুজুর, বসতে আজ্ঞা হোক।

এই বইয়ের পয়লা নম্বরের লেখাটাতেই আমরা এক বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি ইতিমধ্যেই, ভোলেননি নিশ্চয়ই এইটুকু সময়ের মধ্যে! বাল্মীকির উৎস-সন্ধানে যাত্রা করে আমরা শেষমেশ পৌঁছে গিয়েছিলাম স্কন্দপুরাণে। তা সেখানে শুধু রত্নাকরের বাল্মীকি হয়ে-ওঠার গল্পই পড়েছি। তিনি রামায়ণটা কখন লিখলেন—সেই খোঁজটুকু আর নিয়ে ওঠা হয়নি। চলুন, আর একবার গোড়া থেকে শুরু করি।

যা বলছিলাম—রত্নাকর তো রাম-নাম জপ করতে করতে শেষে মহর্ষি বাল্মীকি হয়ে উঠলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁকে এই নতুন নাম দিলেন—আগেই দেখেছি আমরা। তারপরেই তিনি বাল্মীকিকে আদেশ দিলেন—যে রাম-নাম তাঁকে অসীম পাপের হাত থেকে রক্ষা করেছে—সেই রামের চরিতকথা যেন তিনি রচনা করেন। শুনে বাল্মীকি বললেন, তিনি কাব্য-পুরাণ-কবিতা-ছন্দ কিচ্ছুটি জানেন না! লিখবেন কী করে? তখন ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, স্বয়ং মা সরস্বতী তাঁর জিহ্বায় অবস্থান করবেন, কবিতা তাই স্বতোৎসারিত হবে তাঁর মুখ থেকে। তারপরেই তিনি যে কথাটি বললেন—তা অসম্ভব তাৎপর্যপূর্ণ। খেয়াল করুন :

'শ্লোকচ্ছন্দে পুরাণে কহিবে তুমি যাহা।
জন্মিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিবেন তাহা।।'

ক্রিয়াপদের ভবিষ্যৎকালের রূপটা নির্ঘাত আপনার চোখ এড়িয়ে ফাঁকি দিতে পারেনি! অর্থাৎ, এই ঘটনা এখনও ঘটেনি; তা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। বাল্মীকি এখনও রামায়ণ লেখেননি, রাম এখনও জন্মাননি।

বেশ, তারপর?
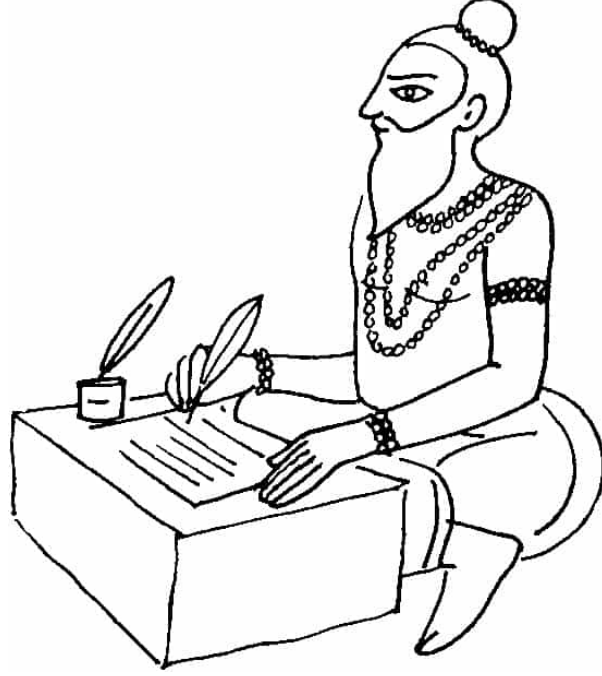
এরপরেই কিন্তু কৃত্তিবাস ফিরে আসেন বাল্মীকি-বর্ণিত পথে। সেই বিখ্যাত ক্রৌঞ্চবধের বর্ণনা করেন কৃত্তিবাস, যদিও অভিশাপটা তাঁর হাতে পড়ে একটু পালটে যায়। এক্ষেত্রে নিষাদ শুধু যে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবে না, তাই নয়; তার নরকবাসও নিশ্চিত করা হয়। স্বাভাবিক—বাল্মীকির সময়ের পর আমরা কালের পথে অনেকটা রাস্তা পার হয়ে এসেছি, কৃত্তিবাস বাঙালি ব্রাহ্মণ। বাল্মীকির চাইতে ঢের বেশি অবজ্ঞা করবেন তিনি অন্ত্যজবর্ণের একজন ব্যাধকে—তা নিয়ে আপনি ক্ষুব্ধ হতে পারেন, অবাক হওয়া মানায় না। সমকাল থেকে বিচ্যুত হয়ে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে নেই। ওতে 'কালানৌচিত্য দোষ' ঘটে।

সে যাক। বাল্মীকি তো ক্রৌঞ্চবধ দেখে নিষাদকে অভিশাপ দিয়ে ফিরে এলেন নিজের আশ্রমে। ভরদ্বাজের সঙ্গে বসে ভাবতে লাগলেন, 'এ আমি কী বলে বসলাম!' নিজে লিখে নিজেই তখন তিনি অবাক! এমন সময় ব্রহ্মা সেইখানে পাঠিয়ে দিলেন নারদকে। তিনিই এসে বাল্মীকিকে বুঝিয়ে বললেন শ্লোকের অর্থ এবং তাৎপর্য। আর বললেন, 'এই শ্লোকচ্ছন্দে তুমি করো রামায়ণ।' এই বলে তিনি বাল্মীকিকে বলে চললেন রামায়ণের ঘটনাবলি, একেবারে দশরথের পুত্র হিসেবে বিষ্ণুর রাম-রূপে জন্ম নেওয়া থেকে শুরু করে স্বর্গারোহণ পর্যন্ত (লক্ষ করুন—রাজা হওয়া পর্যন্ত নয় কিন্তু!) সকল কথা মাত্র বাইশটি পংক্তিতে বর্ণনা করলেন নারদ। এবং হ্যাঁ, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ফের ঘোষণা করে দিলেন, এতক্ষণ ধরে তিনি যা যা বললেন, 'জন্মিয়া করিবে ইহা প্রভু নারায়ণ।' আবার সেই ভবিষ্যৎকাল!

এর পরেই কৃত্তিবাস শুরু করে দেন চন্দ্রবংশের উপাখ্যান। আমরা প্রবেশ করি মূল রামায়ণে।

এবার আর বুঝতে অসুবিধা নেই, 'রাম না-জন্মাতেই রামায়ণ' আমরা—বাঙালিরাই লিখে বসে আছি। বেচারি বাল্মীকি মুনিকে এর জন্য দোষ দিয়ে লাভ নেই। উত্তরভারতের অন্যত্র যে এমন কোনও প্রবাদ সৃষ্টি হয়নি, তার কারণ তুলসীদাস বাল্মীকি তথা রত্নাকর বৃত্তান্তেই আদৌ পদার্পণ করেননি; বরং তার জায়গায় শিবের সঙ্গে সতীর রামকে নিয়েই ভুল-বোঝাবুঝি থেকে সতীর মৃত্যু, উমার জন্ম থেকে বিবাহ—ইত্যাদি অন্য নানা বৃত্তান্ত জুড়ে দিয়েছেন। তাঁর 'রামচরিতমানস' গ্রন্থে রামায়ণ একটি মৌখিক উত্তরাধিকারের অংশ—শিব সে কথা উমাকে বলছেন। কাজেই বেচারি বাল্মীকি সেখানে ঠাঁই পাননি। আর রামের জন্মের আগেই বাল্মীকিকে দিয়ে তাঁর চরিতকথা লিখিয়ে ফেলার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব কৃত্তিবাসের।

খামোখা বাল্মীকিকে তাহলে গৌরবদান করতে যাব কেন, শুনি? তিনি যদি রামায়ণ সৃষ্টি করে থাকেন, কৃত্তিবাস তবে খোদ বাল্মীকিকেই সৃষ্টি করেছেন। কম কথা—বলুন দেখি?!

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুরহস্য

ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাদ—এই নামটি শুনলে শিক্ষিত বাঙালির অন্তত বারো-আনার প্রথমেই যা মনে পড়ে, তা হল মাইকেল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত—সদর্থে বলতে গেলে বাঙালির প্রথম আধুনিক কবি—তাঁর প্রাবাদিক খ্যাতিসম্পন্ন 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর মাধ্যমে শুধু যে বাংলা কবিতাকে এক লহমায় আধুনিক যুগের দরজা পার করে দিয়েছিলেন, তাই নয়; রাক্ষস হওয়া সত্ত্বেও মেঘনাদকে তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত নায়ক করে তুলতে পেরেছিলেন। আর কে না জানে, খলনায়কের উপস্থিতি ছাড়া নায়ক নিতান্তই নিষ্প্রভ! সুতরাং মধুসূদনের কল্যাণে একদিকে যেমন মেঘনাদ নায়ক হয়ে উঠলেন, তেমনই আবির্ভূত হলেন এক খলনায়ক—রামের প্রিয়তম অনুজ লক্ষ্মণ। বাঙালি-মাত্রেই জানেন, কীভাবে অন্যায় যুদ্ধে গুপ্তঘাতকের মতো ইন্দ্রজিৎকে বধ করেছিলেন লক্ষ্মণ। সে অন্যায়ের ক্ষমা হয় না। বাঙালি মননে লক্ষ্মণ তাই অজস্র গুণ থাকা সত্ত্বেও চিরকালের মতো কলঙ্কিত হয়ে গেলেন।

বেশ, তাহলে সর্বাগ্রে একবার দেখে নেওয়া যাক—মাইকেল ঠিক কীভাবে বর্ণনা করেছেন ইন্দ্রজিতের মৃত্যুদৃশ্য।

আমরা জানি, 'মেঘনাদবধ কাব্যের' মূল উপজীব্য ইন্দ্রজিতের মৃত্যু। তার পূর্বের ও পরের—মোট আড়াই দিন ও রাত্রির ঘটনা স্থান পেয়েছে এই নয় সর্গের মহাকাব্যে। খুব স্পষ্টভাবেই গ্রিক মহাকাব্যের ভাবাদর্শ অনুসরণ করে মাইকেল গড়ে তুলেছেন একটি ষড়যন্ত্রের আবহ। বিভীষণ—যাঁর সম্পর্কে বাংলা ভাষার প্রচলিততম বিশেষণটি হল 'ঘরশত্রু'—তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে জানিয়ে দিচ্ছেন—নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে অগ্নির পূজা সমাপন করতে পারলে ইন্দ্রজিৎ অপ্রতিরোধ্য এবং অবধ্য হয়ে উঠবেন; সুতরাং তার পূর্বেই তাঁকে বধ করা প্রয়োজন। রামের সম্মতি পেয়ে বিভীষণ গুপ্তপথে লক্ষ্মণকে নিয়ে গেলেন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে।

লক্ষ্মণকে দেখে প্রথমে ইন্দ্রজিতের ধারণা হল, স্বয়ং অগ্নিদেব তাঁর পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন ইন্দ্রজিৎকে আশীর্বাদ করার জন্য। লক্ষ্মণ অবশ্য সেই ভুল ভাঙিয়ে দিলেন, এবং আত্মপরিচয় দিয়ে

তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দিলেন। ইন্দ্রজিৎ ক্ষত্রিয়ের মহান যুদ্ধপ্রথা মনে করিয়ে দিয়ে তাঁকে তীব্র তিরস্কার করলেন অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই—'তস্কর যেমতি/ পশিলি এ গৃহে তুই; তস্কর সদৃশ/ শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি।' ইক্ষ্বাকু-বংশীয় একজন ক্ষত্রিয় যোদ্ধার পক্ষে এর চেয়ে অপমানজনক উক্তি আর কিছু হতে পারে না।

লক্ষ্মণ অবশ্য এই অপমানের দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হলেন না। বরং আরও কটূ ভাষায় ইন্দ্রজিৎকে তিরস্কার করতে লাগলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ তাঁকে অত্যন্ত শিষ্ট ভব্য একটি প্রস্তাব দিলেন। লক্ষ্মণ তাঁর গৃহে এসেছেন, তিনি আতিথ্য গ্রহণ করুন। ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসবেন। লক্ষ্মণ সেই প্রস্তাবে রাজি হলেন না, বললেন—ফাঁদে-পড়া সিংহকে ছেড়ে দেওয়া মূর্খের লক্ষণ। এইবার ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ গন্ডারের শৃঙ্গ দিয়ে নির্মিত কোষা ছুঁড়ে মারলেন; লক্ষ্মণ তার আঘাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

ইন্দ্রজিৎ দ্রুত লক্ষ্মণের অস্ত্রগুলি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মায়াদেবী—যিনি অন্তরালবর্তিনী হয়ে লক্ষ্মণকে রক্ষা করেছিলেন—তাঁর মায়ায় সেইসব অস্ত্র তুলতে পারলেন না। তখন তিনি যাত্রা করলেন নিজের অস্ত্রাগারের দিকে, এবং দ্বারপ্রান্তে দেখতে পেলেন 'খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে।' এইবার তিনি বুঝতে পারলেন, কেমন করে গুপ্তপথে লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার পর্যন্ত পৌঁছেছেন, অগণিত রাক্ষসের প্রহরা কেন তাঁকে বাধা দিতে পারেনি।

ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ যখন তীব্র ভাষায় নিজের খুল্লতাতকে তিরস্কার করছেন, তখন মায়ার যত্নে জ্ঞান ফিরে পেয়ে লক্ষ্মণ তীক্ষ্ন শরে ইন্দ্রজিৎকে বিদ্ধ করলেন। ইন্দ্রজিৎ অস্ত্রের অভাবে পূজার কোষাকুষি ইত্যাদি তাঁর দিকে ছুঁড়ে মারলেন। কিন্তু মায়াদেবী সে-সকল পরম যত্নে সরিয়ে দিতে লাগলেন, যেমন করে জননী ঘুমন্ত ছেলের শরীর থেকে মশা তাড়িয়ে দেন—'জননী যেমতি/ খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে/ করপদ্ম সঞ্চালনে।' এবং পরিশেষে, এইভাবে মায়ার সাহায্য পেয়ে, বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার ফল হিসাবে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশের গুপ্তপথ পেয়ে, যজ্ঞ শেষ করার আগেই নিতান্ত চোরের মতো হীনচেতা লক্ষ্মণ, অসহায় নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করলেন। বধ নয়; সত্যের খাতিরে আমাদের বলা উচিত—এটি একটি গুপ্তহত্যার ঘটনা-মাত্র। ক্ষত্রিয়সুলভ বীরত্বের লেশমাত্র নেই এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে। আছে বিশ্বাসঘাতকতা, আছে মহাবীরের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস সঞ্চয় করতে না-পেরে তাঁকে গোপনে, চোরের মতো লুকিয়ে খুন করে ফেলা। সন্দেহাতীতভাবে সমগ্র রামায়ণের সবচেয়ে নিন্দনীয় ঘটনা এইটি।

এবং অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি—এই ঘটনার লেশমাত্র বাল্মীকি-রামায়ণে নেই।

আমাদের এ-কথা মনে আছে, মাদ্রাজে অবস্থানকালে মধুসূদন যত্নপূর্বক সংস্কৃত শিখেছিলেন। কিন্তু রামায়ণ অবলম্বন করে স্বকীয় কাব্যরচনার সময় তিনি শুধু মূল কাব্যের বিনির্মাণই ঘটাননি, নিরপরাধ লক্ষ্মণকে অকারণে চিরস্থায়ী কলঙ্কের দায়ভার দান করে গেছেন। দুর্ভাগ্যবশত সংস্কৃত ভাষা আজকের শিক্ষিত বাঙালির প্রথম পছন্দের মধ্যে পড়ে না; এই ভাষাটি ইংরেজি বা হিন্দির মতো অর্থকরী নয়, এবং এই দুটি এবং আরও কিছু বিদেশি ভাষার মতো তা বাঙালির বিচিত্র সম্মানবোধের পাগড়িতে অতিরিক্ত পালকও গুঁজে দেয় না। ফলে সংস্কৃত ভাষা, এবং সেই ভাষায় রচিত বাল্মীকি-রামায়ণ বাঙালির মানসজগত থেকে বহুদূরে নির্বাসিত হয়েছে। শুধু ভাগ্যহত লক্ষ্মণ 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর দৌলতে অকারণে অকৃত অপরাধের ভার বহন করে বেড়াচ্ছেন।

তাহলে জেনে নেওয়া যাক, স্বয়ং বাল্মীকি কী বলেছিলেন।

বানরসেনাদের হতচকিত করে দেওয়ার জন্য ইন্দ্রজিৎ একটি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তিনি একটি মায়া-সীতা নির্মাণ করে তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে এলেন এবং সর্বসমক্ষে তাকে হত্যা করলেন। মায়া-সীতা বধ করে ইন্দ্রজিৎ কিছুক্ষণের জন্য বানরসেনাদের, এমনকী বিচক্ষণ হনুমানকেও বিহ্বল করে দিতে পেরেছিলেন। সেই অবসরে তিনি প্রবেশ করলেন যুদ্ধক্ষেত্রের অনতিদূরে, বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থিত নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে। এদিকে হনুমানের মুখ থেকে রাম জানতে পারলেন, ইন্দ্রজিৎ প্রকাশ্যে সীতাকে বধ করেছেন। এই ভয়ংকর

সংবাদ শুনে তিনি হতজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। লক্ষ্মণ তাঁকে সাধ্যমতো সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। এমন সময় বিভীষণ সেখানে উপস্থিত হয়ে স্পষ্ট জানালেন, রাবণের সীতার প্রতি যা মনোভাব, তাতে এই ঘটনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তিনি প্রস্তাব দিলেন, ইন্দ্রজিৎকে নিকুম্ভিলার আভিচারিক যজ্ঞ সমাপ্ত করতে দেওয়া যাবে না; তার আগেই তাঁকে আক্রমণ করতে হবে এবং যজ্ঞনাশ করে তাঁকে সেখান থেকে বের করে আনা প্রয়োজন। নিশ্চিন্তে যজ্ঞ করার জন্যই ইন্দ্রজিৎ এই মায়া-সীতা বধ করার অভিনয়টি করেছেন। এই যজ্ঞ সমাপ্ত করতে পারলে তিনি দুর্ধর্ষ হয়ে উঠবেন, সেই অবস্থায় তিনি দেবতাদের কাছেও অদৃশ্য হয়ে থাকবেন। সেই সুযোগ তাঁকে দেওয়া যাবে না।

বিভীষণের পরামর্শ অনুযায়ী লক্ষ্মণ নিজেই মহাবীর হনুমান, ঋক্ষপতি জাম্বুবান, এবং অন্যান্য সমস্ত প্রধান বানরদের নিয়ে আবার আক্রমণ করলেন রাক্ষসসেনাকে। বিভীষণ তাঁকে দেখিয়ে দিলেন, ঠিক কোনখানে রাক্ষসেরা ইন্দ্রজিতের যজ্ঞগৃহ বেষ্টন করে রয়েছে; বললেন—লক্ষ্মণ যেন কোনওক্রমেই ইন্দ্রজিৎকে অভিচার হোম শেষ করতে না-দেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী লক্ষ্মণ বানরসেনাদের সঙ্গে নিয়ে প্রবল বেগে রাক্ষসদের আক্রমণ করলেন। তাদের হাহাকার রব শুনে বিচলিত ইন্দ্রজিৎ হোম সম্পন্ন না-করেই উঠে আসতে বাধ্য হলেন, এবং নিকুম্ভিলা-ক্ষেত্রের ঘনীভূত বৃক্ষের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে সুসজ্জিত রথে আরোহণ করে লক্ষ্মণকে এবং বানরসেনাদের প্রতি-আক্রমণ করলেন।

এমন ভয়াবহ যুদ্ধ কেবলমাত্র রাম ও রাবণের মধ্যেই হয়েছিল। ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণ—উভয়ই অদ্ভুতকীর্তি বীর; দুজনেই দুজনের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলেন। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সারথি ও অশ্বগুলিকে বধ করলেন। রাক্ষসদের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে ইন্দ্রজিৎ বিদ্যুৎবেগে পুরীর ভিতর প্রবেশ করে নতুন রথ ও অস্ত্র নিয়ে এলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ তা পুনরায় ধ্বংস করে দিলেন। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর লক্ষ্মণ ঐন্দ্রাস্ত্র নামের একটি অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, মহাবীর ইন্দ্রজিতের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। সন্ত্রস্ত দেবতারা এতদিনে নিশ্চিন্ত হয়ে আকাশে দুন্দুভিধ্বনি করতে লাগলেন।

অর্থাৎ একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে, অন্তত মধুসূদন যে-সকল হীনতার জন্য লক্ষণকে দায়ী করে গিয়েছেন —তার দায়িত্ব বাল্মীকির নয়। আশ্চর্যের বিষয় হল, ইন্দ্রজিতের বক্তব্যের ক্ষেত্রে মধুসূদন কখনও কখনও বাল্মীকির প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করে চলেছেন। 'মেঘনাদবধ কাব্যের' বিখ্যাত পংক্তিগুলি মনে করুন, যেখানে ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ তাঁর খুল্লতাত বিভীষণকে শাস্ত্রের বচন মনে করিয়ে দিচ্ছেন :

> '... শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
> পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
> নির্গুণ স্বজন শ্রেয়, পরঃ পরঃ সদা।'

এ-সকল পংক্তি বাল্মীকি রামায়ণের একেবারে সরাসরি প্রতিধ্বনি, বা মূলানুগ ও অপূর্ব অনুবাদ বলা যায় :

> *'গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণো'পি বা।*
> *নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব সঃ।।'*
> *(৬ঃ৮৭ঃ১৫)*

দুর্ভাগ্যবশত এই অভিযোগের উত্তরে বিভীষণ যে অত্যন্ত যৌক্তিক কথাগুলো বলেছিলেন, মধুসূদন তা এড়িয়ে গিয়েছেন; বরং 'পরদোষে কে চাহে মজিতে'—এই পংক্তিটি যুক্ত করে বিভীষণকে অভিসন্ধিপরায়ণ এক খলনায়কে পরিণত করেছেন। এরই ফলে সমগ্র দৃশ্যটি ঠিক ঠিক বিপরীত রূপ ধারণ করেছে।

স্বভাবতই আমাদের এ কথা মনে হতে বাধ্য, যুগে যুগে নতুন করে বিনির্মিত হবে, নতুন নতুন ব্যাখ্যা উঠে আসবে—এই উদ্দেশ্যেই তো পঠিত হয় মহাকাব্য বা পুরাণাদি। সর্বদেশে সর্বকালেই এ-কথা সত্য। কিন্তু আমাদের আপত্তি অন্যত্র। বাল্মীকি বা কৃত্তিবাস—কেউই লক্ষ্মণের বীরত্বকে বিন্দুমাত্র হেয় করতে চাননি। দুই মহাবীরের মধ্যে একটি ন্যায়সংগত মহাযুদ্ধ ঘটেছিল। লক্ষ্মণ সেইদিন উন্নততর রণকৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন, এবং স্বাভাবিকভাবেই ইন্দ্রজিৎ পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রজিৎকে ট্র্যাজিক নায়ক-চরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে মধুসূদন লক্ষ্মণের উপর চাপিয়ে দিলেন এক অকারণ কলঙ্ক। মহাবীর, এবং সম্ভবত সমগ্র রামায়ণের সবচাইতে স্থিতধী পুরুষ লক্ষ্মণ—পরিণত হলেন একজন গুপ্তহত্যাকারী কলঙ্কিত তস্করে। সাধারণভাবে রাম ও লক্ষ্মণের বীরত্বকে প্রায় সম্পূর্ণ অবহেলা করে তাঁদের 'ভক্তের ভগবানে' রূপান্তরিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন কৃত্তিবাস এবং তুলসীদাস। কিন্তু তার মূলে ছিল সমসাময়িক সমাজেতিহাস, মধ্যযুগে ঘটে-যাওয়া ভক্তি-আন্দোলন। এক্ষেত্রেও প্রায় তাই-ই ঘটল; শুধু প্রধান দায়িত্ব সম্ভবত আমরা অর্পণ করতে পারি গ্রীক মহাকাব্য 'ইলিয়াড'-এর উপরে—পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধুসূদনের উপরে যার প্রভাব অপরিসীম। উনবিংশ শতকের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে এ-ও এক সমাজ-বিবর্তন তো বটেই!

তবে ভবিষ্যতে লক্ষ্মণের কথা মনে পড়লেই যেন শুধু গুপ্তহত্যার কথাই মনে না-পড়ে। যেন এইটুকু মনে রাখতে পারি—একজন প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীরের মতোই তিনি সম্মুখসমরে বধ করেছিলেন মহাবীর, কিন্তু গর্বান্ধ ইন্দ্রজিৎকে।

মারীচের প্রকৃত সংবাদ

আমার বাবা যখন সম্পূর্ণ বিনা-নোটিসে আমায় ছেড়ে চলে গেলেন, তারপর আঠাশ বছর কেটে গেছে। তৎসত্ত্বেও আমার কানে স্পষ্ট ভেসে আসে সদ্য কলেজ-ফেরত বাবার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, 'জানিস, টাউন হলে ''মারীচ সংবাদ'' আসছে! উফ, কতদিন পর আবার দেখব! তোকেও নিয়ে যাব এবার। দেখবি—কাকে বলে নাটক।' দেখে ফেললাম সেই অতিখ্যাত নাটক বাবার পাশে বসে। সেদিনের সেই মুগ্ধতা আজও যেন আঙুল বাড়ালে ছুঁতে পারি। দুই মহাশক্তিধর সিস্টেমের মধ্যে পড়ে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া এক সাধারণ মানুষের 'চক্রে-পিষ্ট আঁধারের বক্ষফাটা তারার ক্রন্দন' আর ইহজন্মে ভোলা হবে না। 'এগোলে রাম মারবে, না-এগোলে রাবণ'—উভয়সংকটের সমার্থক হয়ে গেছে রামায়ণের মারীচ চরিত্রটি। বাল্মীকির ভাষায় তিনি মায়াবী, জাদুকর। আমাদের কাছে তাঁর প্রধান গুণ ছদ্মবেশ-ধারণের অপরিসীম নৈপুণ্য। স্বয়ং রাম বা সীতাও অতি নিকট থেকে দেখেও চিনতে পারেননি তাঁর ছলাবরণ। এই ছদ্মবেশী সোনার হরিণটিই হয়ে দাঁড়াল রামকাহিনির নিয়ন্তা। কিন্তু কে এই মারীচ! কেন আজ হঠাৎ এই অসহায় নিশাচরটিকে নিয়ে আলোচনায় বসলাম আমরা?

আসলে, এই মারীচের যে একটি শোচনীয় অতীত আছে, সে খবর কমই রাখি আমরা। রামের প্রথম বীরত্বের প্রকাশ আমাদের মনে আছে—সেই তাড়কা রাক্ষসীর বিরুদ্ধে তাঁর বিখ্যাত যুদ্ধ! মারীচের মায়ায় বিভ্রান্ত হলেও, তাঁকেও হত্যা করেন রাম—এ ঘটনাও আমরা ভুলিনি। শুধু খেয়াল করি না, এই দুটি আপাত-অসংলগ্ন বিষয়ের মধ্যে আছে এক সূক্ষ্ম সূত্র। মারীচ। এবার একটু নিকটদৃষ্টিতে দেখে নেওয়া যাক তাঁর বিচিত্র জীবনকথা।

সুকেতু নামের এক সদাচারী যক্ষের কোনও সন্তান ছিল না। ব্রহ্মার তপস্যা করার ফলে তাঁর একটি কন্যা জন্মায়—তার নাম তাড়কা। ব্রহ্মা একে সহস্র হস্তীর বল দান করেন। মেয়ে বড় হলে সুকেতু তাকে বিয়ে

দিলেন সুন্দ-র সঙ্গে। (এই সুন্দ এবং নিকুম্ভের পুত্র সুন্দ-উপসুন্দের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই।) এই সুন্দ এবং তাড়কার একমাত্র পুত্রের নাম মারীচ।

মারীচের পিতা সুন্দ কিছুদিন পরেই কোনও কারণে—যা বাল্মীকি উল্লেখ করতে বিস্মৃত হয়েছেন—অগস্ত্যের শাপে নিহত হলেন। সদ্যবিধবা তাড়কা ক্রুদ্ধ হয়ে অগস্ত্যকে আক্রমণ করতে গেলেন, মারীচ স্বভাবতই মায়ের সঙ্গ নিলেন। অগস্ত্য তাড়কার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে অভিশাপ দিলেন, 'এই মুহূর্তে তোর রূপ বিকৃত হোক, তুই ভীষণদর্শন বিকৃতমুখী রাক্ষসী হ!' সঙ্গী মারীচও অগস্ত্যের কোপ থেকে রক্ষা পেল না; সে-ও শাপগ্রস্ত হয়ে রাক্ষস হল—*'রাক্ষসত্বং ভজস্বেতি মারীচং ব্যাজহার সঃ।'* এইবার মাতাপুত্রের অত্যাচারে চারপাশের বনভূমি ত্রস্ত হয়ে উঠল, মলদ ও করূষ নামের জনপদ দুটি পরিত্যক্ত হয়ে গেল, এমনকী অগস্ত্যের আশ্রমের মুনিরাও তপস্যাভঙ্গ করে পলায়ন করলেন।

ঠিক এই অবস্থায় বিশ্বামিত্র গিয়ে উপস্থিত হলেন দশরথের সভায়। অযোধ্যাপতির তীব্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি বালকবয়সী রাম এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে এলেন এই অভিযানে, পথে দান করলেন বলা ও অতিবলা মন্ত্র—যার প্রসাদে রাম পরমজ্ঞানী এবং মহাবীর হয়ে উঠলেন। তারপরেই এল সেই আদেশ। তাড়কা অগস্ত্যের, মুনি-ঋষিদের, যাগযজ্ঞের, এবং ফলত বিশ্বামিত্রেরও পরম শত্রু; তাকে হত্যা করো, রাম! পাছে রাম নারীহত্যায় ইতস্তত করেন; তাই পূর্বাহ্নেই বিশ্বামিত্র বলে দিলেন—পুরাকালে ইন্দ্র এবং বিষ্ণু এই কর্মের উদাহরণ রেখেই গেছেন, সুতরাং নারীহত্যায় লজ্জাজনক কিছু নেই, এ কর্ম তেমন অভূতপূর্ব কিছুই নয়। অবশ্য রামের মধ্যেও আমরা এমন কোনও দ্বিধা দেখতে পাই না; তিনি বরং কিঞ্চিৎ দ্বিধান্বিত হয়েছিলেন পরে, যখন চারিদিক ধূলিঝড়ে আচ্ছন্ন করে আক্রমণ করল তাড়কা স্বয়ং। রাম তখন লক্ষ্মণকে বললেন—এই ভীষণদর্শনা রাক্ষসীকে তিনি হত্যা করতে চান না, বরং এর নাক-কান কেটে নেওয়া যাক (দেখা যাচ্ছে, বিশেষত নারীদের অপমান করার জন্য কান এবং নাসিকাগ্র ছেদন করা—অর্থাৎ বিরূপ করে দেওয়া—তৎকালে রীতিমতো প্রচলিত ছিল। এর কারণ অবশ্য আলাদা। নারী অবধ্য, তাই এই শাস্তি। শত্রু পুরুষ হলে বধ করাই বিধেয়।)। কার্যকালে অবশ্য রাম আগে তাড়কার দুই হাত কেটে ফেললেন, লক্ষ্মণ তার নাক-কান কেটে ফেললেন, এবং শেষ পর্যন্ত বাণবিদ্ধ হয়ে তাড়কা প্রাণত্যাগ করল।

খেয়াল করুন—সুকেতুর মৃত্যুর কোনও কারণ পর্যন্ত উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করলেন না বাল্মীকি। অগস্ত্যই প্রথম বিন্ধ্যের দক্ষিণে আর্যসভ্যতার আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, এমন একটা প্রবাদ পূর্ব থেকেই চলিত আছে। উত্তরকাণ্ডে তাঁকে 'দক্ষিণদেশবাসী ঋষি' বলা হয়েছে। সেই বলদর্পিত আর্যত্বের রথচক্রের নীচে যে অমন অসংখ্য অসুর-রাক্ষস পিষ্ট হয়ে যাবেন—তা তো স্বাভাবিক। তার প্রতিশোধকামী স্ত্রী যে রাক্ষসীতে পরিণত হবেন, এবং আর্যত্বের নূতন অগ্রদূত রাম তাকে হত্যা করবেন—সেও নিতান্ত 'কো-ল্যাটারাল ড্যামেজ'—তাও বোঝা গেল। প্রশ্ন হল—মারীচের কী হল? সে যে নিতান্ত শৈশবেই অনাথ হয়ে গেল—মহাকাব্যের দুরন্ত গতি ও রাজকীয় আড়ম্বরের দ্যুতিতে চমকিত আমরা সে-কথা খেয়ালই করি না!

রাম অবশ্য মারীচকে হত্যা করেননি সম্ভবত বালক বিবেচনাতেই। এক ভয়ংকর শরাঘাতে তিনি তাকে নিক্ষেপ করেছিলেন শত যোজন দূরে, সমুদ্রের মধ্যে। ভীত মারীচ পলায়ন করেছিল লঙ্কায়। এরপর দীর্ঘকাল আমরা তাকে আর দেখতে পাই না; যতদিন না রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে আসেন। তখন মারীচ পূর্ণবয়স্ক, এবং তাঁর রাক্ষস-সত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। এক ভয়ঙ্কর মাংসভুক পশুর রূপ ধরে দণ্ডকারণ্যে তিনি তখন যজ্ঞনাশ করে বেড়াচ্ছেন, নির্বিচারে বধ করছেন তপস্যারত মুনিদের। অরণ্যের অধিকার নিয়ে অন্ত্যজের লড়াই তো আজকের কথা নয়! রাম দণ্ডকারণ্যে এসে পৌঁছলেন, এবং প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত মারীচ অপর দুই রাক্ষস-সহ তাঁকে আক্রমণ করতে গেলেন। কিন্তু রাম যে-মুহূর্তে ধনুকে কালান্তক তিনটি বাণ যোজনা করলেন—মারীচের মনে ফিরে এল শৈশবের সেই মারাত্মক স্মৃতি। দ্রুত পলায়ন করলেন তিনি; স্বয়ং প্রাণে বেঁচে গেলেন বটে, তাঁর দুই সহচরেরই মৃত্যু ঘটল তাঁর চোখের সামনেই।

এই ঘটনাই মারীচের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। সন্ন্যাস নিয়ে, আশ্রম নির্মাণ করে সেখানেই তপস্বীর জীবন কাটাতে লাগলেন তিনি। এই কাহিনিতে তাঁর আর ফিরে আসারই কথা নয়; যদি না রাবণ সীতাহরণের স্বার্থে তাঁকে, তাঁর ছদ্মবেশ-ধারণের চমকপ্রদ ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে চাইতেন। অকম্পন নামের এক ভগ্নদূতের কাছ থেকে জনস্থানের যুদ্ধবৃত্তান্ত এবং খর ও দূষণের মৃত্যুসংবাদ শুনে (লক্ষ্য করুন, শূর্পণখার উল্লেখমাত্র করিনি আমি।) ক্রুদ্ধ রাবণ প্রথমেই গেলেন মারীচের কাছে। তপস্বী মারীচ তীব্রভাবে প্রতিবাদ করলেন রাবণের পরিকল্পনার, অর্থাৎ হরিণের ছদ্মবেশে রামকে ছলনা করার চেষ্টার, এবং রাবণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। স্পষ্ট জানালেন—রাবণের চরেরা অপদার্থ, তারা রামের বীরত্বের সংবাদ রাবণকে দিতে পারেনি। সেই ভয়াবহ বীরত্ব, যা মারীচ দুবার মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে জেনেছেন—তার বিবরণ দিলেন মারীচ; চেষ্টা করলেন রাবণকে সংযত করার।

কিন্তু শূর্পণখার প্ররোচনায় সেই সৎপরামর্শ গ্রহণ করলেন না রাবণ। আবার তিনি ফিরে এলেন মারীচের আশ্রমে; এবার পরামর্শ নিতে নয়, আদেশ দিতে। 'তুমি রজতবিন্দু দিয়ে চিত্রিত স্বর্ণমৃগ হয়ে রামের আশ্রমে যাও, সীতাকে প্রলুব্ধ কর।' মারীচ আবার তীক্ষ্নস্বরে তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন; রাবণের এই একটি ভয়াবহ ভুলই যে সমগ্র রাক্ষসজাতিকে বিনষ্ট করতে পারে—সেই সতর্কবার্তা দিলেন স্পষ্ট করে। কিন্তু মৃত্যুকামী মানুষ যেমন ঔষধ প্রত্যাখ্যান করে, তেমনই রাবণের সদুপদেশে রুচি হল না—*'উক্তো ন প্রতিজগ্রাহ মর্ত্তুকাম ইবৌষধম'* তারপরেই এল সেই অমোঘ বার্তা—'রামের কাছে গেলে তোমার প্রাণসংশয় ঘটবে। কিন্তু আমার কথা অগ্রাহ্য করলে এখনই তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। এইবার বিবেচনা করো, মারীচ, তুমি কোনটা করতে চাও।'

হ্যাঁ, আমরা জানি, মারীচ কোনটা করেছিলেন। ধারণ করেছিলেন সেই অনুপম ছদ্মবেশ, যেমন হরিণ কেউ কখনও দেখেনি। মহাপ্রাজ্ঞ লক্ষ্মণ তবুও সেই ছদ্মবেশ ছিন্ন করে তাঁর প্রকৃত রূপ অনুমান করতে পেরেছিলেন; কিন্তু সীতার আতুর বাসনার সামনে বুদ্ধি হারিয়েছিলেন রাম স্বয়ং। তারপর সেই পশ্চাদ্ধাবন, শরসন্ধান এবং মারীচের চিৎকার—এ সকলই আমরা জানি। মৃত্যুকালে অবশ্য মারীচের ছদ্মবেশ আর ছিল না। রাক্ষস হিসেবে জন্মাননি তিনি, কিন্তু মৃত্যুতে রাম তাঁকে দেখলেন একজন রাক্ষসের বিকট মূর্তিতেই।

অজানা কারণে পিতার মৃত্যু, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মাতার এবং নিজের বিকৃত দেহ, এবং চোখের সামনে মাতার নিষ্করুণ অঙ্গচ্ছেদ দেখার পর যে-কোনও পুত্রেরই 'রাক্ষস মারীচ' হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক কিনা—সে-কথা থাক। লক্ষ্মণ মায়ামৃগ দেখে সন্দিহান হয়েছিলেন; এও জানিয়েছিলেন—পশুর বেশ ধারণ করে মৃগয়া-করতে-আসা রাজাদের বিভ্রান্ত করে বধ করা মারীচের পুরাতন খেলা। কিন্তু আমরা মারীচের প্রসঙ্গ আলোচনা শেষ করব সম্পূর্ণ অন্য এক অনালোকিত দিকে দৃষ্টিপাত করে।

রাবণের কাছে রামের বৃত্তান্ত বলতে গিয়ে মারীচ শুধু তাঁর বলের বা মহাপরাক্রমশালী বীর্যবত্তারই প্রশংসা করেননি। অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন তাঁর চারিত্র্যবলেরও—*'রামো বিগ্রহবান ধর্মঃ সাধুঃ সত্যপরাক্রমঃ। রাজা সর্বস্য লোকস্য দেবানামিব বাসবঃ।'* রাম সাক্ষাৎ ধর্মদেবতা, সাধু, প্রকৃত বীর; ইন্দ্র যেমন দেবতাদের রাজা, রাম তেমনই সমস্ত লোকের রাজা। প্রশ্ন হল—তাহলে সেই রামের সর্বনাশ করার জন্য মারীচ কেন রাজি হলেন? যখন তিনি জানেন—এই কাজ করলে রাম তাঁকে নিশ্চিতভাবেই হত্যা করবেন, এবং সীতাহরণ রাবণেরও মৃত্যুর কারণ হবে—তখন কেন মারীচ আদৌ এই কর্মে সম্মত হলেন? আর যদি বা সম্মত হলেন, কেন তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে 'হা সীতা! হা লক্ষ্মণ!' বলে রামের এবং সীতার সর্বনাশ নিশ্চিত করে গেলেন? কেন এত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও রামকে এমন মহাসংকটে ফেললেন তিনি? রাবণের হাতেই তো মৃত্যুবরণ করতে পারতেন তিনি!

এই প্রশ্নের একটিমাত্র সম্ভাব্য সমাধান আমাদের মনে হতে পারে। তা এই—মৃত্যুর ঠিক পূর্বে, সেই অমোঘ অন্তিম মুহূর্তে, অনিবার্য অন্ধকার ঘনিয়ে আসার অনিকেত ক্ষণে—মারীচের কি মনে পড়ে গিয়েছিল মায়ের কথা? ছেলেবেলা থেকে যে ভয়ঙ্কর মুখটা আমাদের ভয় দেখায়—সেই রাক্ষুসে মুখটা তো মারীচের

কাছে নিছক মাতৃমূর্তিই ছিল! রামের বীরত্ব নিঃসন্দেহে তাঁকে ভীত করেছিল। রাবণের কাছে সে কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন তিনি। সেই ভয় মারীচকে তাড়া করে বেরিয়েছে বহুকাল, উপহার দিয়েছে বহু বিনিদ্র রাত। এমনকী ঘুমের ঘোরেও তিনি স্বপ্ন দেখেছেন সেই রামেরই কালান্তক মূর্তি—*'দৃষ্ট্বা স্বপ্নগতং রামমুদভ্রমামীব চেতনঃ।'* কিন্তু সেও তো মৃত্যুভয়ই! তাই, যখন সেই মৃত্যু নিশ্চিত, শিয়রের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে শমন—তখন মারীচ নিলেন তাঁর অন্তিম প্রতিশোধ। মায়ের, তাড়কার মৃত্যুর সেই শেষ প্রতিশোধ; যার সম্পর্কে এমনকী রামও আর কিছু করতে পারবেন না।

মৃত মারীচকে শাস্তি দেওয়া যে রামেরও অসাধ্য!

হ্যাঁ, জানি আমরা। এক সামান্য রাক্ষসের মৃত্যু নিয়ে এত ভাবনাচিন্তার কথা মহাকবির মাথাতেই আসবে না! স্বাভাবিকভাবেই তাই এই সব কাকদন্তগবেষণের চিহ্নমাত্র বাল্মীকি-রামায়ণে নেই।

নেহাত মারীচের দাগ তোলা গেল না। থেকেই গেল...

ঠুমক চলত রামচন্দ্র...

একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই মাঝবয়সে পৌঁছলে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শৈশব যত দূরবর্তী হতে থাকে, স্মৃতির পিছুটান ততই বলবান হয়ে ওঠে। আপাততুচ্ছ স্মৃতি, মনের উপরিতলে যার আর ঠাঁই ছিল না—সহসা কোন অতল অবচেতন থেকে উঠে এসে চমকে দিয়ে বলে যায়—'আছি।'

আমাদের অল্প বয়সে একেবারে ধূমকেতুর মতো উত্থান ঘটেছিল অনুপ জালোটা নামে এক গায়কের। আজকের প্রজন্ম হয়তো এঁর নাম শুনে থাকলেও গান ততটা শোনেননি। কিন্তু একবার পুজোয়, বিশ্বাস করুন, এমন কোনও মণ্ডপ ছিল না—যেখানে 'অ্যায়সি লাগি লগন' কিংবা 'রঙ্গ দে চুনারিয়া' বাজেনি। তখন রেকর্ডের যুগ যাই যাই করছে, ক্যাসেটের জমানা সদ্য শুরু হচ্ছে। সেই সময় গায়ক-গায়িকাদের এমন আকস্মিক উত্থান খুব ঘটত। বাবাও তালে পড়ে একখানা এল.পি. কিনে নিয়ে চলে এল।

তা সেই গানগুলোর মধ্যেই একটা ছিল 'ম্যায় নেহি মাখন খায়ো।' সেই গানে কৃষ্ণের মাখন-চুরি, এবং সেই চুরি অস্বীকার করার চিরনতুন চিরপুরাতন কাহিনিটি অপূর্ব ভাবে বিবৃত করা হয়েছিল। শুরুর 'ম্যায় নেহি মাখন খায়ো' বলে যে অস্বীকার, তাই-ই অন্তিম চরণে পৌঁছে হয়ে উঠত 'ম্যায়নে হি মাখন খায়ো'—এই স্বীকারোক্তি।

এই গানেরই একটি স্তবকে ভোরবেলায় গোপবালকদের সঙ্গে কৃষ্ণের গোঠে যাওয়া এবং সন্ধ্যায় ফিরে আসার বর্ণনা অনুপ জালোটা দুটি রাগ দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন; তার একটি প্রভাতী ভৈরব, অপরটি সন্ধ্যার ইমন। পরপর দুটি লাইনে দুটি রাগের এই আশ্চর্য প্রয়োগ আমাকে চমকে দিয়েছিল; মনে হয়েছিল—ন'জ্যাঠামণি ছাড়া এর কদর আর কেউ পুরোপুরি বুঝতে পারবে না। আমাদের গানের বাড়িতেও খাঁটি ক্লাসিকালের সমঝদার ছিল আমার ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ন'জ্যাঠামণি। তার মতো আর কেউ ও বিদ্যা জানত না, ও রস বুঝত না। আমার যেটুকু যা টুটাফুটা শিক্ষা, তার বারো আনাই এই মানুষটির কাছে।

পরদিন জ্যাঠামণি আসতেই তাকে তো চেপে ধরে রেকর্ড বাজিয়ে সেই গান শুনিয়ে দিলাম আমি। খুব মাথা নেড়ে নেড়ে শুনল বটে, কিন্তু তারপর বলল, 'এইসব গান শুইন্যা পুরা রস পাবা না, বোঝলা বাবা। আমি সইন্ধ্যাবেলায় আইতেআসি একখান রেকর্ড লইয়া। শোনবা।'

কার কাছ থেকে যেন ধার করে সন্ধ্যায় জ্যাঠামণি নিয়ে চলে এল একখানা রেকর্ড। খবরের কাগজ দিয়ে সযত্নে মুড়িয়ে এনেছে, কাজেই কোনও ছবি-টবি দেখতে পেলাম না। ফলে কোনও রকম পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই সরাসরি তিরের মতো বুকের ভেতর ঢুকে গেল এক আশ্চর্য কণ্ঠস্বর। ওই একই গান, কিন্তু গাওয়ার আঙ্গিক একেবারে আলাদা। সেই প্রথম আমার জীবনে, আমার মর্মে প্রবেশ করলেন পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ।

আমার হতভম্ব দশা দেখে এইবার জ্যাঠামণি ঝোলা থেকে বার করল অমন আরেকটা পুরোনো রেকর্ড। এইবার বেজে উঠল আর এক শাণিত তরবারির মতো কণ্ঠে অন্য একটি গান—'ঠুমক চলত রামচন্দ্র, বাজত প্যায়জনিয়াঁ।' সে গলায় যেমন ধার, তেমন মধু। ডি. ভি. পালুসকরের অমৃতময় কণ্ঠের সঙ্গে সেই প্রথম আমার পরিচয় ঘটল।

একই দিনে এমন দুটি ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতা কজন কিশোরের জীবনে ঘটে—আমার সন্দেহ আছে। আজও ভাবলে গর্ব হয়, এই পরিচয়পর্ব ঘটেছিল কিছু নিতান্ত দরিদ্র এবং তথাকথিত অশিক্ষিত গুরুজনের হাত ধরে। লম্বা ডিগ্রি আর মোটা মানিব্যাগ তাই আজও আমার মতো পাতি বাংলার মাস্টারকে ঘায়েল করতে পারে না।

ধান ভানতে শিবের গীত বাঙালি বরাবর গেয়ে এসেছে, কারণ গান তার রক্তে। কিন্তু আজ আমরা এই গানদুটিকে কেন্দ্র করে ঢুকে পড়ব রামায়ণের এমন এক অন্দরমহলে, বাল্মীকি যেখানে হেলাভরে পা রাখেননি। অথচ তাঁর অনুসারীরা মহানন্দে সেই ধরণীর মধুময় ধূলি সর্বাঙ্গে মেখে নিয়েছেন।

বাল্মীকি রামায়ণে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির করা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ এবং অন্যসব ঝঞ্ঝাট পার করে, দেবতাদের রাবণবধের অনুরোধে বিষ্ণুর রাজি হওয়া ইত্যাদির পালা শেষ হতে জন্ম হল রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের। দাশরথিদের জন্মনক্ষত্র, জন্মতিথি ইত্যাদি বর্ণনা সাঙ্গ করে, নবজাত শিশুদের নামকরণ ও জাতকর্মের কথন শেষ করেই আদিকবি সরাসরি উপনীত হলেন তাঁদের—এবং বিশেষত রামের—শিক্ষার সাফল্য-বর্ণনায়। রাজকুমারেরা সকল প্রকার বাহনে চড়তে দড় হলেন, ধনুর্বেদ আয়ত্ত করলেন, বেদপাঠেও পারঙ্গম হয়ে উঠলেন। *'গজস্কন্ধে'শ্বপৃষ্ঠে চ রথচর্যাসু সম্মতঃ।'* *আবার ওদিকে 'ধনুর্বেদে চ নিরতঃ' এবং 'বৈদিকধ্যায়নে রতাঃ।'*

এরপরেই সোজাসুজি লম্বা একটা লাফ দিয়ে বাল্মীকি এসে পড়লেন সেই দৃশ্যে—যেখানে দশরথের ছেলেদের বয়স বারো পূর্ণ হয়ে গেছে (দশরথ অবশ্য বলেছেন, রামের বয়স পনেরো বছর—'ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো'); এবং তিনি তাঁদের বিয়ে-থা দেওয়া নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন সভায় বসে। এই সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র এসে উপস্থিত হলেন, এবং বললেন, রাক্ষসেরা তাঁর যজ্ঞভঙ্গ করে দিচ্ছে। তিনি রামকে নিয়ে যেতে এসেছেন দশ দিনের জন্য, যজ্ঞরক্ষা করবেন বলে।

এরপরের ঘটনাটি রাম এবং লক্ষ্মণের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সাধারণ রাজকুমারের জীবন ছেড়ে তাঁরা এবার বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষার্থে বেরিয়ে পড়বেন অজানা তারণ্যপথে—যা তাঁদের বাকি জীবনের একটা স্পষ্ট পথরেখা তাঁদের অজান্তেই প্রস্তুত করে দেবে।

কিন্তু আমাদের এ-কথা মনে হতে বাধ্য—কী যেন একটা ছেড়ে গেলেন বাল্মীকি। কী যেন একটা নেই, কিছু একটা অভাব রয়ে গেল যেন বা!

তাই তো! রামের শৈশব কোথায়? এক মানবশিশুর বড় হয়ে-ওঠার দিনগুলির মতো মধুর আর কিছুই হয় না। তার হামাগুড়ি দেওয়া, তার চলতে শেখা, তার আধো আধো কথা, তার শৈশবের বেশবাস, তার খেলাধুলো—এসব বর্ণনা ছাড়াই রামকথায় রাম একেবারে কিশোর হয়ে উঠলেন? তাঁর বিয়ের কথা শুরু হয়ে গেল?
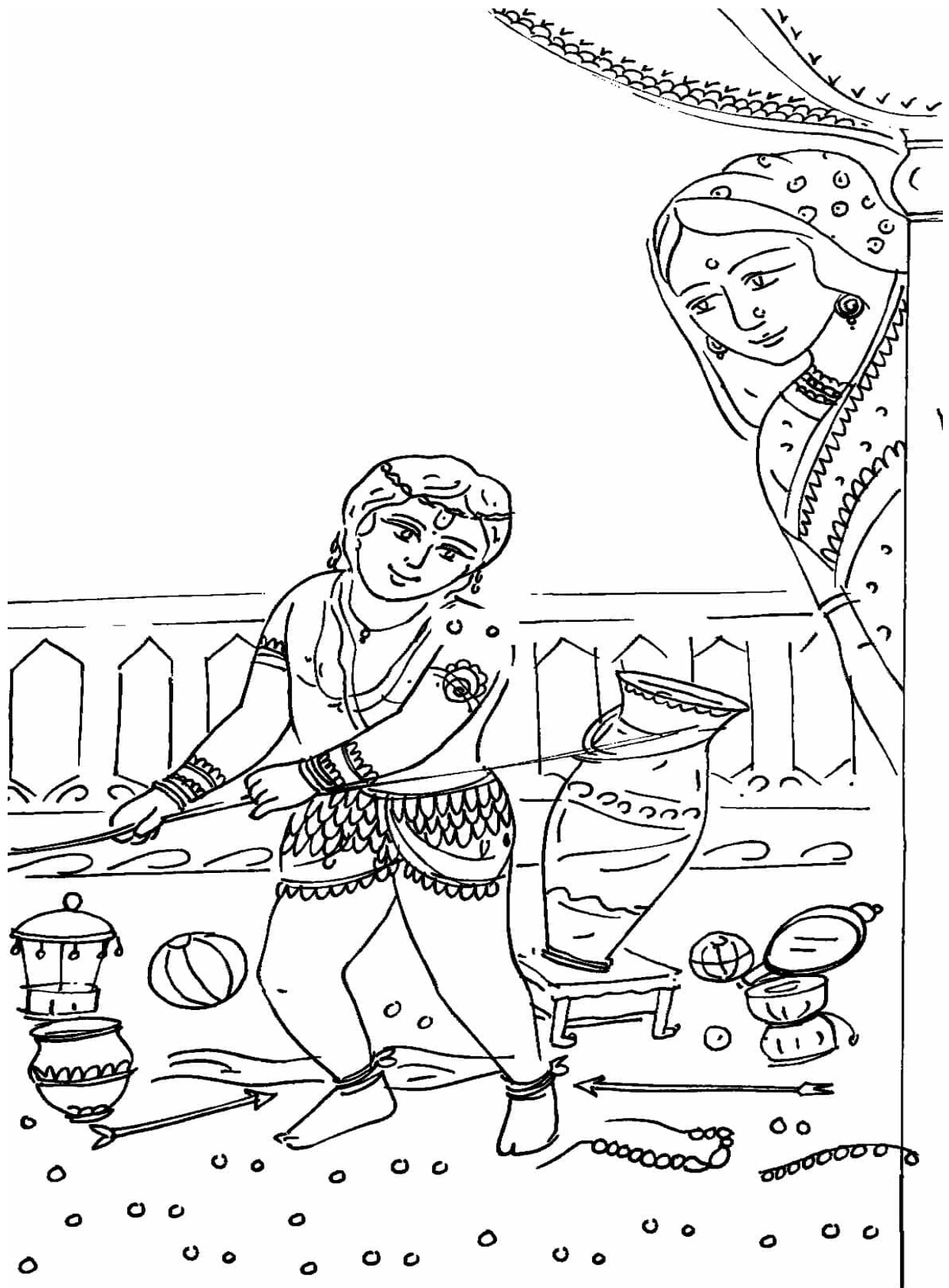
এ বড় অন্যায় কথা। বাঙালি মনন বরাবর ঈশ্বরকে শিশু-রূপে ভজনা করতে ভালোবেসেছে। বৈষ্ণবীয় পঞ্চরসের চতুর্থটি যে বাৎসল্য—তা ভুললে চলবে কেন?

বাঙালি মননের চিরন্তন প্রতীক কৃত্তিবাস সে অভাব পূরণ করে দিলেন অপূর্ব শাশ্বত কিছু পঙক্তিতে; স্বীকার করতে বাধা নেই—যা বাল্মীকির পক্ষে রচনা করা সম্ভব ছিল না। এ-সকল পঙক্তি মহাকবির লেখনি থেকে নিঃসৃত হতেও পারে না।

'ছয় মাসের হইল রাম দেন হামাগুড়ি।
হাসিয়া মায়ের কোলে যান গড়াগড়ি।।
ক্ষণেক মায়ের কোলে ক্ষণে পিতৃকোলে।
বদনে না আসে কথা আধো আধো বোলে।।'

এই যেন আমাদের সোনার তরীটি এসে ঠেকল আমাদের চেনা কূলে। এইবার এই রামকে সযত্নে কোলে নেওয়া চলে, তার অঙ্গের ধুলো ঝেড়ে দেওয়া চলে; এমনকী গোকুলের সেই গরু চরিয়ে-বেড়ানো বালকটির সঙ্গে তার যে গভীর আত্মিক মিল—তাও অনুভব করা চলে অনায়াসে—'পীতধড়া পরিধান গলে স্বর্ণকাঠি।' হ্যাঁ এইবার দিব্যি চেনা লাগছে এই বালকটির 'রত্নের নুপুর পায় রুনুরুনু ধ্বনি!' কারণ এইবার আমাদের মনে পড়ে গিয়েছে আর এক বালকের কথা। রাজপুত্র মোটেই ছিল না সে। গোপবালক হিসেবে বৃন্দাবনে বড় হয়েছিল সেই বালকটি। মিলের মধ্যে—তারা দুজনেই শ্যামবর্ণ আর অপূর্ব সুন্দর। কিন্তু এমনকী বসনের রংটি পর্যন্ত তাদের এক—'সোনার গোধূলি যেন নিবিড় সুনীল নভে, পীতধড়া পরো কালো অঙ্গে।'

শ্রীকৃষ্ণের শৈশব যে বাঙালিকে অনন্তকাল ধরে বাৎসল্য রসের অনন্ত প্রস্রবনে স্নান করিয়ে এসেছে—সে কথার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে বৈষ্ণব পদাবলীর সর্বত্র। কৃত্তিবাস যে সেই একই মানসিকতায় নিষ্ণাত হবেন, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই একই মানসিকতা থেকে আমরা দশপ্রহরণধারিণী দুর্গাকে ঘরের মেয়ে করে তুলেছি; মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শৈশবগীতি রচে গেয়ে বেড়িয়েছি টহলের গান—'প্রভাতসময়ে শচীর আঙিনার মাঝে গৌরচাঁদ নাচিয়া বেড়ায় রে!' আর নজরুল—যাঁর একটি পঙক্তি ইতিমধ্যেই আমরা ব্যবহার করে ধন্য হয়েছি, তিনি তাঁর মহাজাগতিক কল্পনায় দেখেছেন এক বিরাট শিশুর ছবি—'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে, বিরাট শিশু আনমনে।' 'বিরাট শিশু'—এই আপাত ব্যস্তানুপাতিক আশ্চর্য কল্পনাটি বাঙালি মননে সার্থকতম দ্যোতনা ছড়িয়ে রাখে। তিনি ঈশ্বর, পরমেশ্বর; আবার শিশুও বটে!

আর উত্তর ভারতের মননপুরুষ তুলসীদাস! তিনি তো প্রথমাবধি রামকে পরমেশ্বর মেনে নিয়েই রামের চরিতকথা রচনা করা শুরু করেছিলেন। জন্মের কিছুদিন পরেই তিনি মাতা কৌশল্যাকে দেখিয়েছিলেন তাঁর বিশ্বরূপ—অগণিত চন্দ্র-সূর্য গিরি-নদ-নদী শিব-ব্রহ্মা তাঁর প্রতি রোমকূপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু তারপরই আমরা তাঁকে দেখি চিরন্তন শিশুর রূপে :

'কৌসল্যা জব বোলন জাঈ।
ঠুমুকু ঠুমুকু প্রভু চলহিঁ পরাঈ।।'

অমনি মনে পড়ে গেল আমাদের আজকের লেখার শিরোনাম দখল করে নেওয়া সেই গানটার কথা—'ঠুমক চলত রামচন্দ্র, বাজত প্যায়জনিয়াঁ।' স্বাভাবিক! কারণ এই অপূর্ব গানটি, যা রামের বাল্যলীলার চিরকালীন অবিনশ্বর সুরটিকে ধরে রেখেছে, তাও যে তুলসীদাসই রচেছিলেন একদা! সেই অপরূপ বর্ণনা কে, কবে ভুলতে পেরেছে :

'কিলকি কিলকি উঠত ধায়,
গিরত ভূমি লটপটায়,
ধায় মাত গোদ লেন—
দশরথ কী রনিয়া।'

এই মাটিতে লুটিয়ে পড়া ধূলিধূসর শ্যামবর্ণ শিশুটি, যে মায়ের ক্রোড়ে ওঠার জন্য ছুটে যাচ্ছে—সে যে বিরাট, সে যে অনন্তেরই প্রতিবিম্ব, তাও ভোলেন না তুলসীদাস :

'নিগম নেতি শিব অন্ত না পাওয়া।
তহি ধরৈ জননী হঠি ধারা।'

শ্রুতি-নেতি-শিব যাঁর অন্ত পান না, তাঁকে ধরার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছেন কৌশল্যা! এ যেন অসীমের পিছু পিছু হেঁটে যাওয়া সীমারই প্রতিচ্ছবি!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে যে আমাদেরই ঘরেরই ছেলেটা গো! ওই দ্যাখো—এখনও তার খাওয়া শেষ হল না, পলায়মান শিশুর মুখে এখনও লেগে আছে দুধভাত—'ভাজি চলি কিলকত মুখ, দধি ওদন লটপটাই।'

স্বয়ং অসীম অনন্ত ঈশ্বরকে এক শিশুর শরীরে, তার শৈশবতারল্যের মধ্যে দেখতে পাওয়ার যে অনন্ত মাধুর্য—তা আমাদের কবিরা বারবার দেখিয়েছেন কখনও কৃষ্ণ, কখনও রাম, কখনও দুর্গা বা গণেশকে কেন্দ্র করে। তার তুল্য আনন্দ আর কোথায়!

'তুলসীদাস অতি আনন্দ। দেখক মুখারবিন্দ।
রঘুবর ছবি-কে সমান। রঘুবর ছবি বনিয়াঁ।।'

শুধু রঘুবর রামচন্দ্রের একটি সার্থক ছবি বানিয়ে, তাঁর মুখ দেখতে পেয়ে তুলসীদাসের আনন্দ আর ধরে না! ইনি উত্তর-ভারতে আদিকাল থেকে পূজিত 'রামলালা'—শ্রীরামের বাল্যরূপ। বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে এঁকেছেন একজন প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীরকে। বীরত্বের আদর্শে তাঁর কোনও ত্রুটি নেই, আর যেখানে আছে—সেখানে বাল্মীকিও অকরুণ। তিনি রামের হয়ে অজুহাত না-দিয়ে 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' ভাব ধারণ করেন, অর্থাৎ তাকে 'লীলা' বলে আড়াল করার চেষ্টা করেন না। তাই রামের বালককালের কথা, তাঁর শৈশবতারল্য বাল্মীকির পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। রামায়ণে তাই সেসব আপাত-গুরুত্বহীন কথার স্থান হয় না।

কিন্তু পরবর্তী কালের ভক্তিবাদ এসে রাম চরিত্রকে যখন আমূল পরিবর্তিত করে দিল; এবং সবচেয়ে বড় কথা—কৃষ্ণলীলা যখন কৃষ্ণের বালককালের কথাকে বাৎসল্যরসের আকর করে তুলল—তখন রামের শৈশবও হয়ে উঠল বর্ণনীয় বিষয়। কৃষ্ণের ক্ষেত্রে যেমন অসুরবধ বৃত্তান্তের পাশেই স্থান করে নিল মাখন চুরির কথা; রামের ক্ষেত্রেও তেমন শুধু রাবণবধ নয়, সম্পূর্ণ মানুষটিই আমাদের প্রিয় হয়ে উঠলেন। আর সেই নবদূর্বাদলশ্যাম রঘুপতির শৈশবক্রীড়া হয়ে উঠল আমাদের বড় প্রিয়। পরম ভক্ত তুলসীদাস অবশ্য এর মধ্যেও দেখেছেন ভক্তির পারম্য; কারণ রামের বাল্যলীলা শুনলে মহাপুণ্য লাভ হয়।

'বালচরিত অতি সরল সুহাএ।
সারদ সেষ সম্ভু শ্রুতি গাএ।।
জিহ্ন কর মন ইহ্ন সন নহিঁ রাতা।
তে জন বঞ্চিত কিএ বিধাতা।।'

যে ব্যক্তি রামের সহজ সরল বাল্যলীলা শ্রবণ করে অন্তরে সুখ অনুভব করে না—সে বড় দুর্ভাগা।
আর কৃত্তিবাস দশরথকে উপলক্ষ করে বলেন আপামর ভক্তদেরই কথা—

'ব্রহ্মা আদি যাঁর পদ না পান মননে।
পুনঃ পুনঃ চুম্ব দেন তাহার বদনে।।'

এই হল আসল কথা। 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।' দেবতাকে শুধু দূর থেকে প্রণাম করা যায়, মাল্যচন্দনে সজ্জিত করে ধূপদীপে পূজা করা যায়। কিন্তু আমাদের যে আবার তাতে মন ওঠে না! আমরা যে দেবতাকে কোলে নিয়ে তার মুখে একটা স্নেহচুম্বনও এঁকে দিতে চাই!

আর তাই, ক্ষত্রিয় মহাবীর রাম বাল্মীকির আঁকা বীরোচিত বর্মচর্ম আর 'বলা-অতিবলা' কিংবা ভয়ঙ্কর 'সংহার মন্ত্র' ভুলে নিতান্ত সরল শিশুটি হয়ে আমাদের অনুবাদের আঙিনায় এসে ধরা দেন। সেখানে তিনি ঠুমক ঠুমক চলেন, না-খেয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, আর তাঁর মুখে লেগে থাকে দুধভাত!

অনেকটা যেন আমাদের ঘরের শিশুটির মতোই—যার মধ্যে দিয়ে কখনও-না-কখনও সমস্ত পিতা, সকল মাতারই বিশ্বরূপ দর্শন হয়েছে!

আগুন দেখেছি আমি...

সম্প্রতি রামচরিত্রকে উগ্রতেজে গালিগালাজ না-করলে প্রগতিশীল হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। একেই বাঙালি বরাবর প্রতিষ্ঠান-বিরোধী আগুনে জাতি, তার উপর ইদানীং নানান রাজনৈতিক কারণও জুটে গেছে বাঘের পিছে ফেউয়ের মতো। ফলে রাম যে কী ভয়ানক লোক ছিল—সে কথা শতমুখে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছি আমরা। এই সব চারিত্র্যদোষের মধ্যে সবচেয়ে জোরালো ভঙ্গিতে বলা হয় যেটা, সেটা হল 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা'। অগ্নিপরীক্ষার নামে যে রাম সীতাকে—এক অবলা গৃহবধূকে—আসলে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন, এ বিষয়ে কারোর আর কোনও সন্দেহ নেই এখন। আর কেন তিনি এই ঘৃণ্য কর্ম করতে চেয়েছিলেন—তা তো জানিই আমরা! সন্দেহ! স্ত্রীকে সন্দেহ করতেন তিনি; সন্দেহ ছিল—রাবণ নিশ্চয়ই সীতাকে ধর্ষণ করেছেন। এরপর যে-কোনও মেরুদণ্ডহীন কিম্পুরুষ যে স্ত্রী বেচারিকে পুড়িয়ে মারতে চাইবে—তা তো স্বাভাবিক!

এবং গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি—রাম সীতার অগ্নিপরীক্ষা নিতেই চাননি আদৌ! তাতে অবশ্য তাঁর দোষের প্রক্ষালন হয়ে যাচ্ছে না এক্ষেত্রে, কেন-না একেবারে পুড়িয়ে দিতে না-চাইলেও রাম সীতার উদ্দেশ্যে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করেছিলেন—তার দাহ অগ্নিদাহের অধিক। কিন্তু এই কথাটুকু তাতে মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে না যে, রাম অগ্নিপরীক্ষা নিতে চাননি আদৌ!

আগেই দেখেছি আমরা—রামায়ণের আদিকাণ্ডের প্রথম এবং তৃতীয় সর্গে রামকাহিনি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে দুবার করে। মজার ব্যাপার হল, যে যুদ্ধ চলবে প্রায় আস্ত একটা কাণ্ড জুড়ে; সেই রাম-রাবণের যুদ্ধটাই প্রথম সর্গে আদিকবি বর্ণনা করে সাঙ্গ করেছেন মাত্র একটি পঙক্তিতে—*'তেন গত্বা পুরীং লঙ্কাং হত্বা রাবণমাহবে...।' 'লঙ্কায় গিয়ে, রাবণকে বধ ক'রে...।'* ঝানু পাঠকেরা নিশ্চয়ই 'হত্বা' শব্দটি যে অসমাপিকা ক্রিয়া, তা বুঝে ফেলেছেন। কাজেই বলে রাখা দরকার, এর পরের পঙক্তিটিই আমাদের বিস্মিত করার পক্ষে যথেষ্ট—*'রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য পরাং ব্রীড়ামুপহমৎ।'* 'রাম সীতাকে ফিরে পেলেন, এবং অতিশয় লজ্জিত হলেন।'

লজ্জিত!! কেন? যে স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার জন্য এত যুদ্ধ, এত মৃত্যু, এমন রক্তসমুদ্র পার হয়ে-আসা— তাঁকেই পেয়ে রাম 'লজ্জিত' হলেন! আশ্চর্য!

কিন্তু এহ বাহ্য। বিস্ময়ের এখনও বাকি আছে। পরের শ্লোকগুলোকে সাদামাটা বাংলা করলে এইরকম দাঁড়াবে—'সকলের সামনেই রাম সীতাকে এমন সব কথা বললেন যে, সীতা সেসব কথা সহ্য করতে না পেরে অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। শেষে অগ্নির কথায় রাম নিশ্চিত হলেন যে সীতা নিষ্পাপ; তাই তিনি সীতাকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করলেন, দেবতারা পর্যন্ত তাতে খুশি হয়ে রামের পূজা করতে লাগলেন।'

যাচ্চলে! সীতাকে উদ্ধারের জন্যই এত উদ্যোগ, এত আয়োজন; আর তাকে ফিরে পেয়ে লজ্জিত হয়ে তাকেই অপমান করা, এবং তারপর অগ্নির কথায় সেই অপমানিত গৃহিণীকেই গ্রহণ করার ফলে দেবতাদের আহ্লাদিত হওয়া—নাঃ, এই কর্মপরম্পরার মধ্যে থেকে বিন্দুমাত্র লজিক খুঁজে বের করা কোনও সুস্থ মানুষের কম্ম নয় মশাই! কিন্তু না, এই আপাত-বিশৃঙ্খলার মধ্যেও আছে বইকি এক ধরনের যুক্তিস্রোত! তা বুঝতে হলে আমাদের আর একটু কাছ থেকে দেখতে হবে এর পূর্বের অংশটিও।
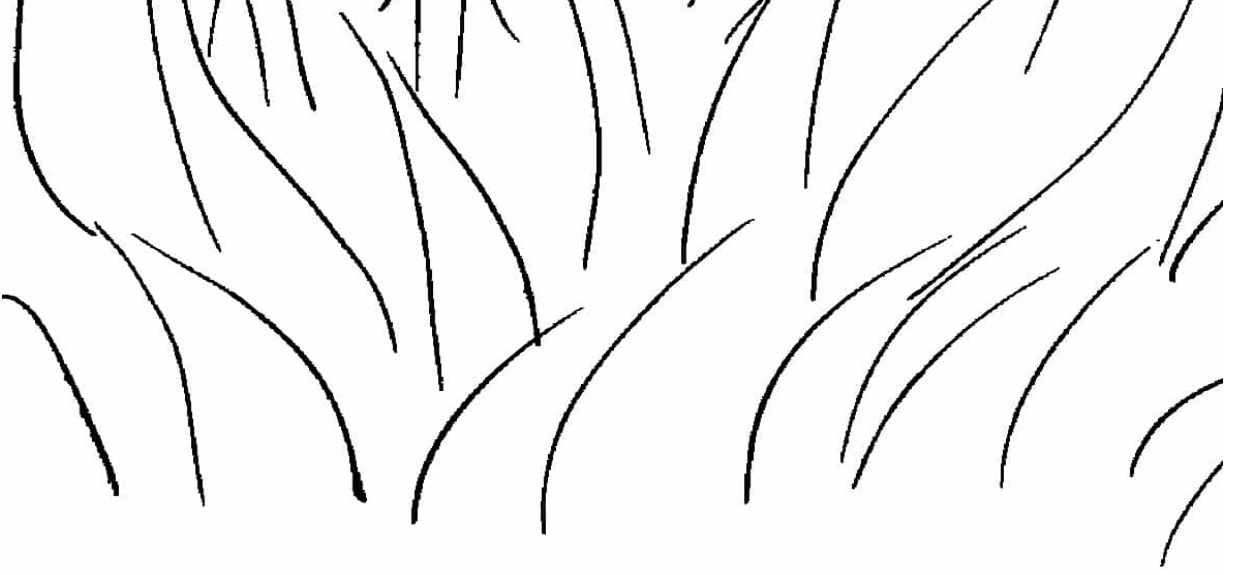
যুদ্ধকাণ্ডের পঞ্চদশাধিকশততম (১১৫) অধ্যায়ে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হনুমানকে পাঠানো হল সীতাকে সুসংবাদ দিতে—রাবণ হত হয়েছেন। সীতা বিস্তর আহ্লাদ প্রকাশ করলেন, কান্নাকাটিও করলেন। প্রিয়মিলনের ক্ষণ আসন্ন ভেবে উদ্ভাসিত হলেন। রাম এরপর স্বয়ং বিভীষণকে পাঠালেন সীতাকে নিয়ে আসার জন্য। বলে দিলেন—সীতা যেন স্নান সেরে, দিব্য অলঙ্কারে সাজসজ্জা করে আসেন পতির কাছে। সীতা স্নানাদি সেরে শিবিকায় চড়ে রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কিন্তু পরে রাম অদ্ভুতভাবে মত পাল্টে ফেললেন; বললেন—সীতা যেন পায়ে হেঁটেই তাঁর কাছে আসেন।

আশ্চর্যের বিষয় হল, যে সীতাকে উদ্ধারের জন্য এত যুদ্ধ, এত রক্তপাত—তাঁকে দেখা-মাত্র বিচিত্র পরিবর্তন ঘটল রামের ব্যবহারে। প্রথমে হনুমান-সুগ্রীবদের ধন্যবাদ জানিয়ে নিয়ে তারপর রাম স্পষ্ট বললেন, 'তোমার জন্য আমি এ যুদ্ধ করিনি। করেছি আপন সম্মান রক্ষার জন্য। বংশের মর্যাদা রক্ষার জন্য। তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ জন্মেছে, *"প্রাপ্তচারিত্রসন্দেহা মম"!'* যে স্ত্রী বহুকাল পরের গৃহে বাস করেছে, কে তাকে আবার গ্রহণ করবে? রাবণ তোমায় কুদৃষ্টিতে দেখেছে, ক্রোড়ে নিয়েছে—*'রাবণাঙ্কপরিক্লিষ্টাং দৃষ্টাং দুষ্টেন চক্ষুষা।'* অতএব আমি আবার তোমায় গ্রহণ করে আমার পবিত্র পিতৃকুল কলঙ্কিত করতে পারব না। তুমি লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন—যার সঙ্গে খুশি থাকতে পার; এমনকী সুগ্রীব বা বিভীষণের কাছেও আত্মসমর্পণ করতে পার। তোমার অলোকসামান্য রূপ দেখেও রাবণ যে তোমায় ক্ষমা করেছে—আমার তা মনে হয় না।'

তীব্র, অসহ লজ্জায় সীতা যেন নিজের দেহের মধ্যে প্রবেশ করলেন। (এটি আমার অসম্ভব প্রিয় শ্লোক; *'প্রবিশন্তীব গাত্রাণি স্বান্যেব জনকাত্মজা।'*) এরপর তিনি নিজের স্বামীকে যে তীক্ষ্ন ভাষায় তিরস্কার করেছেন—তা নারীস্বাধীনতার এক উজ্জ্বল অধ্যায়। কিন্তু সে কথা অন্যত্র আলোচ্য। তারপর কাঁদতে কাঁদতে লক্ষ্মণকে বললেন, 'এমন মিথ্যা অপবাদ নিয়ে আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না। এর একমাত্র ঔষধ—অগ্নি। চিতা প্রস্তুত কর লক্ষ্মণ, আমি অগ্নিতে প্রবেশ করে কর্মানুরূপ গতি লাভ করব।'

লক্ষ্মণ প্রবল ক্ষোভে রামের দিকে তাকালেন, তারপর ইঙ্গিতে তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে চিতা প্রস্তুত করতে গেলেন। অধোমুখে বসে থাকা রামকে প্রদক্ষিণ করে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির কাছে গেলেন সীতা। করজোড়ে বললেন, 'আমার মন কখনও রাম থেকে বিচলিত হয়নি, আমি কায়মনোবাক্যে কখনও তাঁকে অতিক্রম করিনি; সুতরাং বিভাবসু আমাকে রক্ষা করুন।' এই বলে চিতা প্রদক্ষিণ করে, নিঃশঙ্কচিত্তে অগ্নিতে প্রবেশ করলেন।

এখন, সীতার অগ্নিপ্রবেশ নিয়ে কিন্তু আমাদের কিচ্ছুটি বলার নেই। সকল কালের কবিরাই বর্ণনা করেছেন এই অগ্নিপ্রবেশ-ঘটনার। সেই তালিকায় আছেন দুই সর্বাধিক প্রভাবশালী অনুবাদক কৃত্তিবাস এবং তুলসীদাস

—দুজনেই। কিন্তু এঁদের বর্ণনায় যে সামান্য বিবিধতা আছে—সেটুকুই চিনিয়ে দেয় এঁদের আপন আপন মননশীলতার বৈশিষ্ট্যকে।

কৃত্তিবাস প্রায় আগাগোড়া অনুসরণ করে চলেছেন বাল্মীকিকে। সেই একই তিরস্কার, সেই একইরকম রুক্ষ অশীলিত ভাষা। সীতার তীব্র প্রতিক্রিয়াও চলেছে বাল্মীকির পথেই। শুধু সীতা যখন লক্ষ্মণকে চিতা সাজাতে বলেন—তখন সেই পূর্বনির্ধারিত পথের নীরবতা পরিত্যাগ করে রাম সহসা মুখর হয়ে ওঠেন :

'লক্ষ্মণ রামের স্থানে চাহেন সম্মতি।
শ্রীরাম বলেন কুণ্ড সাজাও সম্প্রতি।।
সীতার জীবনে ভাই কিছু নাহি কাজ।
অগ্নিতে পুড়ুক সীতা দূরে যাক লাজ।।'

বাল্মীকির রামের ওই নীরবতায় যে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল, এই মুখরতায় তা নেই। কিন্তু ভক্ত কৃত্তিবাস রামের এই ক্রূর আচরণেরও একটি কৈফিয়ত দিয়ে রেখেছেন পূর্বাহ্নেই। অশোকবন থেকে সীতার বিদায়কালে তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন মন্দোদরী ও অন্যান্য রাক্ষসপত্নীরা :

'মন্দোদরী বলে শুন জনকনন্দিনী।
তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী।।
এ আনন্দ নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ।
বিষদৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ।।'

অপরদিকে পরম রামভক্ত তুলসীদাস দায় তুলে দিয়েছেন অন্তর্যামীর স্কন্ধে :

'সীতা প্রথম অনল মহুঁ রাখি।
প্রগট কীনহ চহ অন্তর সাথী।।'

এই কারণেই সীতার অগ্নিপ্রবেশ। অগ্নিপরীক্ষা নয় কিন্তু! মনে রাখতে হবে, সীতার আদেশে লক্ষ্মণের চিতা প্রস্তুতির দৃশ্যটি কিন্তু বাল্মীকি, কৃত্তিবাস বা তুলসীদাস—কেউই এড়িয়ে যাননি।

হ্যাঁ, অবশ্যই রাম সীতাকে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করতে প্ররোচিত করেছিলেন। এতদূর অপমান করেছিলেন এই বীর্যবতী নারীকে যে, তাঁর অন্য কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু 'অগ্নিপরীক্ষা' দিতে বলেননি একবারও। এখানেই আমাদের এক বিপুল ভ্রান্তি। সে ঘটনা ঘটবে অনেক পরে—'উত্তরকাণ্ড'-এর অষ্টাধিকশততম (১০৮তম) অধ্যায়ে। সে কথা থাক এ যাত্রায়।

সীতাহরণ পালা : লক্ষ্মণের গণ্ডি

আমরা যারা সত্তরের দশকে উদ্বাস্তু কলোনিগুলোতে জন্মেছি, তারা এক বিচিত্র শৈশব পার হয়েছি। জন্মেই দেখি—না না, ক্ষুব্ধ স্বদেশ-ভূমি নয়; চারিদিকে সবাই বাঙাল। নানান জেলা থেকে আসায় তাদের ভাষা থেকে তর-বেতর উপভাষার গন্ধ বের হত। খুলনার ভাষা আর চট্টগ্রামের ভাষা যে কতটা আলাদা—তা না-শুনলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। তার ওপর ছিল একটা জেলাভিত্তিক বিভাজন; অর্থাৎ এক পাড়ায় ঢাকা থেকে আসা উদ্বাস্তুরা একসঙ্গে থাকতেন, আবার অন্য পাড়ায় সেটাই হয়ে যাবে বরিশাল বা যশোর কিংবা ফরিদপুর। ঝগড়াঝাঁটির সময় জেলা তুলে গালাগাল দেওয়ার রেওয়াজ তাই ছিল খুব।

তাই বলে এটা কেউ অস্বীকার করতেন না আর ভুলেও যেতেন না যে—শেষ পর্যন্ত তাঁরা হলেন বাঙাল। অতিশয় গর্বিত, লড়াকু; সর্বহারা হয়েও নিজের সংস্কৃতি, নিজের ভাষাকে, নিজের জেদকে সম্বল করে লড়ে-যাওয়া একদল ভাগ্যহত মানুষ। মা কালীর দিব্যি বলছি—'পিঠে কাঁটাতারের দাগ আছে' কথাটা যে কাঁচা গালাগালি—তা ফেসবুক তৈরি হওয়ার আগে আমি শুনিনি। আমাদের কাছে আসল ছিল বাপ-জ্যাঠার লড়াইটা।

আর সেই লড়াইয়ের এক অমোঘ মহানায়ক ছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙালদের মসিহা।

তো সেই সময় শুধু সিনেমা নয়, ভানুর প্রবল খ্যাতি আরও ছড়িয়ে দিয়েছিল তাঁর নকশাগুলো। ছোটখাটো মজাদার ঘটনায় ভানুর আশ্চর্য উচ্চারণ এবং সগর্ব বাঙাল উপস্থিতি, এবং সর্বোপরি সব ঘটনাতেই একজন বাঙাল হয়েও ভানুর জিতে যাওয়া—ইস্টবেঙ্গলের জয়ের মতোই আমাদের উদ্বুদ্ধ করত। এরই মধ্যে একটি ছিল 'নব রামায়ণ।'

বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র থেকে ঘর ভাড়া নিতে-আসা আসা দুটি ছেলেমেয়েকে ভানু তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় রামায়ণের নানান ঘটনার নতুন ব্যাখ্যা দিচ্ছেন—এই হল এটির মোদ্দা বিষয়। তার মধ্যে একটি আজও আমার যেন কানে লেগে রয়েছে। 'মাইয়া-মানুষরে' যেটা বারণ করা হয়, সেটাই যে তারা অতিরিক্ত পরিমাণে

করতে থাকে, এর উদাহরণ দিতে গিয়ে ভানু টেনে এনেছিলেন সীতাহরণের প্রসঙ্গ। তাঁর মতে, লক্ষ্মণ 'গণ্ডি কাইটা পইপই কইরা কইয়া গেল, ''বৌঠান, গণ্ডির বাইরে যাইও না।'' তোর ফাইজলামি কইরা গণ্ডির বাইরে যাওনের কোন কাম আছিল?'

মহাকাব্যের মহানায়িকা জনকতনয়া সীতা সম্পর্কে 'ফাইজলামি' শব্দটির প্রয়োগে আমরা হেসে গড়িয়ে পড়তাম। কিন্তু অন্তত আমার কাছে তার চেয়েও আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল লক্ষ্মণের অসামান্য সংলাপটি, যেখানে তিনি সীতাকে 'বৌঠান' বলে সম্বোধন করছেন। একে এই খাঁটি বাঙালি সম্বোধনটি, তার উপরে অন্তত ভানু যেভাবে কথাটি উচ্চারণ করতেন—তাতে এ বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহই ছিল না যে, যখন এই ঘটনা ঘটেছিল, তখন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চিত ভাবে অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন, পাশেই কোনও দোকানে রেশন তুলতে গিয়েছিলেন। এ হল একেবারে যাকে বলে 'প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা।'

ছোট্ট এই নকশাটিতে ভানুর অভিনীত চরিত্রটি যে ক্রমাগত মেয়েদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে চলে, তার মধ্যে নিহিত অন্যায়টা ওই বয়সে আমাদের মাথায় ঢুকত না। আর সেটা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ও নয়। কথা হল, এই গণ্ডি টেনে দেওয়ার ব্যাপারটা ভারী গোলমেলে হয়ে উঠবে আমাদের আজকের আলোচনায়।

সীতাহরণ-বৃত্তান্ত বস্তুত কৈকেয়ীর বর-প্রার্থনার মতোই রামায়ণের পক্ষে একটি নির্ণায়ক ঘটনা; কারণ এর পর থেকেই মহাকাব্যের মোড় ঘুরে যায় একেবারে অপ্রত্যাশিত দিকে। ভুললে চলবে না, এর আগে পর্যন্ত বাল্মীকি-রচিত রামায়ণে রাবণের বিশেষ উল্লেখ পর্যন্ত নেই, এবং যেখানে রয়েছে—সেখানেও তা নিছক উল্লেখই মাত্র (রাম ও তাঁর ভ্রাতাদের জন্মগ্রহণ-প্রসঙ্গে দেবতারা রাবণের অত্যাচারের কথা জানাচ্ছেন ব্রহ্মাকে, এবং বিষ্ণু সম্মত হচ্ছেন চারভাগে বিভক্ত হয়ে দশরথের পুত্র হিসাবে জন্ম নিয়ে রাবণবধ করতে)।

সুতরাং কাহিনির প্রায় মধ্যপথে লঙ্কেশ্বরের এই প্রবল প্রবেশ শুধু সীতাকে নয়, আমাদেরও সম্পূর্ণ অভিভূত করে ফেলে; এবং এরপরের কাহিনিকে সবলে অন্য পথে টেনে নিয়ে চলে।

কিন্তু রামায়ণের অন্যতম প্রধান এই ঘটনাটির যে অনুষঙ্গটি বিখ্যাততম—তা হল ওই লক্ষ্মণের এঁকে দেওয়া গণ্ডিটি। ছোটবেলায় পড়া সেই 'ছবিতে রামায়ণে' দেখা ছবিটি আমাদের অনেকেরই স্মৃতিপটে অবিকল আঁকা আছে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'-তে শ্যাম নামের সেই ভৃত্যটি বালক রবীন্দ্রনাথকে জানলার পাশে বসিয়ে গণ্ডি টেনে দিত। সেই গণ্ডি পেরোনোর সাহস বালকের ছিল না, কারণ 'গণ্ডি পার হইয়া সীতার কী সর্বনাশ হইয়াছিল, তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম।'—লিখে গেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্য ছেড়ে যদি বেরিয়েও আসি, তাহলেও লক্ষ্মণের টেনে-দেওয়া এই গণ্ডি আমাদের পিছু ছাড়বে না। প্রবাদের মতো আমাদের তা মনে করিয়ে দেবে—লক্ষ্মণের গণ্ডি পেরোতে নেই; ইস্তক আরশোলা মারার বিষের নাম পর্যন্ত 'লক্ষ্মণরেখা!'

হায় লক্ষ্মণ! কপালটা তোমার সত্যিই খারাপ। যে গণ্ডি এক অমোঘ অলঙ্ঘ্য নিষেধাজ্ঞার প্রতীক হয়ে উঠল গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে, তা শেষে পর্যবসিত হল কিনা পোকা-মারা বিষে! যা একদিন দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী দশাননকে প্রতিহত করেছিল সফলভাবে, আজ তা...

যাক গে'। দুঃখ করে লাভ নেই। কারোর কারোর কপাল অমনই হয়।

কিন্তু কথাটা সেই প্রাচীন। 'তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম' তো বটে, কোন রামায়ণ? কোথায় আছে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ?

বেশ, সর্বাগ্রে তাহলে দেখে নেওয়া যাক কৃত্তিবাসের দেওয়া বিবরণটা। কারণ, স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথের দাবি অনুযায়ী 'রামায়ণে পড়িয়াছিলাম' কথাটা তখনও অসম্ভব; এটি তাঁর যে বয়সের বর্ণনা, তাতে মনে হয় তিনি সম্ভবত কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠ শুনে থাকবেন। তৎকালে ঠাকুরবাড়ির মতো পরিশীলিত পরিবারের অন্দরমহলে কৃত্তিবাসী রামায়ণের নিয়মিত পাঠ একটি অত্যন্ত সম্ভাব্য ঘটনা। কাজেই আগে আমরা কৃত্তিবাসের প্রদত্ত বিবরণী অনুসরণ করব।

মারীচ ছদ্মবেশে এসে রামকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল অরণ্যের গভীরে। সীতা এবং রাম—দুজনেই স্বর্ণমৃগ দেখে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। সীতা তো রীতিমতো মুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনি এই হরিণের চর্মের আসনে রামের পাশে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। লক্ষ্মণ কিন্তু মারীচকে চিনতে ভুল করেননি। তিনি জানতেন, এ এক মায়াবী রাক্ষসের ছলনা-মাত্র, এর পশ্চাতে কোনও বৃহত্তর ষড়যন্ত্র আছে। কৃত্তিবাসের ভাষায় :

'লক্ষ্মণ মৃগের রূপ করি নিরীক্ষণ।
শ্রীরামে বলেন কিছু প্রবোধ বচন।।
মায়াবী মারীচ, শুনিয়াছি মুনি মুখে।
পাতিয়া মায়ার ফাঁদ আপনার সুখে।।
রূপে ভুলাইয়া আগে মন সবাকার।
বনে গিয়া রক্তমাংস করয়ে আহার।।'

এর পরবর্তী ঘটনা সর্বজনবিদিত। রাম লক্ষ্মণের কথা শুনলেন না; তিনি লক্ষ্মণকে সীতার প্রহরায় রেখে, স্বয়ং ধনুর্বাণ নিয়ে মারীচের পিছনে গেলেন; এবং বৃক্ষের অন্তরাল থেকে তা সমস্তই দেখে নিলেন স্বয়ং রাবণ।

এদিকে মারীচের পশ্চাদ্ধাবন করার কিছুক্ষণের মধ্যেই রাম বুঝতে পারলেন, এই মায়ামৃগ নিশ্চিতভাবেই রাক্ষস, এবং সম্ভবত লক্ষ্মণের কথাই সত্য। তিনি আর জীবন্ত মৃগ ধরার চেষ্টা না-করে এক ভয়ঙ্কর বাণের

আঘাতে সেই মৃগকে বধ করলেন। বাণবিদ্ধ মারীচ স্বমূর্তি ধারণ করে রামের কণ্ঠ অনুকরণ করে 'লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।'

কুটির থেকে সেই দূরাগত কাতর আহ্বান শুনতে পেয়ে সীতা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি লক্ষ্মণকে বললেন 'দ্রুত যাও দেবর লক্ষ্মণ।' রাম যে মহাবিপন্ন হয়েই লক্ষ্মণকে আর্তস্বরে ডাকছেন, সে বিষয়ে সীতার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না।

লক্ষ্মণ স্বভাবতই এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। রাম তাঁকে আদেশ করে গিয়েছিলেন, তিনি যেন সর্বাবস্থায় সীতাকে রক্ষা করেন। সেই আদেশ লঙ্ঘন করার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া সীতার চেয়ে তিনি অনেক ভালো করে জানেন, রামের প্রাণ বিপন্ন করতে পারে এমন—কোনও রাক্ষসের অস্তিত্ব ইহলোকে নেই। অগ্রজের বীরত্বের প্রতি লক্ষ্মণের কোনও স্ফীত ধারণা ছিল না, ছিল অতুলনীয় আত্মবিশ্বাস। এক্ষেত্রে সেই আত্মবিশ্বাসে আঘাত লাগার কোনও কারণ তিনি খুঁজে পেলেন না।

কিন্তু কুটির ছেড়ে যেতে চাওয়ার ব্যাপারে তাঁর এই অনীহা সীতাকে সম্পূর্ণ ভুল চিন্তা-পথে পরিচালিত করল। তিনি এমন সব কটূক্তি করতে লাগলেন, যা লক্ষ্মণের পক্ষে কোনওক্রমেই সহ্য করা সম্ভব নয় (এ বিষয়ে আমরা পরবর্তী লেখাটিতে আলোচনা করব)। ফলে নিতান্ত বাধ্য হয়েই তাঁকে জীবনে প্রথমবারের জন্য রামের আদেশ অমান্য করে সীতার কথায় কুটির ত্যাগ করে রামের সন্ধানে যেতে হল। কিন্তু যাওয়ার পূর্বে তিনি বললেন :

'জলচর স্থলচর অন্তরীক্ষচর।
সবে সাক্ষ্য হও সীতা বলে দুরক্ষর।।

কিন্তু সীতা তৎসত্ত্বেও মানতে রাজি হলেন না। লক্ষ্মণের কাছে আর কোনও উপায় বাকি রইল না। তখন :

গণ্ডি দিয়া বেড়িলেন লক্ষ্মণ সে ঘর।
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর।।
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ তাঁর পত্নী সীতা।
শূন্য ঘরে রাখি ওহে সকল দেবতা।।

এইভাবে কুটিরকে গণ্ডিবদ্ধ করে এবং সীতাকে দেবতাদের রক্ষণাবেক্ষণে সমর্পণ করে, লক্ষ্মণ বাধ্য হয়ে রামের সন্ধানে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করলেন।

বৃক্ষের অন্তরালে রাবণ এতক্ষণ এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। এইবার তিনি রাঙা বসন পরে, ভিক্ষার ঝুলি এবং ছাতা হাতে সীতার কাছে এগিয়ে গেলেন। তাঁর রূপের দীর্ঘ প্রশংসা করলেন, পরিচয় জানতে চাইলেন; জানতে চাইলেন—এমন সুন্দরী অরণ্যে কেন বাস করছে! তাঁকে সন্ন্যাসী বলে জ্ঞান করে সীতা আত্মপরিচয় দিলেন এবং স্বভাবতই তপস্বীর পরিচয় জানতে চাইলেন। রাবণ নিজেকে কুবেরের ভাই হিসাবে পরিচয় দিলেন, এবং বললেন—তিনি বহুকাল অবধি এই অরণ্যে তপস্যারত আছেন। নিজের নাম যে রাবণ—তাও তিনি উল্লেখ করলেন; কিন্তু তাতেও সীতা তাঁর প্রকৃত পরিচয় বুঝতে পারলেন না। নিশ্চিতভাবেই রাবণ সম্পর্কে কিছুই তাঁর জানা ছিল না, নামটুকুও নয়। কুটিরের বাইরে যেতে হলে লক্ষ্মণের এঁকে দেওয়া গণ্ডি অতিক্রম করতে হবে, এই কারণে সীতা রাবণকে কুটিরের ভিতরে এসে পঞ্চফল দিয়ে ভোজন করতে বললেন। কিন্তু রাবণ তাতে রাজি হলেন না :

'রাবণ বলিল, সীতা ব্রত করি বনে।
আশ্রমে না লই ভিক্ষা জানে মুনিগণে।।'

অতিথি ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে গেলে ধর্ম নষ্ট হয়। রাম তাতে ক্ষুব্ধ হবেন। এই ভেবে সীতা বাধ্য হয়ে গণ্ডি পার হয়ে বাইরে এলেন রাবণকে ফলদান করতে। এইবার রাবণ স্বমূর্তি ধারণ করে সীতার হাত ধরলেন, প্রকৃত পরিচয় দান করলেন এবং সরাসরি সীতাকে বিবাহ করতে চাইলেন। সীতা তাঁকে অজস্র কটু কথা বললেন, সরোদনে রাম ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করতে লাগলেন, দশাননকে অভিসম্পাত দিলেন। এতক্ষণে তাঁর মনে হতে লাগল :

'হায় কেন লক্ষ্মণেরে দিলাম বিদায়।
লক্ষ্মণ থাকিলে কি ঘটিত হেন দায়।।'

কিন্তু ততক্ষণে রাবণের মনস্কাম সিদ্ধ হয়েছে। তিনি সীতাকে রথে তুলে নিয়ে তা লঙ্কার উদ্দেশ্যে চালনা করলেন।

তাহলে এই হল কৃত্তিবাসের বর্ণনা-অনুযায়ী সীতাহরণ পালা।

খুব স্বাভাবিকভাবেই তুলসীদাস-রচিত 'শ্রীরামচরিত মানস' গ্রন্থে এই ঘটনার প্রায় প্রতিধ্বনি লিপিবদ্ধ হয়েছে। সীতার তীব্র কটূক্তিগুলিকে কোনও অজ্ঞাত কারণে এড়িয়ে গিয়েছেন তুলসীদাস, কিন্তু অক্ষুণ্ণ রেখেছেন লক্ষ্মণের দেবতাদের সাক্ষী রাখা এবং সর্বোপরি সেই গণ্ডিটি :

'মরম বচন সীতা যব বোলি।
হরি প্রেরিত লছমন মতি ডোলি।।
চহুঁদিসি রেখ খিঁচাই অহীসা।
বার বার নায়উ পদ সীসা।।'

সীতার মর্মঘাতী কথা শুনে (কী কথা—সে সম্পর্কে কিন্তু তুলসীদাস নীরব; আবার বলে দিলাম!) লক্ষ্মণ দৈবপ্রেরণায় আপন দায়িত্ব পালন না-করে, কুটিরের চারদিকে রেখা অঙ্কন করে, 'বন দিসি দেব সৌঁপি সবকাহূ'—বন, দিকসকল এবং দেবতার হস্তে সীতার দায়িত্ব সমর্পণ করে, বারবার সীতাকে প্রণাম করে যাত্রা করলেন রামের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে।

বর্ণনায় যৎসামান্য ফেরফার থাকলেও এই দুই অনুবাদক কিন্তু লক্ষ্মণের গণ্ডির ব্যাপারে একমত হয়েছেন। ফলে সমগ্র ভারতে এই 'লক্ষ্মণরেখা' বা 'লক্ষ্মণের গণ্ডি' অমোঘ নিষেধাজ্ঞার প্রতীক হয়ে আছে বহু শতাব্দী ধরেই। এবং সমস্যা হল...

বাল্মীকিরচিত রামায়ণে এই গণ্ডিটি নেই!

আজ্ঞে না, এই বহুখ্যাত গণ্ডিটি বাল্মীকির সৃষ্টি নয়। মূল বাল্মীকি-রামায়ণেও আছে এই স্বর্ণমৃগের প্রসঙ্গ। তার সর্বাঙ্গ মণি-মাণিক্যে খচিত। তাকে দেখে যেমন সীতা, তেমনই রাম মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু মহাকবির তীকষ্ন দৃষ্টির প্রমাণ রাখতেই যেন বাল্মীকি একটি অদ্ভুত কথা উল্লেখ করেছেন, অপ্রয়োজনীয় বোধে যা কৃত্তিবাস বা তুলসীদাস অনুবাদ করেননি। সেই আশ্চর্য হরিণ যখন রামের আশ্রমের প্রাঙ্গণে এসে যদৃচ্ছা

বিচরণ করছিল, তখন বনের অন্য হরিণেরা তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে কাছে আসছিল; কিন্তু গন্ধ আঘ্রান করা মাত্রই সত্রাসে পলায়ন করছিল।

'সমুদ্বীক্ষ্য চ সর্ব্বে তং মৃগা যে'ন্যে বনেচরাঃ।
উপাগম্য সমাঘ্রায় বিদ্রবন্তি দিশো দশ।।'

ইতোমধ্যে প্রায় দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে কাটিয়ে-ফেলার পরেও রাম যে বন্যপ্রাণীদের এই আশ্চর্য আচরণের তাৎপর্য বুঝতে পারলেন না—তা বেশ আশ্চর্যজনক! তেমনই আশ্চর্যজনক অনুবাদকদের এই অসম্ভব ইঙ্গিতবহ অংশটিকে উপেক্ষা করা।

কিন্তু লক্ষ্মণ বুঝতে পেরেছিলেন। রাম এই মৃগের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা মাত্র তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'আমি এই মৃগকে সেই মারীচ রাক্ষস বলেই মনে করছি। এমন রত্নচিত্রিত হরিণ পৃথিবীতে থাকতে পারে না। এটি নিঃসন্দেহে মায়ামৃগ।'

রাম অবশ্য এ কথা শুনতে চাইলেন না। সীতাও তাঁকে যৎপরোনাস্তি অনুরোধ করে চললেন। রাম ধনুর্বাণ নিয়ে, সীতাকে রক্ষার কাজে লক্ষ্মণকে নিয়োগ করে, চললেন মায়ামৃগের পশ্চাতে। মায়ামৃগ ছলনায় রামকে ক্রমাগত তাঁর আশ্রম থেকে দূরে নিয়ে চলল। শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে রাম এই আশ্চর্য হরিণটিকে জীবন্ত অবস্থায় ধরার আশা ত্যাগ করে এক বজ্রতুল্য বাণ নিক্ষেপ করলেন; মর্মস্থানে বিদ্ধ হয়ে মারীচ 'হা সীতা! হা লক্ষ্মণ!' বলে উচ্চস্বরে আহ্বান করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করল। এতক্ষণে রাম বুঝতে পারলেন, লক্ষণ তাঁকে ঠিকই বলেছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে। তিনি বিষণ্ণ চিত্তে অন্য একটি হরিণকে বধ করে তার মাংস সংগ্রহ করে দ্রুতপায়ে জনস্থান—অর্থাৎ নিজের আশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

ইতোমধ্যে সীতা স্বামীর কণ্ঠস্বরে সেই আর্ত চিৎকার শুনতে পেয়ে লক্ষ্মণকে বললেন অরণ্যে গিয়ে রামকে রক্ষা করতে। লক্ষ্মণ স্বভাবতই এই অযৌক্তিক আদেশ মান্য করতে রাজি হলেন না। কিন্তু আগেই বলেছি—সীতা এমন কিছু কথা বললেন, যার পরে লক্ষ্মণের গত্যন্তর ছিল না। তিনি প্রাণপণে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে, এই স্বর রামের নয়, কোন দেবতারও নয়। সেই রাক্ষসের মায়া। তিনি মনে করিয়ে দিলেন—খর, দূষণ প্রমুখ রাক্ষসদের বধ করে তাঁরা ইতিমধ্যেই শত্রু-পরিবৃত হয়েই আছেন। কিন্তু সীতা অসম্ভব অপ্রীতিকর ভঙ্গিতে লক্ষ্মণকে তিরস্কার করেই চললেন।

শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। সীতার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে অতিষ্ঠ হয়ে লক্ষ্মণ শেষে সমস্ত স্ত্রী-জাতিকে দোষারোপ করতে শুরু করলেন। তারপর বনবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন—তাঁরা যেন সাক্ষী থাকেন যে, লক্ষ্মণ যখন তাঁর গুরু রামের আদেশ পালন করায় ব্রতী ছিলেন, তখন সীতাই তাঁকে কুটির ত্যাগ করে যেতে বাধ্য করেছেন। লক্ষ্মণ এ-ও বললেন, 'সমস্ত বনদেবতাগণ আপনাকে রক্ষা করুন! আমি নিকটে যেসব ভয়ঙ্কর দুর্লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, তাতে সন্দেহ হয়—রামের সঙ্গে ফিরে এসে হয়তো আপনাকে আর দেখতে পাব না।'

নিমিত্তানি হি ঘোরাণি যানি প্রাদুর্ভবন্তি মে।
অপি ত্বাং সহ রামেণ পশ্যেয়ং পুনরাগতঃ।।

এরপরেও সীতা বলে চললেন তিনি প্রয়োজনে আত্মহত্যা করবেন, কিন্তু রামকে ছাড়া তিনি বাঁচতে পারবেন না। লক্ষ্মণ আর কথা বাড়ালেন না। তাঁকে প্রণাম করে, বারংবার তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে তিনি প্রস্থান করলেন। ইত্যবসরে দশানন রাবণ এসে সন্ন্যাসীবেশে প্রথমে সীতাকে ভিক্ষা দিতে

বললেন; পরে স্বরূপ ধারণ করে বাম হস্তে তাঁর কেশ এবং দক্ষিণ হস্তে উরু ধারণ করে সীতাকে পুষ্পক রথে তুলে হরণ করে নিয়ে গেলেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, অন্যান্য বর্ণনা প্রায় হুবহু এক হলেও বাল্মীকির আখ্যানে লক্ষ্মণের বিখ্যাত গণ্ডি একেবারেই অনুপস্থিত। অর্থাৎ পুরুষের অঙ্কিত যে রেখা নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করবে, তা সৃষ্টি হবে আরও পরবর্তীকালে—সম্ভবত কৃত্তিবাসের হাতে। ততদিনে নারীর স্থান সমাজের আরও বেশ কয়েক ধাপ নীচে নেমে এসেছে। পুরুষের উপস্থিতির মতোই, তার অনুপস্থিতিতেও নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করছে তারই টেনে-দেওয়া অদৃশ্য রেখাটি। বাল্মীকির সীতা অনেক বেশি স্বাধীন, অনেক বেশি ব্যক্তিত্ব তাঁর। হয়তো সেই কারণেই বাল্মীকি কোনও কল্পিত গণ্ডির প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি।

তার পরেও অবশ্য দুটি প্রশ্ন থেকেই যায়। এক—রাবণ সহসা সীতাকে হরণ করতে এলেন কেন? কোথায় স্বর্ণলঙ্কা, আর কোথায় অরণ্যমধ্যস্থ এই জনস্থান—যেখানে রামের কুটির। তা কি শুধুই শূর্পণখার অপমানের প্রতিশোধ নিতে? একজন বীর হিসেবে তো তাহলে তাঁর রাম-লক্ষ্মণকেই আক্রমণ করার কথা! সীতা কেন?

আর দুই—সীতা লক্ষ্মণকে কী এমন বলেছিলেন, যার উল্লেখ করতে গিয়ে তুলসীদাস এমন সংকুচিত বোধ করলেন?

পরের দুটি লেখায় আমরা আলোচনা করব এই প্রশ্ন দুটি নিয়েই। আর হ্যাঁ, পরেরবার লক্ষ্মণরেখা টানার সময় অকারণে বাল্মীকিকে আর টানবেন না যেন!

সীতাহরণ পালা : শূর্পণখা উবাচ

একটা কথা মানতে আমরা বাধ্য। রাবণ আর বীরত্ব—এই দুটো বিষয় আমাদের মনে ছোটবেলা থেকে একেবারে রথের মেলা আর পড়ভাজার মতো জুড়ে যায়। রাবণের শত দোষ স্বীকার করে নেওয়ার পরেও আমরা এইটুকু বলে তাঁর মান রক্ষা করি—তিনি মহাবীর! রামায়ণের যে অংশে আমরা তাঁকে প্রথম দেখতে পাই, সেখানে এক পরিচ্ছেদ জুড়ে রাবণের ভয়াল এবং প্রবল-পরাক্রান্ত এক মূর্তি গড়ে তোলেন বাল্মীকি; সে বর্ণনায় ইতিবাচক আর নেতিবাচক, ভালো আর মন্দ, সাদা আর কালো এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে থাকে, যা এক সত্যিকারের 'বিচিত্রমনা' পুরুষকে চিনিয়ে দেয়। একেবারে আধুনিককালের শিক্ষিত বাঙালি মননেও রাবণ আর বীরত্বের এই অচ্ছেদ্য বন্ধন কেমন পাকাপোক্ত গাঁটছড়া বেঁধে বসে আছে, তার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ খোদ মাইকেল। রাবণের মধ্যে তিনি সত্যকার বীর্যের প্রবল প্রতাপান্বিত প্রকাশ দেখেছিলেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, বিচিত্রমনা। কারণ, রাবণ বেদজ্ঞ—তা অবিশ্যি হওয়ারই কথা, তিনি সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষি পুলস্ত্যের পৌত্র। আবার তিনিই নির্বিচারে পরস্ত্রীহরণ করে থাকেন; এবং আমি সীতার কথা বলছি না! তার পূর্বেই রাবণ বাসুকি এবং তক্ষককে পাতালে গিয়ে পরাস্ত করে তক্ষকের পত্নীকে হরণ করেছেন! তিনি যজ্ঞধ্বংসকারী, অথচ মহাবনে দশ হাজার বছর ধরে তপস্যা করে তিনি ব্রহ্মাকে নিজের মস্তক উপহার দিয়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। একই পঙক্তিতে বলা হয় রাবণ যজ্ঞের বিঘ্নস্বরূপ, এবং সমস্ত দিব্যাস্ত্রের বিষয়ে জ্ঞাত—সর্ব্বদিব্যাস্ত্রযোক্তারং যজ্ঞবিঘ্নকরং সদা! সীতার সন্ধানে লঙ্কায় গিয়ে বন্দীত্ব বরণ করেছিলেন হনুমান। রাবণের প্রথম দর্শনে তাঁর সর্বাঙ্গে প্রকট সুলক্ষণ দেখে মুগ্ধ হয়ে ভেবেছিলেন—যেমন রূপ, যেমন ধৈর্য, তেমন পরাক্রম! রাক্ষসরাজ সত্যই সর্বসুলক্ষণযুক্ত। *'অহো রূপমহো ধৈর্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ। অহো রাক্ষসরাজস্য সর্বলক্ষণযুক্ততা।।'*

ভাবুন একবার! রাবণের পরমশত্রু হনুমান প্রথমবার রাজসভায় সিংহাসনে ক্ষৌমবসন-পরিহিত রাবণকে দেখে এইরকম মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন! তাঁর মনে হয়েছিল—যদি এঁর অধর্ম এত বলবান না হত, তবে ইনি সর্বলোকের রক্ষক হতে পারতেন! ত্রিলোকের সম্রাট!

খুব স্বভাবতই কৃত্তিবাসে এই দৃশ্যটি সম্পূর্ণ বিপরীত। এই গাম্ভীর্য কৃত্তিবাসের স্বভাবসিদ্ধ নয়। তিনি তাঁর স্বাভাবিক পথেই অগ্রসর হয়েছেন; অর্থাৎ রাবণের সভায় হনুমানকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হলে (রাক্ষসেরা যখন ঘাড়ে করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন হনুমান রসিকতা করে 'প্রস্রাব করিয়া দিল কান্ধের উপরে!') তিনি সিংহাসনের দিকে পিছন ফিরে বসেছিলেন। রাবণের মন্ত্রী প্রহস্ত এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বালী এবং কার্তবীর্যার্জুনের হাতে রাবণের হেনস্থার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, রাবণের মধ্যে দেখার কিছু নেই। পার্থক্যটি অতিশয় লক্ষণীয়, তাই না?

তা সে যাক, কথাটি ওই—যে যতই তাঁকে অধর্মাচারী বলুক, রাবণের বীরত্বের প্রসঙ্গে কারোর কোনও দ্বিমত নেই।

আর ঠিক সেই কারণেই একটি অতিশয় সঙ্গত প্রশ্ন আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। রাবণ হঠাৎ সীতাকে হরণ করতে গেলেন কেন?

ব্যাপারটা আরেকবার তলিয়ে ভাবা যাক বরং।

রাবণের বোন শূর্পণখা তখন জনস্থান নামের একটি জায়গায় এসে রয়েছেন। কাছেই পঞ্চবটী। একদিন তাঁর রামকে দেখে বড়োই পছন্দ হল। তিনি রামকে বিবাহ করতে চাইলে, রাম রসিকতার ছলে তাঁকে লক্ষ্মণের কাছে পাঠালেন। শূর্পণখা এবারেও প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে সীতাকে আক্রমণ করতে গেলে লক্ষ্মণ খড়গাঘাতে তাঁর নাক ও কান কেটে নিলেন। আহত শূর্পণখা তাঁর ভ্রাতা এবং সেনাপতি খর ও দূষণের কাছে এসে এ সব বললেন। রাক্ষসসৈন্য রামকে আক্রমণ করলে রাম একাই সেই চৌদ্দ সহস্র সেনাকে নিহত করলেন। শূর্পণখা লঙ্কায় ফিরে গিয়ে রাবণকে এসব জানালে রাবণ মহাক্রোধে...

অ্যাই! ঠিক এই অবধি এসে আমাদের মনে হতে বাধ্য—সব শুনে রাবণ মহাক্রোধে সসৈন্যে রাম ও লক্ষ্মণকে আক্রমণ করলেন। এটাই তো স্বাভাবিক! একজন রাজপুত্র (এ-ও শূর্পণখাই তাঁকে বলেছেন) আমার ভগিনীকে অপমান করেছে, বিরূপা করেছে; আমার তিন সেনাপতি এবং চৌদ্দ হাজার সেনাকে হত্যা করেছে। আমিও রাজা। আমি সেই যুবরাজকে সমুচিত শাস্তি দেব, সম্মুখযুদ্ধে তাকে বধ করব! চুকে গেল! এই তো বীরোচিত কর্ম, পুরুর ভাষায় যারে কয় 'রাজার সঙ্গে রাজার মতো আচরণ!'

কই, রাবণ তো তা করলেন না! তিনি মারীচকে ভয় দেখিয়ে রাজি করলেন, তাকে মায়ামৃগ সাজালেন, ছলনায় রামকে বিভ্রান্ত করে বনান্তরে পাঠালেন, লক্ষ্মণকেও পথ থেকে সরালেন...

এবং সীতাকে হরণ করলেন!

এ কেমন বীরের কাজ! সোজাসাপটা রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ না-করে, বোনের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা না-করে, যে বোনকে অপমান করল—সেই লক্ষ্মণের বৌদিকে অপহরণ করাটা আবার কোন দেশি বীরত্ব বাপু?—এই জাতীয় একটা প্রাকৃতজন-সুলভ প্রশ্ন মাথায় আসাটা নিতান্ত স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে না?

বেশ, তার মানে এর মাঝে কোথাও একটা ফাঁক আছে, যা আমাদের রাবণের এই বিচিত্র কর্মপন্থাটিকে বুঝে নিতে বাধা দিচ্ছে। এবার বরং আমরা সেইটে বুঝে নিই।

বাল্মীকিবিরচিত রামায়ণ অনুসারে রাবণ এই দুঃসংবাদটি পেলেন কার কাছ থেকে? এক ভগ্নদূত—অকম্পনের কাছ থেকে। খর-দূষণ-ত্রিশিরা এবং অন্যান্য সমস্ত রাক্ষসের মৃত্যু হল রামের বাণে; একমাত্র প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে পারল এই অকম্পন। সে রাবণকে গিয়ে এই ভয়ানক দুঃসংবাদ দিতে রাবণ মহাক্রোধে উত্তপ্ত হয়ে রামের অনুপুঙ্খ সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন, এবং সব শুনে স্থির করলেন—তিনি

নিজেই রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করার জন্য জনস্থানে যাবেন—*'গমিষ্যামি জনস্থানং রামং হন্তুং সলক্ষ্মণম্।'* এই তো বীরের মতো সিদ্ধান্ত—কী বলেন?

অকম্পন কিন্তু এ কথায় বিশেষ প্রভাবিত হল না। বরং সে লঙ্কাপতি রাবণকে স্পষ্ট বলে দিল, সে চেষ্টা না করাই ভালো; রামকে যুদ্ধে পরাস্ত করা একা রাবণ কেন, সমস্ত রাক্ষসকুল এক হলেও অসম্ভব কর্ম। তার চাইতে ঢের সহজ একটি উপায় আছে। রামের স্ত্রী সীতাই হল তাঁর প্রাণ, পত্নীবিরহ রাম সহ্য করতে পারবেন না। কাজেই আপনি রামকে পরাস্ত করার প্রচেষ্টা না করে বরং সীতাকে হরণ করুন।

আশ্চর্য, রাবণ কিন্তু এক সাধারণ সৈনিকের মুখে এসব অপমানজনক কথাবার্তা শুনে মোটেই চটে গেলেন না। বরং পরামর্শটা রাবণের পছন্দই হল। তৎক্ষণাৎ মারীচের আশ্রমে গিয়ে তিনি রামের কথা বলে তাঁর পত্নীকে হরণ করার ব্যাপারে মারীচের সহায়তা চাইলেন। মারীচ তাঁকে সোজাসুজি বলে দিলেন, এই পরামর্শ যে-ই তাঁকে দিয়ে থাকুক—সে রাবণের পরম শত্রু; সে রাবণকে উগ্রবিষ সর্পের মুখ থেকে বিষদাঁত তোলার পরামর্শ দিয়েছে। কাজেই তিনি যেন এসব পরিকল্পনা ত্যাগ করে লঙ্কায় ফিরে যান, আপন পত্নীকে নিয়ে সুখে থাকেন। রামও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বনে বনে ভ্রমণ করুন।

রাবণ কিন্তু এবারেও এইসব অপমানজনক কথাবার্তায় বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া দেখালেন না, দিব্যি লঙ্কায় ফিরে চলে এলেন। এমন সময় আহত, বিকৃতরূপা শূর্পণখা এসে রাবণের সভায় প্রবেশ করলেন। নিশ্চেষ্ট হয়ে ভ্রাতাকে বসে থাকতে দেখে তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়লেন, তীব্র তিরস্কার করলেন তাঁকে, সাধ্যমতো চেষ্টা করলেন যুদ্ধের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে। বাল্মীকি যদিও বলছেন, সে-সব তিরস্কারে রাবণ খুবই রেগে গেলেন; তেমন কিছু ক্রুদ্ধ তাঁকে আমরা দেখছি না। বরং আবার তিনি জিজ্ঞাসা করছেন সেই একই প্রশ্ন—কে রাম, তাঁর রূপ বা বীরত্ব কীরূপ ইত্যাদি। শূর্পণখাও সেই অকম্পনের বাঁধা গতেই উত্তর দিচ্ছেন—রাম এই ভয়ানক বীর, লক্ষ্মণ নিতান্ত নারীহত্যা করবেন না বলেই আমায় বিরূপা করে ছেড়ে দিয়েছে, সীতা নামে রামের যে পত্নী আছে...

দাঁড়ান! ঠিক এইখানে এসে শূর্পণখা পরিত্যাগ করলেন অকম্পনের পথ। সীতাকে ধরে আনলে রাম বিরহেই মরে যাবে—অকম্পনের এই পরামর্শের একেবারে ধার ঘেঁষে চলতে গিয়েও তিনি সহসা বাঁক নিলেন। এইবার তাঁর বর্ণনায় ফুটে উঠল এক বরবর্ণিনী যুবতীর কামোন্মাদ ঐশ্বর্য! সীতার রূপ নয়, তাঁর দেহের বিভঙ্গ। *'তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা রক্ততুঙ্গনখী শুভা। সীতা নাম বরারোহা বৈদেহী তনুমধ্যমা।'* এবং হ্যাঁ, ক্ষীণ কটিদেশের মতো কামোদ্রেককারী এই বিশেষণের ঝড় চলতেই থাকে—'বিস্তীর্ণজঘনা' বা 'পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম'—যতক্ষণ না...যতক্ষণ না রাবণ প্রত্যাশিতভাবেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কারণ ততক্ষণে শূর্পণখা বলে দিয়েছেন সেই আসল কথাটি—'এমন নারী আপনারই স্ত্রী হওয়ার যোগ্য, আপনিই তার উপযুক্ত পুরুষ!'

যে পুরুষের পরনারীতে আসক্তি আছে, পরস্ত্রীহরণের পূর্ব ইতিহাস আছে—তাকে প্ররোচিত করার পথ সৈনিক অকম্পন না-জানলেও, শূর্পণখা জানেন বইকি!

এরপরের কর্মকাণ্ড, ঘটনাবলী আমাদের জানা আছে। রাবণ ফের ছুটে যাবেন মারীচের আশ্রমে। এবার আর তাঁকে তিনি অনুরোধ করবেন না। বাধ্য করবেন রাবণের আদেশ মেনে নিতে। তারপর সেই মায়ামৃগ, সেই সীতাহরণ—যাকে আর যাই হোক, 'বীরোচিত কর্ম' বলে স্বীকার করে নেওয়া অসম্ভব। স্পষ্টতই, শূর্পণখার অপমানের বা খর-দূষণের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া নয়, রাবণের কাছে অনেক বড় হয়ে উঠেছিল সীতার অপূর্ব শারীরিক সৌন্দর্য। আর তার পিছনে আছেন, কী আশ্চর্য, একজন নারীই!

মজার ব্যাপার হল, কৃত্তিবাস কিন্তু অপ্রয়োজন-বোধে অকম্পনের বিষয়টি উল্লেখই করলেন না। তাঁর অনুবাদে বরং শূর্পণখার বক্তব্যের মধ্যেই মিশে গেল অকম্পনের কথাটুকুও; অর্থাৎ একদিকে তিনি যেমন সীতার সৌন্দর্যের প্রতি রাবণের মনোযোগ আকর্ষণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে চললেন, তেমনই সীতার বিরহে রামের মৃত্যু নিশ্চিত—এই যুক্তিও দিলেন।

লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই, আমি এইবার একধাপ সরে এসেছি। সীতার ক্ষেত্রে এবার কিন্তু আমি ব্যবহার করেছি কেবলমাত্র 'সৌন্দর্য' শব্দটা। 'শারীরিক সৌন্দর্য' বলে অনিবার্য কামোত্তেজনার আভিপ্রায়িক দৃষ্টিভঙ্গিটা এড়িয়ে গেছি এ-যাত্রায়। স্বাভাবিক, কারণ কৃত্তিবাস অমন ধরনের একটি শব্দও ব্যবহার করেননি। তিনি সীতাকে 'ত্রৈলোক্যমোহিনী' বলেছেন, 'সাক্ষাৎ পদ্মিনী' বলেছেন, তুলনা করেছেন অপ্সরাদের সঙ্গে—কিন্তু তাঁর দেহবিভঙ্গ সম্পর্কে একটি শব্দও ব্যয় করেননি।

আমরা আগেও দেখেছি, আমাদের সেই সুদূর অতীতের পূর্বপুরুষেরা দেহে-মনে বলিষ্ঠ ছিলেন; কাম সম্পর্কে অহেতুক কোনও ঢাক-ঢাক-গুড়-গুড় ছিল না তাঁদের। 'প্রেম' বা তার কোনও প্রতিশব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে খুঁজে পাওয়াই ভার। তার জায়গায় কবিরা মহানন্দে 'কাম' শব্দটাই ব্যবহার করতেন। কালিদাস 'মেঘদূতম' কাব্যে সেই লিখেছিলেন না—*'কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু!'* বোঝাই যাচ্ছে, যক্ষ বিরহে উন্মত্ত, কিন্তু ওই—লেখার বেলায় 'কামার্ত!' সীতার সম্পর্কে রাবণকে লুব্ধ করে তুলতে গিয়ে তাই বাল্মীকির শূর্পণখা যেখানে তাঁর দেহবিভঙ্গের ঢালাও বর্ণনা করে চলেন, সেখানে কৃত্তিবাস কিন্তু কোনওক্রমে 'পদ্মিনী' ইত্যাদি ইঙ্গিত করেই ক্ষান্ত দেন। আর হ্যাঁ, অবশ্যই বলে দেন—'যেমন মহৎ তুমি পুরুষ সমাজে। তার রূপ কেবল তোমাতে মাত্র সাজে।।'

তুলসীদাস অবিশ্যি আরও এক ধাপ নেমে দাঁড়ালেন এ ব্যাপারে। আগেও আমরা দেখেছি, সীতার রূপবর্ণনার ব্যাপারে তুলসীদাস যেন একটু সংকুচিত হয়েই থাকেন। তিনি যতখানি কবি, তার চেয়ে ঢের বেশি ভক্ত; সীতা তাঁর কাছে মাতৃমূর্তিতেই আবির্ভূতা হন সচরাচর। কাজেই রামচরিতমানস গ্রন্থে কিন্তু শূর্পণখা একটিমাত্র পঙক্তিতেই সীতার বর্ণনা সেরে দেন—*'রূপরাসি বিধি নারি সঁবারী। রতি সতকোটি তাসু বলিহারি।।'* বিধাতা এমনই রূপরাশি দিয়ে এই নারীকে গড়েছেন যে, শত কোটি রতি তা দেখে মূর্ছা যান। এখানে 'রতি' শব্দটা দেখে 'ওইত্তো' বলে লাফিয়ে-ওঠার কিস্যু হয়নি মশায়; এখানে রতি হলেন মদনের স্ত্রী; সৌন্দর্যের অপার্থিব বিভা বোঝাতে সীতাকে রতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে মাত্র। পরের মুহূর্তেই তুলসীদাস 'এই নারী যাঁর, তাঁর জীবদ্দশাতেই মুক্তি হয়ে যায়' ইত্যাদি বলে সীতার রূপের সঙ্গে রাবণের স্বাভাবিক নারীলোলুপতার সম্পর্কটাকে আরও মাটি করে দিয়েছেন।

কথাটা তবে কী দাঁড়াল?

বাল্মীকি খুব সোজাসাপটা ভঙ্গীতেই আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন—রাবণ স্বাভাবিকভাবেই নারীলিপ্সু; শূর্পণখা তাঁর সেই স্বভাব খুব ভালোই জানেন, এবং আপাতত রাম-লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অগ্রজের সেই স্বভাবজাত দুর্বলতাকেই ব্যবহার করে নিতে চাইছেন। রাবণ অবশ্য দাবি করতেই পারেন—নারী এবং ভূমি বীরভোগ্যা; রামায়ণের কালের আদিম চিন্তাধারায় তা যে খুব দোষাবহ হয়ে দাঁড়াবে, এমনও নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে আবার তাঁর বীরত্বের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেই নারীকে করায়ত্ত করার পদ্ধতি বা কৌশলটি—যার সঙ্গে আর যারই থাক—বীরত্বের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

বাল্মীকির রাবণ একেবারে শুরুতে যে অবস্থানে ছিলেন, তাকেই আমরা বলতে পারি প্রকৃত বীরোচিত মনোভাব। বেশ। তারপর ভগ্নদূত অকম্পন এবং স্বার্থপরায়ণ শূর্পণখা তাঁর আদিম রিপুঘটিত দুর্বলতাকে জাগ্রত করে তুললেন, ফলে রাবণ বীরের পথ পরিত্যাগ করে তস্করের পথ ধরলেন। তাও বুঝলাম, কারণ আদিকবি প্রায় সর্বদাই দেখা যাচ্ছে যুক্তির পথে চলেন, অন্তত কোনও চরিত্রের আচরণের বীজ তার স্বভাবের মধ্যে নিহিত রেখে দেন।

তাঁর অনুবাদকেরা কিন্তু এই যুক্তিপূর্ণ পন্থাটিকে তাদৃশ আমল দিতে নারাজ। তাঁরা তাই অকম্পনকে বাদ দিয়ে দেন অক্লেশে, সম্ভবত পুনরুক্তিদোষ এড়ানোর জন্য। আর শূর্পণখা যেভাবে সীতাকে এক যৌনতার প্রতিমারূপে এঁকে দেন রাবণের মানসচক্ষুর সামনে, সসংকোচে তাও ত্যাগ করেন।

এর ফল কী হয়?

এর ফলে রাবণের এই আকস্মিক পথ-পরিবর্তন ব্যাপারটাই অযৌক্তিক হয়ে দাঁড়ায়—যে ধরনের ভ্রান্তি—আজ্ঞে না, বাল্মীকি-রামায়ণে নেই!

সীতাহরণ পালা : সীতা উবাচ

আগের সেই পর্বের কথা অবশ্য আপনাদের এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়ার কথা নয়। আমার নাহয় বয়স হয়েছে, এমনিও ভুলো মন। আপনাদের তো আর তা নয়! কাজেই এ-কথা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে, বারবারই আমি বলছিলাম—'তা সীতা লক্ষ্মণকে এমন সব বাক্যি শোনাতে লাগলেন যে, সে বেচারার না-গিয়ে আর উপায় থাকল না।' সে-যাত্রায় আমরা ব্যস্ত ছিলাম লক্ষ্মণের গণ্ডি নিয়ে, ফলে কথাটা আর আমাদের জেনে ওঠা হয়নি। বলেছিলাম, পরে এ নিয়ে আলোচনা হবে। এইবার সেই কথাটার একটা হেস্তনেস্ত করেই ফেলা যাক। কিন্তু তার আগে একখান কথা বলা চাই।

আমি কিন্তু ভুলিনি, আমাদের এই লেখাটার শিরোনাম—'বাল্মীকি রামায়ণে নেই।' অর্থাৎ, আমরা মূলত সেই বিচিত্র বিষয়গুলি নিয়েই আলোচনা করতে চাইছি, যা মূল বাল্মীকির রামায়ণে ছিল না, পরে অনুবাদকেরা যোগ করেছেন। কিন্তু কথা হলো, শুধু 'যোগ করা'-ই কি সর্বদা তাৎপর্য বহন করে? লক্ষ্মণের গণ্ডির কথা বাল্মীকি লেখেননি; কৃত্তিবাস লিখেছেন, তুলসীদাস লিখেছেন। বেশ, তার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল মানসিকতা, বদলে-যাওয়া ব্যক্তিমন আর সমাজমন—দুই-ই ধরা পড়ে বইকি!

কিন্তু বিয়োগ? যে ঘটনা বাল্মীকি উল্লেখ করেছেন, তা যখন উত্তরসূরী লেখকেরা বিয়োগ করেন, তখনও কি তা অমনই গুরুত্ববাহী হয়ে দাঁড়ায়? স্বর্ণমৃগকে দেখে অরণ্যের পশুরা মুগ্ধ হয়ে ছুটে আসছিল তার কাছে, কিন্তু নিকটে এসে তার ঘ্রাণ পাওয়া-মাত্রেই ছুটে পালাচ্ছিল। এই অসম্ভব ইঙ্গিতপূর্ণ ঘটনাটি যে দুই অনুবাদকই অনুবাদ করার সময় বাদ দিলেন—তার মধ্যে কি কোনও সঙ্কেত লুকিয়ে নেই?

আলবাত আছে! তা আমাদের বুঝিয়ে দেয়, মহাকবি অরণ্যকে, আরণ্যক প্রাণীকুলকে যেভাবে চিনতেন—তাঁর অনুবাদকেরা তার এক শতাংশও চিনতেন না। বন্যপ্রাণীদের এই বিচিত্র আচরণের প্রকৃত অর্থ তাঁদের বোধগম্য হয়নি বলেই তাঁরা এই পঙক্তিটিকে অনুবাদের প্রয়োজন বোধ করেননি।

ঠিক এইভাবেই, যখন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কোনও ঘটনা কোনও উত্তরসূরীর হস্তে পড়ে সহসা সসঙ্কোচ উল্লেখ-মাত্রে পর্যবসিত হয়—তখন আমাদের উচিত খুঁজে দেখা—এই সঙ্কোচেরও কোনও অভিপ্রায় নেই তো? কোনও মানস-বিবর্তনের চিহ্ন নয়তো এই সংক্ষিপ্তকরণ?

আসুন, তেমনই এক বিয়োগের গল্প পড়ি আজ।

লক্ষ্মণের চরিত্র গত দুটি লেখায় নিশ্চয়ই আপনাদের সামনে ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। বলতে কী—গোটা রামায়ণে এমন বিবিধ স্তরে বিন্যস্ত চরিত্র দুটি নেই। সদর্থেই এঁকে আমরা বহুবর্ণ চরিত্র বলতে পারি—আজকের উপন্যাসে আমরা ঠিক যেমন ধরনের চরিত্র আঁকতে পারলে খুশি হই—ইনি তেমন একজন পুরুষ। কিন্তু এই বহু রঙের মধ্যে সবচাইতে জোরালো যে রঙটা চরিত্রটির মূল কাঠামো নির্মাণ করেছে, তা হল মাত্র দু'দিনের বড় দাদাটির প্রতি তাঁর অনন্ত ভালোবাসা।

আনুগত্য বলিনি কিন্তু।

ভালোবাসা।

বারংবার আমরা তাঁকে রামের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে দেখেছি। দশরথের প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্য রাম যখন বনবাসে যাচ্ছেন, লক্ষ্মণ তখন মোটেই রবীন্দ্রনাথ-কথিত আদর্শ ভ্রাতার মতো 'চলো দাদা, তাহলে আমিও তৈরি হয়ে নিই'—ইত্যাদি বলে সঙ্গ নিচ্ছেন না। উলটে মহাক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছেন—যে পিতা কামপরবশ হয়ে রামের মতো সর্বগুণান্বিত পুত্রকে আপন অধিকার থেকে বঞ্চিত করে বনবাসে পাঠায়, তাকে হত্যা করে রাজ্য দখল করে নেওয়াই উচিত কাজ হবে। আজ্ঞে ঠিকই পড়েছেন। নিজের বৃদ্ধ পিতা সম্পর্কে ঠিক ঠিক এই উক্তিই করেছিলেন ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ :

> *'হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্।*
> *কৃপণঞ্চ স্থিতং বাল্যে বৃদ্ধভাবেন গর্হিতম্।।'*

আমি বৃদ্ধ অথচ বাল্যভাবানুবর্তী, কুৎসিতস্বভাব, কৈকেয়ীতে আসক্তমনা এবং আমাদের প্রতি নির্দয় পিতাকে হত্যা করব।

অগ্রজের প্রতি ভালোবাসার বশবর্তী হয়ে যে নিজের পিতাকে বধ করতে উদ্যত হয়, তার ভালোবাসা নিয়ে প্রশ্ন তোলা একেবারেই অসম্ভব। রামের আদেশ লক্ষ্মণ নির্বিচারে পালন করতেন না, কিন্তু যতক্ষণ না সেই আদেশ ঔচিত্যের গণ্ডি পার হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্মণ রামের সম্পূর্ণ অনুগত। এর আগেও আমরা দেখেছি, শূর্পণখাকে শাস্তি দেওয়ার পর যখন খর, দূষণ এবং ত্রিশিরা চোদ্দো হাজার রাক্ষসসৈন্য নিয়ে রামদের আক্রমণ করতে এল, তখন রাম লক্ষ্মণকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন না। দায়িত্ব দিলেন, তিনি যেন সীতাকে নিয়ে দুর্গম পর্বতগুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে সীতার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেন। এই আদেশ নিয়ে লক্ষ্মণ একটি শব্দও ব্যয় করেননি, তর্ক তোলেননি। মহাবীর হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্মণ সেই যুদ্ধে রামের পাশে ছিলেন না, কারণ তিনি জানতেন—এই বিশাল রাক্ষসসেনাকে ধ্বংস করার জন্য একা রামই যথেষ্ট, ভ্রাতার সাহায্যের প্রয়োজন হবে না তাঁর। আগেই বলেছি—লক্ষ্মণের রামের বীরত্ব সম্পর্কে কোনও স্ফীত ধারণা নেই। যা আছে, তা নিছক আত্মবিশ্বাস।

তাহলে এমন কী ঘটে গেল যে, সবচেয়ে স্পর্শকাতর মুহূর্তেই লক্ষ্মণ জীবনে প্রথমবারের জন্য অগ্রজের আদেশ লঙ্ঘন করতে বাধ্য হলেন? আসুন, এবার সীতাহরণের দৃশ্যটাকে আবার একটু নিকটদৃষ্টিতে দেখা যাক।

রাম তো সীতার কথায়, এবং নিজের মোহাচ্ছন্নতায় বাধ্য হলেন মায়ামৃগের পশ্চাদ্ধাবন করতে। পলায়নপর হরিণের পিছনে দীর্ঘ পথ চলে আসার পর তাকে জীবন্ত অবস্থায় বন্দি করার আশা ত্যাগ করে

রাম শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলেন বজ্রতুল্য ভয়ঙ্কর একটি বাণ মোচন করতে। মৃত্যুকালে মারীচ অন্তিম প্রতিশোধ নিয়ে গেল—সে 'হা সীতা! হা লক্ষ্মণ!' বলে চিৎকার করে স্বমূর্তি ধারণ করে প্রাণত্যাগ করল।

লক্ষ্মণ এই আশঙ্কার কথা পূর্বেই স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছিলেন। এখন তা-ই সত্য হতে দেখে রাম বিষণ্ণ মনে অন্য একটি হরিণ শিকার করে (এটি নিজেদের খাওয়ার জন্য। স্পষ্টত, রামেরা বনবাসে আর যাই হোক, নিরামিষাশী হয়ে যাননি!) তার মাংস নিয়ে আশ্রমের দিকে ফিরে চললেন।

মহাকবি বাল্মীকি এই মহাসঙ্কটের কালে হঠাৎ এই নিতান্ত তুচ্ছ শিকারের দৃশ্যটা যোগ করতে গেলেন কেন, এ প্রশ্ন আমাদের মাথায় আসতে বাধ্য। এবং তার কারণটিও ঠিক ততটাই স্বতঃসিদ্ধ। তিনি একটি অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটার জন্য সময় নিচ্ছেন।

এদিকে জনস্থানে, রামেদের আশ্রমে এই চিৎকার গিয়ে পৌঁছল, যেমনটি নিকটেই লুকিয়ে-থাকা রাবণ চেয়েছিলেন। সীতা পতির অমঙ্গল-আশঙ্কায় অসম্ভব বিচলিত হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন অতি দ্রুত গিয়ে রামের সহায়তা করতে। আত্মবিশ্বাসী লক্ষ্মণ এই অবান্তর প্রস্তাবের উত্তর পর্যন্ত দিলেন না, মনে করলেন অগ্রজের আদেশ। 'ন জগাম তথোক্তস্তু ভ্রাতুরাজ্ঞায় শাসনম।'

এই নীরবতা সহসা সীতার মধ্যে এক কূট সন্দেহের জন্ম দিল। রামের আর্তচিৎকার শুনেও লক্ষ্মণ এমন অনড় কেন? কেন তিনি এই মুহূর্তে ছুটে যাচ্ছেন না রামকে উদ্ধার করতে? সবচেয়ে সম্ভব্য, সবচাইতে কলুষিত কারণটিই তাঁর মাথায় এল, এবং তা তিনি সোচ্চারে ব্যক্ত করতেও দ্বিধা করলেন না—'লক্ষ্মণ! তুমি বাইরে রামের বন্ধু সেজে থাকলেও অন্তরে তাঁর পরম শত্রু। আমারই জন্য, আমারই লোভে তুমি রামকে উদ্ধার করতে যাচ্ছ না—*'ইচ্ছসি ত্বং বিনশ্যন্তং রামং লক্ষ্মণ মৎকৃতে। লোভাত্তু মৎকৃতে নূনং নানুগচ্ছসি রাঘবম।'*

এই ভয়ঙ্কর অপবাদের মুখোমুখি হয়ে স্তম্ভিত লক্ষ্মণকে মুখ খুলতেই হল। সীতাকে সাধ্যমতো বুঝিয়ে বললেন তিনি যে, দেব-দানব-রাক্ষস কারোর সাধ্য নেই যুদ্ধে রামকে পরাস্ত করে। 'তিনি বিশ্বাস করে আপনাকে আমার দায়িত্বে রেখে গেছেন। সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করে, আপনাকে একা ফেলে রামের সহায়তা করতে যাওয়ার অর্থ তাঁর আদেশের উল্লঙ্ঘন করা। তা আমার সাধ্যাতীত।'

সীতার সন্দেহ এবার বিশ্বাসে পরিণত হল। তীব্রভাবে, অসহ্য কটু ভাষায় লক্ষ্মণকে তিনি বললেন, হয় ভরত লক্ষ্মণকে নিয়োগ করেছেন, নয় লক্ষ্মণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রামের সর্বনাশ করার জন্যই সীতাকে কামনা করেছেন; আর সেই কারণেই 'নৃশংসকুলপাংসন' লক্ষ্মণ এই মুহূর্তে এইরকম আচরণ করছেন। কিন্তু লক্ষ্মণের সেই কুৎসিত আশা কখনোই পূর্ণ হবে না, তার পূর্বেই সীতা তাঁর সামনেই প্রাণত্যাগ করবেন।

এর পরের ঘটনাক্রম আপনারা পূর্বের পর্বেই পড়েছেন। লক্ষ্মণের বনবাসীদের সাক্ষী রেখে, বনদেবতাদের সীতাকে রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে আশ্রম ত্যাগ করে রামের সন্ধানে যাওয়া, এবং রাবণের নিশ্চিন্তে সীতাহরণ।

রামের আদেশ লক্ষ্মণ পালন করবেন, এ যেন সূর্যোদয়ের ন্যায় নিশ্চিত এক ঘটনা। এই একটিবার তার অন্যথা ঘটেছিল। এখন আমরা বুঝতে পারছি—কেন। সীতার দেওয়া অপবাদ লক্ষ্মণ সহন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই একটিবার তাঁর আশ্চর্য ধৈর্য বিচলিত হয়েছিল। লক্ষ্মণ রামের আদেশ পালন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আর তারই ফলে রামকাহিনি যাত্রা করেছিল সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত এক পথে। অর্থাৎ, সীতার বিষতুল্য এই বাক্যগুলি বস্তুত সমস্ত রামায়ণকেই এক পরিপূর্ণ অন্যতর পথে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

আচ্ছা, পরবর্তী অনুবাদকেরা এই বাক্যের গুরুত্ব সম্যক অনুধাবন করেছিলেন? সীতাহরণের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল যে গলন্ত সীসার ন্যায় অসহ্য কয়েকটি বাক্য, একটি ঘৃণ্যতম সন্দেহ—তার পূর্ণ মহিমা তাঁরা বুঝেছিলেন?

আসুন, চট করে দেখে নেওয়া যাক একবার, কৃত্তিবাস ঠিক কী বলছেন।

এই ঘটনার বর্ণনার ক্ষেত্রে কৃত্তিবাস প্রায় আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করে চলেছেন তাঁর পূর্বসূরিকে। তাঁর শ্রীরামচালিতেও দেখছি রামের দূরাগত আর্তনাদ শুনে সীতার উদ্বেগ; এবং এক্ষেত্রে লক্ষ্মণ কিন্তু নীরবে সীতার আদেশ উপেক্ষা করেননি, বরং তাঁকে বুঝিয়ে বলেছেন,'রামেরে মারিতে পারে, নাহি কোনও জন।'

কিন্তু তাঁর এই নিশ্চিন্ততাই সীতাকে উত্তেজিত করে তুলেছে বাল্মীকি-নির্ধারিত পথেই, সহসা গরলভাষিণী হয়ে উঠেছেন তিনি :

বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহে ত আপন।
আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার বুঝি মন।।
ভরত লইল রাজ্য তুমি লহ নারী।
ভরতের সঙ্গে ষড় আছয়ে তোমারি।।'

এই সকল উক্তিতে আমরা প্রায় বাল্মীকিরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। শুধু মহাকাব্য থেকে চালিতে আসার পথে যে প্রত্যাশিত পরিবর্তন, তা যথারীতি এক্ষেত্রেও এসেছে—'তোমার সমক্ষেই আমি প্রাণত্যাগ করব'—সীতার এই আত্মহত্যার ভীতিপ্রদর্শন কৃত্তিবাসের হাতে পড়ে খাঁটি বাঙালি প্রকাশভঙ্গী পেয়েছে—'গলায় কাটারি দিয়া ত্যাজিব জীবন।'

যাই হোক, এ বিষয়ে অন্তত আমাদের আর কোনও সন্দেহ নেই যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণ অন্তত এক্ষেত্রে নূতন পথ সৃজন করার চেষ্টা করেনি যুক্তিগ্রাহ্য ভাবেই।

কিন্তু রামায়ণের আর এক মহান অনুবাদক, 'শ্রী রামচরিতমানস'-এর স্রষ্টা তুলসীদাস কী করলেন, আড়চোখে একবার দেখে নিই এবার?

এই গ্রন্থেও ভেসে আসে রামের চিৎকার। এখানেও সীতার আর্ত প্রার্থনা শোনা যায়—শীঘ্র যাও লক্ষ্মণ, তোমার ভ্রাতাকে উদ্ধার করো *'জাহু বেগি সংকট তব ভ্রাতা।'* লক্ষ্মণও তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, ভয়ের কিচ্ছুটি নেই, রামের বীরত্বে আস্থা রাখুন। কিন্তু তারপরেই...

তারপরেই তুলসীদাস যেন সহসা পথ পরিবর্তন করেন, সসঙ্কোচে এড়িয়ে যান সীতার রূঢ় কর্কশ ভাষা, বিষাক্ত সন্দেহ; লক্ষ্মণের তীব্রতম অপমান লিপিবদ্ধ করতে যেন ভুলে যান তিনি। একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত ও অর্ধমনস্ক বাক্যে তিনি সেরে ফেলেন এই অতি-গুরুত্বপূর্ণ, অতি-অপ্রিয় প্রসঙ্গ :

'মরম বচন সীতা জব বোলি।
হরি প্রেরিত লছমন মতি ডোলি।।'

ব্যস!!

সীতা যখন মর্মান্তিক কথা বললেন, তখন নিয়তির আদেশে লক্ষ্মণের মন বিপথগামী হল!

একে তো নির্মমভাবে পরিত্যাগ করলেন সীতা ঠিক কী কী মর্মঘাতী কথা বলেছিলেন। তদুপরি দোষ চাপিয়ে দিলেন সেই বিধাতার উপর, যার প্রতি নালিশ চলে না, যার বিরুদ্ধে আপিল চলে না। 'হরি প্রেরিত' হয়েই যদি লক্ষ্মণ সীতাকে একা রেখে চলে যান রামকে সাহায্য করতে, তাহলে তো আর সীতার কোনও অপরাধ থাকে না! দৈবের লীলা! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে!

কিন্তু তুলসীদাস সহসা এমন অসমাপ্ত গানে থেমে গেলেন কেন? কেন তিনি সীতার তীক্ষ্ণধার কূট অভিযোগের উল্লেখমাত্র করতেও পরামুখ হলেন? এই নিতান্ত ন্যায্য প্রশ্নটি যে আজকের পাঠককে ভাবতে বাধ্য করবেই!

এই অধমের একটি সম্ভাব্য উত্তর আছে বইকি! নইলে আর এত খাটাখাটনি কেন মশাই?

বাল্মীকি তাঁর কাব্যের চরিত্রগুলিকে এঁকেছেন মনুষ্যের মূর্তিতেই। সীতাও মানবী। একজন সাধারণ নারী, যাঁর কিছু অসাধারণ গুণাবলি আছে বলেই তিনি চিরপ্রণম্য। কিন্তু মানুষ বলেই তাঁর ভুল করার অধিকার আছে, সেই ভুল সম্পর্কে অনুতপ্ত হওয়ারও অধিকার আছে (যেমন অনুতাপ তিনি করেছেন তখন, যখন

রাবণ তাঁকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন—'হায় কেন লক্ষ্মণেরে দিলাম বিদায়। লক্ষ্মণ থাকিলে কি ঘটিত হেন দায়?' বাল্মীকির সীতা হাহাকার করে ওঠেন—*'হা লক্ষ্মণ মহাবাহো গুরুচিত্তপ্রসাদক!'*) এই ভ্রান্তি, এই অনুতাপ, এই হাহাকার মনুষ্যের স্বাভাবিক লক্ষণ।

কিন্তু তুলসীদাস কাব্য শুরুই করেছেন রাম-সীতার পারম্য প্রচারের মধ্য দিয়ে। সেই রাম-সীতার কথাই তিনি বলছেন—সমগ্র বিশ্বচরাচর, এমনকী দেবতারাও যাঁর পূজা করেন। সেই সীতা—দেবতাদের পূজনীয়া সীতা তো এমন হীন সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন না! তা যে তাঁর দেবোত্তর মর্যাদাকে হেয় করে! তাঁকে মানবীর স্তরে 'নামিয়ে আনে!'

এই কারণেই তুলসীদাস সসম্ভ্রমে এড়িয়ে যান সীতার হীন অনুচিত সন্দেহ। বাল্মীকি সীতাকে সুযোগ দিয়েছেন মানবী থেকে সাধনার মধ্য দিয়ে দেবোপম চরিত্রে পরিণত হওয়ার। সেই উত্থানেই তাঁর সিদ্ধি।

তুলসীদাস পারম্যে বিশ্বাসী। সীতার মুহূর্তের দুর্বলতা তাই তিনি ঢেকে রাখেন সযত্নে, যাতে দেবীমূর্তির অঙ্গে মালিন্যের স্পর্শ না-থাকে। দেবীর যে আর কিছু 'হয়ে-ওঠার' থাকে না!

বাল্মীকি মানবী সীতাকে আঁকেন তাঁর আশ্চর্য প্রেম, ত্যাগ, অশ্রু, তিতিক্ষা, ধৈর্য, সাহস আর ব্যক্তিত্বের রঙে রঙে। সেই সীতাকে আমরা ভালোবাসি।

তুলসীদাস আঁকেন সীতা-মাইয়ার দেবীমূর্তি। আমরা প্রণাম জানাতে পারি বড়জোর। কিন্তু তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দিতে আমাদের স্পর্ধা হয় না।

শ্রদ্ধার আসনে থেকে যান একা, নিঃসঙ্গ, অভ্রান্ত সীতা।

এক দেবী। মানবী নন।

তরণীসেন বধ

গোটা উত্তর-ভারতে রামলীলা একটা প্রধান অভিনয়-মাধ্যম বলা যেতে পারে। হিন্দি বলয়ে এই রামলীলার মূলে আছে তুলসীদাস-রচিত 'রামচরিত মানস' নামক মহাকাব্যটি, এবং আবহমান কাল ধরে বাতাসে ভেসে-চলা রামকথা। তারই বিভিন্ন ঘটনা নাটক আকারে পেশ করা হয় মঞ্চে।

পশ্চিমবঙ্গে এর রূপ সামান্য আলাদা, কারণ তুলসীদাসের বহু পূর্বেই এখানে, এই বঙ্গদেশে, কীর্তিবাস কৃত্তিবাস রামকাহিনি অনুবাদ করে অক্ষয় কীর্তি রেখে গিয়েছেন। ফলে এখানে 'রামযাত্রা' নামের যে ধারাটি গড়ে উঠেছে, তা উত্তর-ভারতে প্রচলিত ধারাটির চাইতে সামান্য আলাদা। আমাদের মফসসল শহরের ভৈরবতলায় যে রামযাত্রা হতো, তার সঙ্গে আমার বেশ কিছু বিচিত্র স্মৃতি জড়িয়ে আছে; যার মধ্যে সবচেয়ে করুণ স্মৃতি অবশ্যই সীতাকে মঞ্চের পিছনে অশ্বত্থগাছের তলায় দাঁড়িয়ে বিড়ি খেতে দেখার দৃশ্যটি—যা আজও আমাকে রোরুদ্যমান করে তোলে। পরে যখন জানতে পারি যে, প্রত্যেক দিন সকাল সাড়ে দশটায় যে বাসুদা রিক্সা নিয়ে আসে মাকে স্কুলে নিয়ে যাবে বলে, সে-ই পরচুলো এবং শাড়ি-শোভিতা হয়ে সীতার রূপ ধারণ করেছিল, তখন আমার নিদারুণ মোহভঙ্গ হয়েছিল। কিন্তু তাতে রামযাত্রার মোহ একটুও কমেনি, মালাডাকের উত্তেজনাও বিন্দুমাত্র কমে যায়নি।

তা সেসব ব্যক্তিগত কথা থাকুক। ভুললে চলবে না, আমরা মহাকাব্যের গম্ভীর আলোচনায় রত হয়েছি। তো এই রামযাত্রায় যে পালাগুলি সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল, তার একটি হল 'তরণীসেন বধ।' এই বিশেষ পালাটি আমি যতবার দেখেছি, তা সম্ভবত সংখ্যায় 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা'-র ঠিক পরেই থাকবে। আমাদের মূল শিরোনামকে সফল করে তোলার জন্যই যেন, এই 'তরণীসেন বধ' নামক বৃত্তান্তটি বাল্মীকি-রামায়ণে উল্লিখিত-মাত্র হয়নি, অথচ কৃত্তিবাসী রামায়ণে এবং বাঙালির সহজাত চিরায়ত রামায়ণচর্চায় এক বিশাল অনপনেয় স্থান দখল করে বসে আছে বহুকালাবধি।

কেন এই কাণ্ডটা ঘটল, কেন তরণীসেন বাল্মীকি-রামায়ণে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থেকেও বাঙালির চিত্তে এমন বিপুল স্থান অধিকার করে বসলেন—তা নিয়ে পরে ভাবনাচিন্তা করা যাবে। আগে দেখে নিই—কৃত্তিবাসী রামায়ণে তাঁর স্থান ঠিক কোথায়। কে এই তরণীসেন?

বিভীষণের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে তখনই, যখন হনুমান সীতার সন্ধান করতে লঙ্কায় গমন করেন। সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষ করে হনুমান মূলত রাবণকে দেখার জন্য ধরা দিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়। কিন্তু তাঁর ধৃষ্ট ব্যবহারে ক্রুদ্ধ রাবণ তাঁকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এইসময় বিভীষণ এগিয়ে এসে রাবণকে মনে করিয়ে দিলেন, দূত অবধ্য।

এরপর থেকে বিভীষণকে আমরা ক্রমশ রামায়ণে অন্যতম মুখ্য চরিত্রের স্থান দখল করে নিতে দেখেছি। নানা বিষয়ে তিনি বারংবার রাবণকে হিতোপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, অপমানিত হয়েছেন, এবং শেষ পর্যন্ত রাবণ তাঁকে সর্বসমক্ষে 'পদাঘাত' করেছেন। এই চূড়ান্ত অপমানটির পর বিভীষণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লঙ্কা ত্যাগ করার। রামের পক্ষে যোগ দেওয়া নিয়ে তাঁর এরপরেও দোলাচল ছিল; স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মধ্যে দুর্নামের দুশ্চিন্তা কাজ করেছে। পরবর্তী কোনও পর্বে আমরা বরং সেসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। কিন্তু এই পর্বে আমরা এইটুকু শুধু লক্ষ্য করলাম—বিভীষণ-সংক্রান্ত কোনও আলোচনায় কৃত্তিবাস কখনও তরণীসেন নামের কোনও চরিত্রকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন না।

তরণীসেন নামক চরিত্রটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে সরাসরি লঙ্কাকাণ্ডের এক চূড়ান্ত পর্যায়ে। ততদিনে রাক্ষসপক্ষের অধিকাংশ সেনাপতি মৃত। ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, বজ্রদংষ্ট্র, প্রহস্ত, ত্রিশিরা, দেবান্তক, নরান্তক—সকলেরই যুদ্ধে মৃত্যু হয়েছে; অতিকায় এবং রাবণের অন্যান্য পুত্রেরা হত হয়েছে। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ইন্দ্রজিৎ এক নৈশ-রণে সমস্ত বানর-সেনাসহ বধ করেছেন রাম-লক্ষণকেও। বেঁচে গিয়েছেন কেবলমাত্র বিভীষণ, জাম্বুবান এবং হনুমান। জাম্বুবানের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ এনে হনুমান প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন সকলের। এরপরই বানরেরা দ্বিতীয়বার লঙ্কা দহন করেছেন। কুম্ভ ও নিকুম্ভ—অর্থাৎ কুম্ভকর্ণের দুই পুত্রের পতন হয়েছে যুদ্ধে।

এরপর যখন মহাবীর মকরাক্ষেরও পতন হল, তখন রাবণ যুদ্ধে যাওয়ার আদেশ দিলেন তরণীসেনকে। এই প্রথম আমরা জানতে পারলাম—বিভীষণের একটি পুত্র আছে, তার নাম তরণীসেন। পিতা রাবণের পক্ষ ত্যাগ করলেও, তিনি করেননি; এবং রাবণ তাকে পরিষ্কার বলতে পারেন :

'শত্রুর সপক্ষ তব হইয়াছে পিতে।
মজিল কনক-লঙ্কা তার মন্ত্রণাতে।।
তুমি তার পুত্র বট নহ তার মতো।
চিরদিন জানি তুমি মম অনুগত।।'

সংযমী তরণীসেন রাবণকে মৃদুস্বরে জানিয়ে দিলেন, পিতার সমালোচনা তিনি করবেন না; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি তাঁকে ছেড়েও দেবেন না—'শ্রেষ্ঠ-জ্যেষ্ঠ বিবেচনা যুদ্ধকালে নয়।' যুদ্ধকালে কে ভালো, কে গুরুজন—এসব বিবেচনা করতে নেই। রাবণ স্বহস্তে তাঁকে রণসাজে সাজিয়ে যুদ্ধে পাঠালেন।

যুদ্ধে যাওয়ার আগে তরণীসেন এলেন মাতা সরমাকে প্রণাম করতে, এবং এইবার, মায়ের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রকাশ পেল তাঁর অন্তরের স্বরূপ। তিনি খুব ভালো করেই জানেন—রাম বিষ্ণুর অবতার, তাঁর হস্তে প্রাণ গেলে 'গোলোকে নিবাস।' মহাজ্ঞানী বিভীষণ তাঁর পিতা। তিনি পুত্র তরণীসেনকে দিয়েছিলেন পরম শিক্ষা—'অনিত্য শরীর এই মিছে মায়া-যন্ত্র।' সেই শরীর যদি রামের বাণে প্রাণ হারায়, তাহলে তার চাইতে বড় প্রাপ্তি, বড় পুণ্য এই অনিত্য পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

ক্রন্দনরতা মাকে প্রণাম করে সসৈন্যে তরণীসেন যুদ্ধযাত্রা করলেন; তার আগে অবশ্য 'আনন্দে সকল অঙ্গে লিখে রামনাম।' গঙ্গামৃত্তিকায় তাঁর রথে আর পতাকায় লেখা হল লক্ষ লক্ষ রামনাম। এইভাবে যুদ্ধসজ্জা সাঙ্গ হল তাঁর।

মহাবীর তরণীসেনের পরাক্রমের সামনে দাঁড়াতে না-পেরে বানরসেনা পলায়ন করতে লাগল। বিস্মিত রাম বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করলেন এই রাক্ষসের পরিচয়, এবং আশ্চর্য ব্যাপার—বিভীষণ তরণীসেনের প্রকৃত পরিচয় দিলেন না! শুধু বললেন, এই রাক্ষস 'রাবণের অন্নেতে পালিত একজন।' বিভীষণের ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ জ্ঞাতি—এই বলে পরিচয় দেওয়া হল তরণীসেনের।

যুদ্ধক্ষেত্রে বানরেরা তরণীসেনকে মায়াবী রাক্ষস বলে মনে করলেন, তাঁর সর্ব অঙ্গে লেখা রাম-নাম পরিহাসের বিষয় হয়ে উঠল। কিন্তু তরণীর বীরত্বের সামনে দাঁড়াবার সাধ্য কারো হল না। নীল কিংবা হনুমান, অঙ্গদ কিংবা সুগ্রীব—সকল বানরবীর তরণীসেনের হাতে পরাজিত হলেন; এবং এতক্ষণে তরণীসেনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল—তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং নারায়ণ রামকে দেখতে পেলেন। সঙ্কেতে পিতাকে প্রণাম জানিয়ে তিনি হাতজোড় করে প্রণাম করলেন শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে।

এতক্ষণে বিভীষণ রামকে দেখিয়ে দিলেন—পরম শত্রু তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছে করজোড়ে। বিস্মিত রামকে এইবার তিনি জানালেন—'লঙ্কাপুরে ও তোমার ভক্ত একজন।। তোমার চরণ বিনা অন্য নাহি জানে। আসিয়াছে সংগ্রামেতে রাজার শাসনে।।' আগত শত্রু যে তাঁর পরম ভক্ত, একথা জানা-মাত্র রাম তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, তাঁর মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয়। লক্ষ্মণ স্বভাবতই চমকে উঠলেন, কারণ রাক্ষসের মনোবাঞ্ছা হল রাবণের জয়। কিন্তু রাম তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন, ভক্ত কখনও ভগবানের কাছে 'বিষয়-বাঞ্ছা' করে না—অর্থাৎ মোক্ষই হল সেই একমাত্র পরম রত্ন, যা একজন ভক্ত রামের কাছে কামনা করে।

তরণীসেন কিন্তু তাঁর যুদ্ধে আগমনের মূল উদ্দেশ্য ভুলে যাননি। এবার তিনি লক্ষ্মণের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, পরাজিত লক্ষ্মণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলে হনুমান তাঁকে নিয়ে পলায়ন করলেন।

এতক্ষণে তরণীসেন মুখোমুখি হলেন তাঁর আরাধ্য দেবতার—রামের। তাঁকে যুদ্ধে উদ্যত করার জন্য তিনি তীব্র কটূক্তি করলেন, 'কোথায় তপস্বী ভণ্ড জটাধারী রাম।' ক্রুদ্ধ রাম এইবার ত্রিভুবনবিজয়ী ধনুক হাতে তরণীসেনের সামনে এসে দাঁড়ালেন, এবং তরণীসেন দেখলেন রামের সেই বিশ্বরূপ—তাঁর একৈক রোমকূপের ভেতর পর্বত, কন্দর, নদনদী, জনলোক, তপলোক, ব্রহ্মলোক; তাঁর চরণে তরঙ্গায়িত গঙ্গা। তরণী ধনুর্বাণ ফেলে রামের স্তব করতে লাগলেন :

'তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর।।
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য তুমি দিবারাতি।
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি।।'

এই স্তব শুনে রাম নিজেও ধনুর্বাণ ত্যাগ করলেন। বিভীষণকে বললেন, এমন ভক্তকে বধ করলে তিনি নিজেও প্রাণ ত্যাগ করবেন। ভক্তের শরীরে কণ্টকের আঘাত হলেও তিনি আহত হন।

রামকে যুদ্ধ থেকে বিরত হতে দেখে তরণীসেন চিন্তিত হলেন, তাঁর মূল উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ হয়ে যায়! আবার ধনুঃশর তুলে নিয়ে কর্কশ বাক্যে তাঁকে তিনি উত্তেজিত করে তুললেন। ইতোমধ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়ে লক্ষ্মণ তরণীসেনকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিলেন। এবার বিভীষণ তাঁকে বাধা দিলেন, কারণ তিনি জানেন—তাঁর পুত্রের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—রামের হস্তে প্রাণ ত্যাগ করে গোলকের যাওয়া। লক্ষ্মণের হস্তে প্রাণ গেলে তাঁর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

বিভীষণই রামকে বলে দিলেন তরণীসেন-বধের উপায়—ব্রহ্মার বরে একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়া অন্য কোনও অস্ত্রে তরণীসেনের মৃত্যু নেই। রাম সেই বাণই সন্ধান পূরণ করলেন; ভয়ঙ্কর বাণ তরণীসেনের মুণ্ড কেটে ফেলে দিল। আর কী আশ্চর্য :

'দুই খণ্ড হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে।
তরণীর কাটা মুণ্ড রাম রাম বলে।।'

এইবার শোকে আকুল হয়ে বিভীষণ ক্রন্দন করতে লাগলেন। রামের কাছে প্রকাশ করলেন আপন পুত্রের প্রকৃত পরিচয়। রামও ভক্তের দুঃখে ক্রন্দন করে উঠলেন, তাঁর সঙ্গে কেঁদে উঠলেন সমস্ত বানরসেনা। কিন্তু স্বয়ং বিভীষণ রামকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, রামের হস্তে মৃত্যু হওয়ায় সমস্ত রাক্ষসেরা বিষ্ণুলোকে গমন করেছে, একমাত্র বিভীষণেরই সেই সৌভাগ্য হবে না, কারণ তিনি রামের শত্রু নন—পরম মিত্র। রাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন :

'যতদিন রবে তুমি অবনী ভিতরে।
আমার সমান দয়া তোমার উপরে।।'

একবার কল্পনা করুন, মঞ্চের উপর যখন এই আশ্চর্য দৃশ্য অভিনীত হত, এই শত্রুরূপে ভজনা, এই করুণ মৃত্যু, এই সামূহিক ক্রন্দন—তখন সামনে বসে-থাকা ভক্তপ্রাণ দর্শকেরা কীভাবে কেঁদে আকুল হতেন! আমরা বাঙালিরা কাঁদতে ভালোবাসি। কৃত্তিবাস বহু শতাব্দী ধরে আমাদের কাঁদিয়ে আসছেন।

কিন্তু কথাটা হল, এই করুণরসের পশ্চাতে কি গোপন রয়ে গেল অন্য কোন অলক্ষ্য গণিত? কোন বৃহৎ পরিবর্তনের বীজ কি রোপিত হয়ে গেল এইভাবেই?

এইবার আমরা মূলে পৌঁছে গেছি। বাল্মিকী রামকে এঁকেছিলেন একজন প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীর হিসাবে, আর্য ও অনার্য দ্বন্দ্বের এক চিরন্তন বীর, যিনি বিজয়ের প্রতীক। আর্যবীরত্বের প্রতীক।

কৃত্তিবাস যে সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেন, ততদিনে রামের প্রয়োজনীয়তা—এবং ফলে তাঁর অবয়ব—অনেকখানি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। যে রাম উত্তরকাণ্ড ব্যতীত সমগ্র বাল্মীকি-রামায়ণে প্রায় কোথাও অবতার প্রশ্নের মুখোমুখি হন না, এবং ক্বচিৎ হলেও অস্বীকার করেন—তিনি কৃত্তিবাসের রামায়ণের সূত্রপাত থেকেই অবিসংবাদিত দেবতা। ক্ষত্রিয় রামের বীরত্ব তাই কৃত্তিবাসের মূল বর্ণনীয় বিষয়ই নয়! তাঁর মুখ্য বর্ণনার বিষয় হল—রামের 'ভক্তের-ভগবান' রূপ, ভক্তের প্রতি তাঁর দয়া, তাঁর অচল করুণা। বীরত্ব সেই অবতারের একটি লীলা-মাত্র; চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য নয়।

আর ঠিক এইখানে এসে বাল্মিকী-রামায়ণের, তথা বাল্মীকির সৃষ্ট রামের চরিত্রটির ভরকেন্দ্র পাল্টে ফেলেন কৃত্তিবাস। যা ছিল মূলত আদর্শ এবং বীরত্বের আখ্যান, তা হয়ে ওঠে ভক্তের ভগবানের লীলাবিলাস। যে ভক্ত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে রণস্থলে এসেছে, মৃত্যুবরণ করাই যার যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য—তাকে বধ করাটা, আর যাই হোক, বীরত্বের পরিচয় নয়। কৃত্তিবাস যে রামকে বীর হিসেবে পরিচয় দিতেই চাইছেন না! তাঁর বর্ণনীয় বিষয়—ক্রন্দন। তাঁর অভীষ্ট রস বীর নয়, করুণ। রামের পরিচয় তাঁর বীরত্বে বা আদর্শ পালনে নয়, ভক্তের মৃত্যুতে তাঁর শোকাকুল অবস্থায়।

এই যে ভরকেন্দ্রের পরিবর্তন, সেটি আরও পরিণত, আরও গাঢ় রূপ ধারণ করেছে তুলসীদাসের হাতে পড়ে, কারণ তুলসীদাসের কাব্য শুরুই হয় রামের পারম্য স্বীকার করে নিয়ে।

স্বয়ং মহাদেব শিব যে রামের পরম ভক্ত, তা জানতে পেরে দক্ষ প্রজাপতির কন্যা—শিবগৃহিণী সতী অত্যন্ত বিস্মিত হন। তিনি স্থির করেন, রামের এই ঐশ্বরিক পারম্যের পরীক্ষা নেবেন। সতী যখন দেখলেন

সীতাকে হারিয়ে রাম বনে-বনান্তরে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তখন রামের দেবত্বে তাঁর ঘোর সন্দেহ হল— সর্বজ্ঞানী অসুরারি কেন অজ্ঞের মতো নিজের স্ত্রীকে খুঁজে বেড়াবেন? 'খোজই সো কি অগ্য ইব নারী। গ্যানধাম শ্রীপতি ত্রিপুরারি?'

তাই তিনি সীতার ছদ্মবেশে রামকে ছলনা করতে চাইলেন। অন্তর্যামী রাম ছদ্মবেশধারী সতীকে দেখা-মাত্র চিনতে পারলেন, কিন্তু সরাসরি কিছু না-বলে তাঁকে প্রণাম করে, নিজের পিতৃপরিচয় দান করে শিবের সংবাদ জানতে চাইলেন :

'জোরি পানি প্রভু কীহ্ন প্রণামূ।
পিতা সমেত লীহ্ন নিজ নামূ।।
কহেউ বহোরি কহাঁ বৃষকেতু।
বিপিন অকেলি ফিরহু কেহি হেতূ।।'

এই প্রশ্ন থেকেই রামের স্বরূপ চিনতে পেরে পরম লজ্জিত হয়ে সতী ফিরে এলেন কৈলাসে। অভিমানে শিব ধ্যানমগ্ন হলেন। তীব্র আত্মধিক্কারে সতী দেহত্যাগ করার ব্যাপারে কৃতনিশ্চয় হলেন। তুলসীদাসী রামায়ণ অনুসারে, দক্ষযজ্ঞের সময় শিব-নিন্দা শ্রবণ করে সতীর দেহত্যাগের পশ্চাতের প্রকৃত কারণ—রামের দেবত্বে তাঁর এই অনর্থক সন্দেহ।

খুব স্পষ্ট করে বললে, তুলসীদাস তাঁর পাঠকদের মূল রামায়ণে প্রবেশের পূর্বেই সতর্ক করে দিচ্ছেন— তাঁরা যেন কোনওক্রমেই রামের দেবত্বে সন্দিহান না-হন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর পর্যন্ত রামকে পূজা করেন— রাম এমনই পরম ঈশ্বর।

আধুনিক মননের সমস্যা এইখানে—এইভাবে কোনও চরিত্রের দেবত্ব স্বীকার করে নিয়ে, তাঁর সকল আচরণকে লীলা বলে স্বীকার করে নিয়ে আমরা যদি কোনও গ্রন্থে প্রবেশ করি—তাহলে আর শিক্ষনীয় কিছু থাকে না। তখন রামের মহান আদর্শ, পিতৃসত্যের জন্য রাজ্যত্যাগ, তাঁর অতুলনীয় বীর্যবত্তা, রাজনীতিবিদ হিসাবে তাঁর বিচক্ষণতা, তাঁর ভ্রান্তি, সেই ভ্রান্তির জন্য তাঁর মর্মান্তিক অনুতাপ—সবই লীলা হয়ে ওঠে, আর আদর্শ থাকে না।

অথচ রাম তো এক লীলাময় বিগ্রহ-মাত্র নন! কেবল নামজপে মুমুক্ষু ভক্তকে মুক্তি দেওয়া তো তাঁর আরব্ধ কর্ম ছিল না! এই বিশাল দেশের এক বিপুল কালের পথিক অগণ্য মানুষ, রামের—এবং রামায়ণের অন্যান্য চরিত্রগুলি থেকে—শিক্ষা নিয়েছেন। দীক্ষিত হয়েছেন ত্যাগের, সংগ্রামের, তিতিক্ষার, প্রেমের, ভ্রাতৃত্বের মহত্তম আদর্শে। তার সবই যদি লীলা হয়ে যায়, তাহলে যে রাম সৃষ্টি হন—তিনি দূর আকাশের দেবতা; রাবণ ও অন্যান্য রাক্ষসেরা নিতান্ত শত্রুরূপে তাঁকে ভজনা করে স্বর্গে যায়, পাপমোচন হয়—ব্যস! লীলা দর্শনীয়, অনুকরণীয় নয়। কৃষ্ণের গোপীপ্রেম লীলার প্রতীক-মাত্র; বাস্তবজীবনে প্রয়োগের অনুকূল আদর্শ নয় কিন্তু! রামের জীবন অনুকরণীয়; কারণ তা আমাদের গৃহে এবং গৃহের বাইরে কেমন আচরণ করতে হয়—তা শিক্ষা দেয়। তা লীলা? লীলামাত্র!!

এইজন্যই বলছিলাম, তরণীসেন বা সতী শুধু রামভক্তি প্রচার করেই নিজের কর্তব্য সম্পাদন করেন না। কৃত্তিবাস বা তুলসীদাস ঠিক কোন মূল বিন্দুতে বাল্মীকি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক—সেইটে দেখিয়ে দিয়ে যান আসলে।

ভুলবেন না যেন, বাল্মীকি-রামায়ণ রামের জীবনকথা বলে বটে; কিন্তু তার কোথাও—কো থা ও—শ্রীরাম বা রামচন্দ্র শব্দটিই নেই।

মানে একবারও নেই।

আর তাই, তরণীসেনও নেই!

ঘরশত্রু বিভীষণ!

রামায়ণ যে বহু শতাব্দী ধরে ভারতের সবচেয়ে বেশি পঠিত মহাকাব্য—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বাংলাতেও এর অনুবাদ হয়ে গিয়েছে বহু পূর্বে। তুলসীদাসের অনুবাদও না-হোক চারশো বছরের পুরোনো। ফলে গোটা ভারতবর্ষে রাম শব্দটি অতুলনীয় বৈচিত্র্যে ব্যবহৃত হয়। বিশেষত উত্তর ভারতে রাম-নাম 'আদাবন্তে চ মধ্যে চ'—জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্বমহিমায় চলতে থাকে; অর্থাৎ দুজন পরিচিত মানুষের দেখা হলে তাঁরা পরস্পরকে 'রাম রাম' বলে সম্বোধন করেন; আবার মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার সময়ও—বলতে নেই—সেই 'রাম নাম সত্য' হয়ে ওঠে।

কিন্তু বাঙালি জীবনে রামায়ণের পরিসর আরও বিচিত্র, ফলে ভাষাতে ও বাগধারাতেও তার প্রভাব আরেকটু বিস্তৃততর। এখানে 'এক' শব্দটি অপয়া, কাজেই 'রাম দুই সাড়ে তিন।' এখানে 'সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ার পর সীতা কার বাপ'—এ প্রশ্ন চিরন্তন। খোদ রবি ঠাকুর বনবাসে যেতে এক পায়ে খাড়া হয়ে যান, শুধু 'লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার থাকতো সাথে সাথে।' আর ঠিক এতটাই প্রবাদপ্রতিম খ্যাতি-সহ অখ্যাতিতে নিমজ্জিত হয়ে থাকেন 'ঘরশত্রু বিভীষণ।' মীরজাফরের মতোই তিনিও বিশ্বাসঘাতকতার চিরন্তন প্রতীক হয়ে থেকে গিয়েছেন বাঙালি মানসে।

ঠিক আগের পর্বেই তরণীসেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সূত্রে আমরা জেনেছিলাম—রামায়ণের ঠিক কোন পর্যায়ে বিভীষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কাজেই সে কথা আরেকবার তুলে ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না আপনাদের। আর ব্যাপারটা মোটেই এমন নয় যে, এই পর্বে আমরা বিভীষণের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করতে চলেছি। সে বৃত্তান্ত আপনারা খুব ভালো করেই জানেন। তাছাড়া এ-কথা কিন্তু আমি ভুলে যাইনি যে, আমাদের শিরোনাম সেই 'বাল্মীকি-রামায়ণে নেই।' এক্ষেত্রেও আমরা বিভীষণের জীবন থেকে চয়ন করে নেব ঠিক সেই স্পর্শকাতর মুহূর্তটি—যখন একটি অভাবনীয় সিদ্ধান্ত তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণ অন্য পথে চালিত করে দিয়েছিল। আর সেই সিদ্ধান্ত এমনই, যা বাল্মীকিকে না হলেও, কৃত্তিবাসকে বড়োই দ্বিধায় ফেলে

দিয়েছিল। আর হ্যাঁ, তুলসীদাসও সেই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি সাজাতে গিয়ে বাল্মীকির পথ থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু আগে দেখে নিই—খোদ আদিকবি এ বিষয়ে ঠিক কোন পরম্পরায় ঘটনা সাজাচ্ছেন।

সীতার খোঁজ করতে হনুমান গেলেন লঙ্কায়। সেখানে সমস্ত কর্তব্য পালন করে, সীতাকে নিশ্চিন্ত করে তিনি যখন রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, তখন ইন্দ্রজিৎ তাঁকে বন্দী করলেন। ক্রুদ্ধ রাবণ হনুমানকে বধ করতে আদেশ দিলেন। এইসময় প্রথম আমাদের চোখে পড়ে—রাবণের ভাই বিভীষণ ঠিক অন্য রাক্ষসদের মতো নন, তিনি কিন্তু এমনকী রাবণকেও যুক্তি দেখিয়ে কাবু করতে পারেন। তাঁর যুক্তি মেনে নিয়েই রাবণ দূতকে হত্যা করার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে হনুমানের ন্যাজে আগুন লাগানোর বেয়াক্কেলে নির্দেশটা দিয়েছিলেন। হিতে বিপরীত হয়েছিল আর কি। অর্ধেক লঙ্কা পুড়ে ছাই হল।

যাই হোক, একা হনুমান যখন লঙ্কাপুরী বিধ্বস্ত করে দিয়ে সীতার সংবাদ নিয়ে বিজয়ীর বেশে ফিরে গেলেন, তখন স্বভাবতই রাবণের লজ্জার শেষ থাকল না। তিনি এ বিষয়ে একটি মন্ত্রণাসভার আহ্বান করলেন। সেখানে আমরা রাবণকে যথেষ্ট চিন্তিত অবস্থাতেই দেখতে পাই, কিন্তু অন্যান্য রাক্ষসেরা সেই সভায় বিপুল তর্জনগর্জন করতে লাগল নিজের নিজের বীরত্বের প্রমাণ দেওয়ার জন্য; তারা একাই সমস্ত বানরবাহিনীকে এবং রাম-লক্ষ্মণকে ধ্বংস করে দেওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করতে লাগল। এই সময় বিভীষণ ফের একবার বেসুরো গাইলেন।

সমস্ত রাক্ষস বীরদের তর্জনের একবারে বিপরীতে দাঁড়িয়ে বিভীষণ বললেন, একটিমাত্র বানর এসে যখন অর্ধেক লঙ্কা ভস্মীভূত করে দিয়ে চলে গেল, তখন এইসব বীরেরা কোথায় ছিলেন? তারপর তিনি সরাসরি রাবণকে পরামর্শ দিলেন—তিনি যেন সীতাকে কালসর্প বিবেচনা করে পরিত্যাগ করেন, কারণ সীতার থেকে গোটা রাক্ষসবংশ বিপন্ন হতে চলেছে।

স্বভাবতই সীতার প্রতি তীব্রভাবে আসক্ত রাবণ এইসব পরামর্শ গ্রহণ করলেন না, এবং সেদিনের মতো সভা ভঙ্গ করে দিলেন। পরদিনও বিভীষণ একই কথা বললেন, বারংবার রাবণকে সাবধান করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত রাবণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল, প্রকাশ্য সভাতেই তিনি নির্লজ্জের মতো স্বীকার করলেন—তিনি সীতাকে কামনা করেন। কোনও কিছুর বিনিময়েই তিনি তাঁকে ত্যাগ করতে পারবেন না। সুতরাং প্রধান রাক্ষসেরা যেন এমন কোনও উপায় বলেন, যাতে রাম নিহত হন এবং সীতা রাবণের করায়ত্ত হন। বিভীষণ শেষবারের মতো তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। রাবণ এবার তাঁর সঙ্গে চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার করলেন, এবং পরিষ্কার বলে দিলেন—নিতান্ত সহোদর ভ্রাতা না হলে তিনি এই দণ্ডেই বিভীষণকে প্রাণদণ্ড দিতেন —'যোন্যস্ত্বেবংবিধং ব্রুয়াদ্বাক্যমেতন্নিশাচর। অস্মিন্মুহূর্তে ন ভবেৎ ত্বাং তু ধিক্ কুলপাংসন।।'

এই অসহ্য অপমানের মুখোমুখি হয়েই বিভীষণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন—এইবার তাঁর ধর্মচ্যুত অগ্রজকে ত্যাগ করার সময় হয়েছে। তিনি ভূমি ছেড়ে, চারজন মন্ত্রীর সঙ্গে আকাশমার্গে উত্থিত হলেন, এবং রাবণকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন—গুরুজন হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁকে এবং লঙ্কাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন, কারণ পরস্ত্রীহরণের মতো অন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব। অগ্রজের কাছে ক্ষমা চেয়ে তিনি সভাত্যাগ করলেন, এবং তৎক্ষণাৎ আকাশপথেই উপস্থিত হলেন সমুদ্রের অপরপারে অপেক্ষমাণ রামের বিপুল বানরসেনার উপরে।

এরপর কী হয়েছিল, তা আমাদের জানা আছে। সুগ্রীব এবং অন্য কোনও কোনও বানরপ্রধান বিভীষণকে আদৌ বিশ্বাস করতে না-পারলেও রাম তাঁকে আপন পক্ষে স্থান দিলেন। কিন্তু লক্ষণীয় কাণ্ডটি যে আপনারা সত্যিই লক্ষ্য করেছেন—তা আমি জানি।

ব্যাপারটা এমন মোটেই নয় যে, সেই ছোট্টবেলা থেকে জেনে আসা বিভীষণকে রাবণের পদাঘাত করার বিষয়টা উল্লেখ করতে আমি ভুলে গেছি।

বাল্মীকি এটি লেখেনইনি!

আজ্ঞে হ্যাঁ, লক্ষ্মণের সেই বিখ্যাত গণ্ডিটা যে বাল্মীকি আঁকেননি, পরবর্তীকালে আঁকা হয়েছিল—এই খবরটা যেমন অবাক করে, তেমনই অবাক করে অনুবাদকদের এই সরে আসাটা। মহাকাব্যে মৌখিক অপমানই যথেষ্ট বলে বিবেচনা করেছিলেন বিভীষণ। অগ্রজের পদাঘাতের জন্য অপেক্ষা করেননি তিনি। পরবর্তীকালে উত্তর ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী দুই অনুবাদকই কিন্তু পদাঘাত-বৃত্তান্তকে ঠাঁই দিয়েছেন আপন আপন গ্রন্থে। প্রথমেই দেখে নিই কৃত্তিবাস কী বলছেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে একটি ক্ষুদ্র এবং অকিঞ্চিৎকর পরিবর্তনের কথা আগেই সেরে নিই। বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাবণের ও অন্যান্য রাক্ষসদের জন্মবৃত্তান্ত বিস্তারিত আকারে বলা হয়েছে। সেখানে রাবণের মায়ের নাম কৈকসী। ইনি সুমালী নামক রাক্ষসের কন্যা। পিতার কথায় বিশ্রবা মুনিকে স্বয়ং পতিত্বে বরণ করে রাবণ ও অন্যান্য ভাই-বোনেদের জন্ম দিয়েছিলেন। তিনি বিভীষণেরও মা। কৃত্তিবাস কেন এঁর নাম পরিবর্তিত করে নিকষা করেছিলেন, তা বলা মুশকিল।

যাই হোক, কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসারে এই নিকষার কথায় বিভীষণ রাবণকে বোঝাতে এলেন যে, দারুণ পাবকতুল্য সীতাকে ছেড়ে দিলে লঙ্কা এবং রাবণ—উভয়ই নিরাপদ হয়। রাবণ বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান বিভীষণের চাইতে স্তাবক ও চাটুকার রাক্ষসপ্রধানদের কথায় বেশি খুশি হলেন, কারণ তাঁরা রাবণের অভিপ্রায় অনুযায়ী কথা বলছিলেন। সবচেয়ে বেশি করে যা রাবণকে বিরক্ত করছিল, তা হল—বিভীষণ সামান্য একজন মানুষকে ভয় পাচ্ছিলেন এবং রাবণকেও ভীত করে তোলার চেষ্টা করছিলেন। অবশেষে রাবণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল এবং :

তবে সেই দশানন মহাবেগে চলে।
পদাঘাত কৈলা বিভীষণ বক্ষঃস্থলে।।
বিভীষণ অচেতন হইয়া তাহায়।
পড়িল ধরণীতলে ছিন্নতরুপ্রায়।।

এই দৃশ্য দেখে অন্তরীক্ষে দেবতারা পরস্পরের সঙ্গে বলাবলি করতে লাগলেন—এবার নিশ্চিতভাবেই রাবণের সর্বনাশ হবে, কারণ তিনি বিভীষণের অঙ্গে পদাঘাত করেছেন।

বরঞ্চ সহেন রাম নিজ তিরস্কার।
ভক্ত-অপমান সহ্য না হয় তাঁহার।।

তখনও উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ না-ঘটলেও দেবতাদের জানা ছিল—বিভীষণ পরম রামভক্ত। এই পদাঘাত যে পরবর্তীকালে ভয়ঙ্কর রূপ ধরে ফিরে আসবে—দেবতারা তা জানতেন।

আশ্চর্যভাবে, এই পদাঘাত-বৃত্তান্ত কিন্তু আমরা হুবহু খুঁজে পাই শ্রীতুলসীদাস রচিত রামচরিত-মানস গ্রন্থের সুন্দরকাণ্ডে :

মম পুর বসি তপসিনহ পর প্রীতী।
সঠ মিলু জাই তিনহহিঁ কহু নীতী।।
অস কহি কীনহেসি চরনপ্রহারা।
অনুজ গহে পদ বারহিঁ বারা।।

এই 'চরণপ্রহারা' বা পদাঘাত সত্ত্বেও বিভীষণ কিন্তু রাবণকে পালটা অপমান করেননি; কারণ সাধু লোকেরা কেউ মন্দ করলেও বিপরীতে উপকারই করে—'মন্দ করত জো করই ভলাঈ।' পদাঘাতের চরম অপমান সহ্য করেও বিভীষণ বিনীতভাবে রাবণকে বুঝিয়ে বললেন শেষবারের মতো—তুমি অগ্রজ, পিতার সমান। পদাঘাত করে ভালোই করেছ, কিন্তু রামের ভজনা করো—তাতেই তোমার উপকার হবে। এই বলে বিভীষণ আকাশপথে উঠলেন, এবং সভামধ্যে ঘোষণা করে রাবণকে ত্যাগ করে রামের পক্ষে যোগ দিলেন প্রকাশ্যেই—'ম্যায় রঘুবীর সরন অব জাউঁ'—আমি রঘুবীরের শরণ নিলাম।

এখান থেকে সরাসরি তিনি এলেন সমুদ্রতীরের সেই স্থানে, যেখানে রাম সৈন্যসমাবেশ করেও থমকে আছেন, কারণ সামনে প্রকাণ্ড এক প্রাকৃতিক বাধা। সমুদ্র।

দেখা যাচ্ছে, বাল্মীকির সঙ্গে কৃত্তিবাসের কিঞ্চিৎ ফেরফার থাকলেও তুলসীদাস বরং এক্ষেত্রে বাল্মীকির পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন নিশ্চিন্তমনে।

কিন্তু রামের সম্মুখে যত বড় বাধা ছিল, তার চেয়েও বড়ো বাধা পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল কৃত্তিবাসের বিভীষণের। সাগর নয়।

লোকনিন্দা!

যে লোকনিন্দার কথা বাল্মীকি বা তুলসীদাসের কাছে ভাবনার বিষয় বলেই মনে হয়নি, তার জন্য কিন্তু কৃত্তিবাসকে লিখতে হয়েছে দীর্ঘ এক নতুন বৃত্তান্ত, আবার বলতেই হচ্ছে,—যা 'বাল্মীকি-রামায়ণে নেই।'

বলি তবে?

বিভীষণের চারজন অমাত্য—অনিল, অনল, ভীম (বাল্মীকি-রামায়ণে এই নামটি নেই, আছে হর। অন্যত্র আবার এদের নাম অনিল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতি) এবং সম্পাতি। এঁদের সঙ্গে নিয়েই বিভীষণ বেরিয়ে এলেন রাবণের সভা থেকে। কিন্তু অন্যদের মতো কৃত্তিবাসী বিভীষণ সরাসরি রামের শরণ নিলেন না। পরম ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে সহসা দেখা দিল দ্বিধা। সংশয়। একেই তিনি অগ্রজের বিরোধিতা করে তাঁকে ত্যাগ করে এসেছেন। তায় যদি সোজাসুজি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছেই গিয়ে তাঁর পক্ষে যোগ দেন :

'তাহে যদি রাম-কাছে করিহে গমন।
অখ্যাতি করিবে মোর যত অজ্ঞজন।।'

কাজেই এখনই রামের কাছে না-গিয়ে বরং কোনও নির্জন স্থানে বসে 'শ্রীরামচরণপদ্ম ধ্যান করি মনে।' পরে রাবণের মৃত্যুর পরে তাঁর যাওয়াই উচিত হবে। অবশ্য আরেকটি কর্মও করা যেতে পারে। বিভীষণের বৈমাত্রেয় বড় ভাই হলেন কুবের (কুবেরের পিতা বিশ্রবা, যিনি বিভীষণ ও তাঁর ভাইবোনেদেরও পিতা। কিন্তু তাঁর মাতা হলেন ভরদ্বাজ-কন্যা দেববর্ণিনী)। তাঁর কাছে গিয়ে যদি পরামর্শ নেওয়া যায়, তাহলে একটি মার্গদর্শন পাওয়া যেতে পারে।

সরবে এই সব জল্পনা করে তিনি তাঁর সহযাত্রী মন্ত্রীদের পরামর্শ চাইলেন। তাঁরাও কুবেরের কাছে গিয়ে সৎপরামর্শ নেওয়ার কথাটি অনুমোদন করলেন।

এদিকে অন্তর্যামী শিব বিভীষণের এই দোলাচল জানতে পারলেন, এবং স্থির করলেন, স্বয়ং বন্ধু কুবেরের সভায় গিয়ে তিনি নিজেই বিভীষণকে রামের চরণে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেবেন, কারণ :

'যদি কেহ রামচন্দ্রে করয়ে আশ্রয়।
তবে মোর কতই পরমানন্দ হয়।।'

সুতরাং শিব চললেন দুর্গাকে নিয়ে কৈলাসে স্থিত কুবেরের সভায়। দূর থেকে বিভীষণকে সেখানে আসতে দেখে শিব সরাসরি কুবেরকে বললেন—তিনি যেন বিভীষণকে রামের কাছে আশ্রয় নেওয়ারই পরামর্শ দেন;

তাতে রামের যেমন, তেমন বিভীষণেরও মহদুপকার সাধিত হবে। যথাকালে বিভীষণ সেখানে উপস্থিত হয়ে স্বয়ং মহাদেবকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন, এবং কুবের ও মহাদেব—দুজনেই তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। যদিও কুবের সবই জানতেন, তবু বিভীষণের মুখ থেকে সব শুনে তাঁকে পরামর্শ দিলেন রামের সঙ্গে মিলিত হওয়ার।

তখন বিভীষণ জানালেন তাঁর প্রকৃত দ্বিধার কারণ। রাবণের বিনাশের পর রাম যদি তাঁকে লঙ্কার রাজা করেন, তাহলে সকলের এ কথা মনে হতে বাধ্য—বিভীষণ রাজ্যলোভে আপন অগ্রজকে ত্যাগ করে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়ে নিজের আত্মীয়দের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তার চাইতে বড় কলঙ্ক যে আর কিছুই হতে পারে না!

এবার আর কুবের নন, বিভীষণকে বোঝানোর দায়িত্ব নিলেন শিব নিজেই। তিনি বললেন—বিভীষণ রামকে মনুষ্য বলে জ্ঞান করছেন বলেই তাঁর এমন দীন সংশয় আসছে। রাম স্বয়ং ঈশ্বর :

'সত্য-সুখ-জ্ঞান-ধন তনু রঘুপতি।
পরমাত্মা ভগবান কহে শ্রুতি যতি।।'

সুতরাং বিভীষণ যে তাঁর কাছে যাবেন বলে স্বজনদের ত্যাগ করেছেন—এর প্রকৃত তাৎপর্য হল, তাঁর অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে। দ্বিতীয় কথা, এই কারণে স্বজন ত্যাগ করলে লোকনিন্দার প্রশ্নই ওঠে না; কারণ রামসেবার জন্য দুষ্ট বন্ধুজন ত্যাগ করলে তা মহাপুণ্যের কাজ। তৃতীয়—বিভীষণ রাজ্যলোভে আপন অগ্রজকে ত্যাগ করেননি; করেছেন তাঁর অন্যায়ের সমর্থন করেন না বলে। এবার, রাম যদি তাঁকে রাজা করেন—'ইথে কেন অপযশ গাহিবে সংসারে?' প্রসঙ্গত শিব প্রহ্লাদের উদাহরণ দিলেন; নৃসিংহ যাঁর পিতাকে বধ করে তাঁকে রাজার আসন দিয়েছিলেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি আরও মনে করিয়ে দিলেন, অধার্মিক বেণ রাজাকে মুনিরা শুধু হুঙ্কার দিয়েই বধ করেছিলেন।

সর্বোপরি, রাম পূর্ণব্রহ্ম। তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে রাবণের বধে সাহায্য করলে তো কোনও অধর্ম কর্মের প্রশ্নই ওঠে না; বরং :

'রাম লাগি যদি কেহ করে পাপকর্ম।
তাহা হয় সর্বশাস্ত্রে সিদ্ধ মহাধর্ম।।'

বিভীষণ ব্রহ্মার কাছে তো এই বরই চেয়েছিলেন, তিনি যেন কখনও ধর্মপথচ্যুত না-হন!

'অতএব সকল সংশয় পরিহরি।
যাহ রাম নিকটেতে তুমি ত্বরা করি।।'

এরপরে আর বিভীষণের মনে কোনও সংশয় থাকার প্রশ্ন নেই। তিনি মহানন্দে সপারিষদ যাত্রা করলেন রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য, তাঁর শরণ নেওয়ার জন্য।

তাহলে কী দাঁড়াল ব্যাপারটা? যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বাল্মীকি-সৃষ্ট বিভীষণ পদাঘাতের অপেক্ষা করেননি, তুলসীদাস-সৃষ্ট বিভীষণ কারোর পরামর্শের তোয়াক্কা করেননি; সেই বিভীষণই কৃত্তিবাসের হাতে পড়ে খামোখা ছুটলেন কৈলাস পর্বতে বৈমাত্রেয় দাদার পরামর্শ নিতে। বলা ভালো, নিজের অবচেতন তাঁকে যে পথে পাঠাচ্ছে, নিজের সংস্কার তাঁকে যে সিদ্ধান্ত নিতে প্রণোদিত করছে—তা নিয়েও তিনি সংশয়াতুর! অন্যের অনুমোদন চাই তাঁর, চাই পরামর্শ!

অনেক, অনেক বছর পরে রবিঠাকুর এঁকেছিলেন এক হালফ্যাশনের দ্যুতিময় ছোকরার ছবি। অমিত রায়। 'শেষের কবিতা'-তে সে এক আপাত-তাৎপর্যহীন অমোঘ ঘোষণা করেছিল—'আপন রুচির জন্যে আমি পরের রুচির সমর্থন ভিক্ষে করি নে।'

দেখা যাচ্ছে, বাল্মীকি এবং তুলসীদাস বিভীষণ চরিত্রের মধ্যে সেই অস্মিতা, সেই আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিত্ব দেখতে পাচ্ছেন।

কৃত্তিবাস পাচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি যে বাঙালি! লোকনিন্দার চেয়ে বড় সর্বনাশ যে আর কিছু হতেই পারে না! রামমোহন রায়কে বাঙালি সমকালে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। তাঁর সবচাইতে কাছের সঙ্গীটিকে জীবদ্দশায় না-পারলেও উত্তরকালে ডুবিয়ে দিয়েছিল অলীক অসঙ্গত কলঙ্কের অবারিত স্রোতে, নির্বাসিত করে দিয়েছিল আমাদের স্মৃতির জগৎ থেকে। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর।

বাঙালি এই কাজটা খুব পারে। পরচর্চা আর পরনিন্দা। কিন্তু সমালোচনা নেওয়া আজও তার ধাতে নেই।

কৃত্তিবাস ওঝা যে খাঁটি বাঙালি ছিলেন—তার এর চাইতে বড় প্রমাণ আর কীই-বা হতে পারে? আর আমরা, তাঁর পাঠকেরা?

এত কৈফিয়ত, এত দেবতার পরামর্শের পরেও আমাদের শান্তি হল না। বিভীষণ আজও আমাদের কাছে ঘরশত্রু, মাইকেল তাঁর মুখে বসিয়ে দিচ্ছেন 'পরদোষে কে চাহে মজিতে?' ধরনের মারাত্মক সংলাপ—যেন পরমাত্মীয় মারাত্মক দোষাবহ অন্যায় করলেও তার পক্ষ থেকে সরে দাঁড়িয়ে সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করাটাও আর এক অন্যায়!

আমরাও, দেখাই যাচ্ছে—খাঁটি বাঙালিই রয়ে গেছি।

'হে মুগ্ধা জননী—রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করনি!'

শবরীর প্রতীক্ষা

একটা কথা বলব বলব করেও কেবলই ভুলে যাচ্ছিলাম। এইবেলা সেই কথাটা সেরে রাখি।

বইটা এই পর্যন্ত পড়ে যদি কোনও পাঠকের ধারণা হয়ে থাকে যে, রামায়ণ মানে কেবলই কিছু লিখিত সংস্করণ—তা সে বাল্মিকী, কৃত্তিবাস বা তুলসীদাস—যিনিই লিখুন—তাহলে তো আমারই লেখার দোষে ঘটেছে। ব্যাপারটা মোটেই এত সহজ নয়। আমাদের দেশে লিখিত বিষয়বস্তুর চাইতে মৌখিক উত্তরাধিকারের গুরুত্ব এক তিল কম নয়। গোটা বেদ যে এককালে মুখস্থ রাখা হত—সে কথা তো মিথ্যে নয়! মনে করে দেখুন, মহাভারতের বনপর্বে যখন মার্কণ্ডেয় মুনি পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের বলেছিলেন,'এবার মার্কণ্ডেয় মুনি অনেক কথা বলবেন। তোমরা শুধু শ্রবণ করো। কর্ণময় হও।' 'কর্ণময়' হয়ে শ্রবণ করাটা আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য, পরম্পরা। সুতরাং রামায়ণের ক্ষেত্রেও যে একটা প্রকাণ্ড মৌখিক পরম্পরা থাকবে—এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বরং সেটাই স্বাভাবিক।

শবরীর আশ্চর্য প্রতীক্ষার গল্পটাও তেমনই এক অলৌকিক মৌখিক উত্তরাধিকারের অংশ।

ঠিক কোনসময় থেকে এই বৃদ্ধা তপস্বিনী বাঙালির প্রবাদের অন্তর্গত হলেন, তা জানা নেই। কিন্তু 'শবরীর প্রতীক্ষা' যে অতি দীর্ঘ সধৈর্য অপেক্ষার উদাহরণ হয়ে উঠেছে—এবং তাঁর ভক্তি যে রামভক্তির পারম্যের সমার্থক হয়ে উঠেছে—এই দুটিই আমাদের ঐশ্বর্যময় মৌখিক পরম্পরার অংশ। কারণ প্রথমটির ক্ষীণ আভাস বাল্মীকি-রচিত রামায়ণে থাকলেও দ্বিতীয়টির আভাসমাত্র শুধু বাল্মীকি কেন—কৃত্তিবাস বা তুলসীদাস কারোর রামায়ণেই নেই।

কিন্তু এই অসামান্য বিখ্যাত চরিত্রটি বাল্মীকি-রামায়ণে যে কী আশ্চর্য স্বল্প স্থান অধিকার করে আছেন, আগে সেটা একবার দেখে নেওয়া যাক।

সীতাহরণের পর রাম ও লক্ষ্মণ উদ্ভ্রান্তের মতো তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে বন থেকে বনান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। প্রথমে জটায়ুর কাছ থেকে এবং পরে কবন্ধ নামে এক রাক্ষসের কাছ থেকে তাঁরা সীতার হদিশ, ঋষ্যমূক পর্বত এবং সুগ্রীবের কথা জানতে পারেন। এই কবন্ধ নামের শাপগ্রস্ত গন্ধর্বটিই তাঁদের প্রথম শবরীর কথা বলেছিলেন।

রাম এবং লক্ষ্মণ পম্পা নদীর পাড়ে মতঙ্গবনে এসে শবরীর আশ্রম খুঁজে পান। মতঙ্গ ঋষি এর আগেই প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর শিষ্য, বৃদ্ধ মুনি-ঋষিরা তখন আর কেউ বেঁচে নেই। ভালো কথা, এই ফাঁকে বলে রাখি—এই মতঙ্গ মুনির অভিশাপের ভয়েই বালী ঋষ্যমূক পর্বতে আসার সাহস পেতেন না; যে কারণে তাঁর ভাই সুগ্রীব এই পর্বতেই চারজন মাত্র পারিষদ সঙ্গে নিয়ে বাস করতেন। হনুমান এই চারজনের অন্যতম। সুগ্রীবের প্রধান পরামর্শদাতা, মন্ত্রী—যা বলেন।

তো যাই হোক, রাম-লক্ষ্মণ যখন সেই আশ্রমে এসে পৌঁছলেন, তখন শবরী অতি বৃদ্ধা। তিনি ছিলেন এই আশ্রমের তপস্বীদের পরিচারিকা। মতঙ্গ মুনির শিষ্যরা যখন গতায়ু হলেন, তখন তাঁরা শবরীকে বলে গিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে রঘুবীর রাম এই পথে আসবেন। তাঁর পরিচর্যা করে, তবেই শবরীর মুক্তি হবে। সেই থেকেই শবরী রামের প্রতীক্ষায় আছেন—যা তাঁর যাবতীয় প্রসিদ্ধির কারণ। এখান থেকেই 'শবরীর প্রতীক্ষা' প্রবাদের উৎপত্তি—তাতে সন্দেহ নেই।

রাম-লক্ষ্মণের জন্য শবরী প্রথমেই রীতি-অনুযায়ী পাদ্য ও আচমনীয়—মানে সোজা কথায় পা-ধোয়ার জল, মুখ-ধোয়ার জল ইত্যাদি আতিথেয় দ্রব্য দিয়েছিলেন; *'পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ সর্বং প্রাদাদযথাবিধি।'* রাম সেসব গ্রহণ করে তাঁর তপস্যার খোঁজখবর নিলেন। তখনই শবরী তাঁকে বললেন সেই প্রয়াত মুনি-ঋষিদের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা। এও বললেন, সেই কারণেই তিনি রামের জন্য পম্পানদীর তীরে জন্মেছে—এমন সব জিনিসপত্র জোগাড় করে রেখেছেন। *'ময়া তু সঞ্চিতং বন্যং বিবিধং পুরুষর্ষভ। ভবার্থে পুরুষব্যাঘ্র পম্পায়াস্তীরসম্ভবম্।'*

শুনে রাম তাঁর কাছে তাঁর এবং মুনিদের তপস্যার কিছু প্রভাব দেখতে চাইলেন। শবরী তাঁকে তাঁর আশ্রমের পাশের মতঙ্গবন, 'প্রত্যকস্থলী' নামের আশ্রমের হোম করার বেদীটি, অক্ষয় অমলিন নীলপদ্ম ইত্যাদি দেখালেন। তারপর রামের অনুমতি নিয়ে তিনি অগ্নিপ্রবেশ করে স্বর্গে গেলেন। তাঁর এতদিনের পরিচর্যা ও তপস্যা ফলবতী হল।

আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক এইটুকু জায়গা নিয়ে, অতি সংকুচিত হয়ে, বিশাল রামায়ণের অনন্ত অসীম বিস্তৃতির মধ্যে এক ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো বসে আছেন শবরী। এতই কম তাঁর উপস্থিতি যে, তা বর্ণনা করতে দুটি মাত্র পরিচ্ছেদ যথেষ্ট! আর সেই অকিঞ্চিকর উপস্থিতিটুকু রামায়ণের বিপুল ঘটনাপ্রবাহকে এতটুকু প্রভাবিত করার ক্ষমতা পর্যন্ত রাখে না। রাম-লক্ষ্মণের সীতার সন্ধানে অগ্রসর হওয়ার পথে শবরী একটি মুহূর্তের স্থিতিকাল মাত্র। দার্জিলিং যাওয়ার পথে টুং স্টেশন। শান্ত, নির্বিবাদ, কোলাহলবিহীন।

অথচ সেইটুকু সম্বল নিয়েই শবরী স্থান করে নিয়েছেন বাংলা প্রবাদে। হয়ে উঠেছেন অনন্ত প্রতীক্ষা আর ভক্তির সমার্থক। কোন গুণে ঘটল এমনটি?

খেয়াল করেছেন নিশ্চয়, বাল্মীকি অন্তত এমন কিছুই উল্লেখ করেননি, যা থেকে এমন কোনও প্রবাদের সৃষ্টি হতে পারে। শবরী মতঙ্গের আশ্রমে একাকিনী রামের প্রতীক্ষায় ছিলেন বটে, কিন্তু তা যে বহুকাল ধরে —এমন কোনও উল্লেখ আদিকবি করেননি। সেকালে দীর্ঘ সময় বোঝাতে 'সহস্র বৎসর' লিখে দেওয়া হত, আক্ষরিক অর্থে তা গ্রহণ করত না কেউ। রাবণ মহাবনে সহস্র বৎসর তপস্যা করেছিলেন, রাম এগারো সহস্র বৎসর রাজত্ব করেছিলেন—এইরকম। কৃষ্ণের বার্থ সার্টিফিকেট খুঁজে বের করার গবেষণা তখনও শুরু হয়নি, '২০২০ সাল। জন্মাষ্টমী। আজ বেঁচে থাকলে শ্রীকৃষ্ণের বয়েস হত ৫২৪৮ বছর।'—এই জাতীয় 'কাকদন্তগবেষণ' (মানে কাকের ক'টা দাঁত আছে, তাই নিয়ে গোরু-খোঁজা) তখনও শুরু হয়নি। কাজেই বহুকাল ধরে যে শবরী রামের অপেক্ষায় ছিলেন—এমন কোনও উল্লেখ বা ইঙ্গিত, অন্তত বাল্মীকি দেননি।

দ্বিতীয়ত, রাম আশ্রমে আসায় শবরী তাঁকে দিয়েছেন হাত-মুখ ধোয়ার জল, আর খাওয়ার জন্য ফল। বনবাসে দশটি বছর দণ্ডকারণ্যে অসংখ্য মুনির তপোবনে গিয়েছেন রামেরা তিনজন; কোথাও একরাত, কোথাও বহুদিন বাস করেছেন। সর্বত্র অভ্যর্থনার রীতি ওই একই। পাদ্যঅর্ঘ্য, আচমনের জল, ফলমূল। কাজেই শবরী নিতান্তই রীতিমাফিক কাজকর্ম করেছেন। বিশেষ কিছু নয়।

আর রামের সমক্ষে আত্মত্যাগ?

নাঃ, এ ব্যাপারেও শবরী প্রথম স্থান অধিকার করছেন না। এর পূর্বেও এই অভিজ্ঞতা হয়েছে রামের। সত্যি বলতে কী—সে ছিল ঢের রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা। সেই ঘটনাটাও নাহয় দেখে নেওয়া যাক একবার চট করে।

ভরত যখন রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে ফিরে গেলেন, তখন রাম আর চিত্রকূটে থাকতে চাইলেন না। কখন আবার অযোধ্যা থেকে ভরত এসে পড়েন—তার ঠিক নেই! তাই তিনি লক্ষ্মণ আর সীতাকে সঙ্গে নিয়ে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেন। সেই বনেই বিরাধ রাক্ষসকে বধ করে এগিয়ে যাওয়ার পথে রাম গিয়ে পৌঁছলেন শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে। আর গোটা রামায়ণে এই প্রথমবার, পলকের জন্য, রামের দেবদর্শন হল!

দূর থেকে রামেরা তিনজন দেখলেন, একটি রথ ভূমিস্পর্শ না-করে শূন্যে ভেসে আছে। সেই রথে বসে আছেন দ্যুতিমান, অলঙ্কারভূষিত এক পুরুষ। ইন্দ্র! দেবরাজকে ঘিরে আছেন অন্যান্য দেবতারা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, মহর্ষিরা। ইন্দ্র শরভঙ্গের সঙ্গে কথা বলছিলেন। রামকে আসতে দেখে তিনি বিদায় নিলেন, তবে তার আগে শরভঙ্গকে বলে গেলেন—রাবণ-বধের পরে তিনি নিজেই রামকে দেখা দেবেন।

রাম কাছে এলে শরভঙ্গ জানালেন, দেবরাজ ইন্দ্র প্রকৃতপক্ষে তাঁকে নিয়ে যেতেই এসেছিলেন। কঠোর তপস্যায় শরভঙ্গ ব্রহ্মলোক লাভ করেছেন, ইন্দ্র এসেছিলেন তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু রামকে আসতে দেখেই বৃদ্ধ মহর্ষি তাঁর সঙ্গে দেখা করে, তারপর ব্রহ্মলোকে যাওয়ার কথা মনস্থ করেন। এরপর শরভঙ্গ তাঁর তপস্যার দ্বারা অর্জিত লোকগুলি রামকে দান করতে চাইলেন, রাম তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন—সেসব তিনি স্বয়ং তপস্যার দ্বারা অর্জন করে নেবেন। তখন শরভঙ্গ রামের দৃষ্টির সামনেই অগ্নিতে প্রবেশ করে আত্মাহুতি দিলেন, এবং ব্রহ্মলোকে গমন করলেন।

তাহলে? দেখা যাচ্ছে, রামের সম্মুখে আত্মাহুতিও শবরী প্রথম দেননি। শরভঙ্গ একজন প্রবীণ মহর্ষি, যিনি যোগবলে প্রার্থিত লোকসকল লাভ করেছেন—তিনিও রামকে আসতে দেখে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রকে ফিরিয়ে দিয়েছেন! সেই তুলনায় শবরীর আত্মত্যাগ বরং কম গৌরবজনক; কারণ রামের সমক্ষে মৃত্যু হওয়াই তাঁর তপস্যার পূর্ণতা।

বেশ, বুঝলাম। কিন্তু তাহলে শবরীর এই প্রবাদে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটার সূত্রপাত কোথা থেকে? নির্ঘাত কৃত্তিবাস? ভক্তিরসের তো ইনিই ভগীরথ দেখা যাচ্ছে!

আজ্ঞে না, এবারেও ঠকেছি আমরা। যতই কৃত্তিবাস ভক্তিরসের বান ডাকিয়ে দিন (সে বাবদে অবিশ্যি তুলসীদাস বেশ কয়েক কদম এগিয়েই থাকবেন, হেঁ হেঁ...), এই গল্পটির ক্ষেত্রে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া যাচ্ছে না। বরং এ ক্ষেত্রে তিনি দায় সেরেছেন অতি অল্পে, কয়েকটি মাত্র পয়ারে অতি দ্রুত কোনওক্রমে শবরীকে যৎসামান্য স্বীকৃতি দান করেই তিনি অরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত করে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ঢুকে পড়েছেন অশোভন দ্রুততার সঙ্গে। দেখে নিই সেই নীরস কয়েকটি পংক্তি কী কয়!

বস্তুত, প্রায় কিছুই কয় না। পম্পানদীর তীর ধরে চলতে চলতে রাম-লক্ষ্মণ প্রবেশ করলেন মতঙ্গ মুনির আশ্রমে। সেখানে শবরী বাস করছিলেন। রামকে আশ্রমে প্রবেশ করতে দেখে তাঁর চোখে জল এল। বললেন, তিনি বহুকাল মতঙ্গ মুনির সেবা করেছেন। বৈকুণ্ঠধাম (খেয়াল করুন—স্বর্গধাম নয় কিন্তু! অথচ বাল্মীকি শরভঙ্গের জন্য ব্রহ্মলোক নির্দিষ্ট করেছিলেন। বেশ! বৈষ্ণব-মনোভাবের নির্ভুল চিহ্ন রয়ে গেল কিন্তু, হ্যাঁ?) যাওয়ার আগে তিনি শবরীকে বলে যান—একদিন এই আশ্রমে অবশ্যই রঘুপতির আগমন ঘটবে।

শবরী যখন রামকে দেখবেন, তখনই তাঁর পাপ বিমোচন হবে। 'শবরী যখন পাবে রাম দরশন। তখনি হইবে তব পাপ বিমোচন।।'

এই বলে, রামের সামনেই নিজের চিতা নিজেই প্রস্তুত করে, শবরী তাতে আত্মাহুতি দিলেন। যাঁর স্মরণমাত্রে জীবের মুক্তি ঘটে, তাঁর সামনেই শবরী দেহত্যাগ করলেন, ফলে অনায়াসে তিনি মুক্তি পেয়ে স্বর্গে গেলেন।

লক্ষ করলেন, সামান্য পরিবর্তন এনে আবার কেমন বাল্মীকির কাহিনির ভরকেন্দ্র টলিয়ে দিলেন কৃত্তিবাস? এই কাহিনির একমাত্র বর্ণিতব্য বিষয় হল—রামের সমক্ষে আত্মত্যাগ করলে জীবের সাক্ষাৎ মুক্তি হয়। ব্যস। আর কিচ্ছুটি নয়!

আর এও নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন, এই কাহিনিতে শবরী আদৌ রামের কোনও সেবাই করলেন না! না পাদ্য-অর্ঘ, না ফলমূল—একেবারে শুকনো মুখে সাক্ষাৎ বিষ্ণুকে দাঁড় করিয়ে টুক করে তিনি নিজের কাজটুকু গুছিয়ে নিলেন—অর্থাৎ চিতায় চড়ে স্বর্গে গেলেন।

আর একটা খটকা অবিশ্যি লেগে রইল। কী সেটা, তা আমি এক্ষুনি বলব না। আপনারাই খেয়াল করুন। আরে মশাই—এত বচ্ছর ধরে আর সব বাদ দিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ থ্রিলার আর গোয়েন্দা গল্প পড়ে যে বিপুল বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন—তা এইবেলায় খাটিয়ে ফেলুন, নইলে এরপর আর কোন কর্মে লাগবে—শুনি?

আমরা সাদা-বুদ্ধির লোকেরা বরং সেই সুযোগে আর ঠিক এক পা এগিয়ে যাই।

তুলসীদাস কী বলেন এ বিষয়ে? হাজার হোক, তিনি ভক্তিরসের ব্যাপারে কৃত্তিবাসের চেয়ে চ কাঠি ওপরে!

নাঃ, এখানে কৃত্তিবাসের চাইতে কিঞ্চিৎ বেশি প্রাপ্তিযোগ ঘটল বটে, কিন্তু যা আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি—তা রামচরিতমানস বইতেও নেই।

রাম তো কবন্ধের শেষকৃত্য করে তাঁকে মুক্তিদান করে এলেন শবরীর আশ্রমে। তাঁকে দেখে শবরী আনন্দে আত্মহারা! বন্য ফলমূলে তাঁর সেবা করে সাধ্যমতো স্তুতি করলেন তিনি, অবিশ্যি তাঁর সাধ্যই বা কতটুকু! একে তিনি নীচজাতি, তায় আবার রমণী, তায় আবার গ্রাম্য!

আজ্ঞে হ্যাঁ, এই লাইনগুলো একবার আসল বচনে পড়ে-রাখা ভালো, বুঝলেন কিনা! পরে সুবিধে হবে আলোচনা করতে।

'কেহি বিধি অস্তুতি করৌ তুমহারি।
অধম জাতি মৈঁ জড়মতি ভারি।।
অধম তে অধম অধম অতি নারী।
তিনমহুঁ মৈঁ অতি মন্দ গঁওয়ারি।।'

এ অবিশ্যি ঠিক হিন্দি ভাষা নয়, খড়ি বোলি। তবে এটুকু আপনারা নিশ্চয়ই মানে বুঝে ফেলেছেন, না? উপরে এটাই আমি বাংলা ভাষায় লিখে ফেলেছি—একটু মোলায়েম করে, এই আর কি।

বাদ দিন। এবার হল কী, রাম নিজে কিন্তু শবরীর যে তিনটে মারাত্মক দোষ—নারীত্ব, নীচকুলোদ্ভব হওয়া, এবং গ্রাম্যতা—অর্থাৎ মূর্খতা—তাকে পাত্তাই দিলেন না। উলটে তিনি বলতে লাগলেন, তিনি একটিমাত্র সম্পর্কই বোঝেন—ভক্তির সম্পর্ক। এই সূত্র ধরে রাম শবরীকে নয় ধরনের ভক্তির প্রকারভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত বুঝিয়ে বললেন। তারপর বললেন, রামে ভক্তি অবিচল থাকলে, এমনকী তাঁকে দর্শন করলেও মুক্তি ঘটে। এরপর অবশ্য তিনি শবরীর কাছেই সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। শবরী তাঁকে পম্পা, সুগ্রীব—এইসব খবরাখবর দিলেন। তারপর রামপদ বক্ষে ধারণ করে, তাঁর বহু স্তুতি করে শবরী

যোগাগ্নিতে দেহ বিসর্জন দিয়ে স্বর্গে গেলেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, নীচকুলে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও। আশ্চর্য! বারবার এই কথাটা বলে চলেছি—আপনাদের দেখি কানেই ঢোকে না কিছু!

'জাতিহীন অঘজন্ম মহি, মুক্ত কীনহ অস নারি।'

এবার বিশ্বাস হল? আপনারা তো মাস্টারের কথায় পেত্যয় যাবেন না, ভাববেন বানিয়ে বানিয়ে বলছি! কোটেশন দিয়েছি। হয়েছে শান্তি? যত্তসব!

তাহলে এখানেও আমরা পেলাম না আমাদের সেই অভীষ্ট বর্ণনা—যা খুঁজতে খুঁজতে আমরা বাল্মীকি থেকে কৃত্তিবাস হয়ে তুলসীদাস অবধি চলে এলাম। কোথায় সেই অতি দীর্ঘ অপেক্ষার প্রসঙ্গ—যাকে আমরা ছেলেবেলা থেকে 'শবরীর প্রতীক্ষা' বলে জেনে এসেছি?

নেই।

আর সেই যে ছোটবেলা থেকে একটা গল্প শুনে এসেছি—শবরী রামের এমনই ভক্ত ছিলেন যে, তিনি রামকে দেওয়ার আগে প্রত্যেকটা ফল নিজে একটু খেয়ে দেখে নিয়েছিলেন, তা সুমিষ্ট কিনা। নইলে তা তো আর ঈশ্বরকে দেওয়া যায় না!

আর রাম?

তিনি ভক্তের ভগবান। ভক্তিতে বশ। বিষ্ণু নিজের বুকে তাঁর ভক্তের—ভৃগুর পদচিহ্ন এঁকে নিতে দ্বিধা করেননি! আর রাম—সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার যিনি, তিনি ভক্তের এমন ভক্তিতে প্রসন্ন হবেন না? তিনি নীচজাতিয়া রমণীর উচ্ছিষ্ট সেই ফল পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন।

ঠিক ধরেছেন, এই গল্পটাই আমরা এতক্ষণ ধরে খুঁজছি। গবেষণা শব্দের অর্থ কিন্তু সত্যিই 'গোরু-খোঁজা' নয়। কারণ, এক্ষেত্রে 'গো' শব্দের অর্থ হল পৃথিবী বা ভূমি। আজ্ঞে হ্যাঁ, গোটা দুনিয়া খুঁজে দেখাকে গবেষণা বলে; এবং অন্তত এ যাত্রায় আমাদের গবেষণা ফেল খেয়ে গেল। নিদেনপক্ষে উত্তর ভারতে রামায়ণের যে সুপ্রচলিত তিনটি ধারা, তার কোত্থাও এ জাতীয় কোনও ইঙ্গিতবাহী পঙক্তি আমরা খুঁজে বের করতে পারলাম না। বাঙালির যে খাঁটি নিজস্ব রামায়ণের গ্রাম্য ধারাটি—সেই 'চন্দ্রাবতীর রামায়ণ'-এ-ও এমন কিচ্ছুটি নেই। তাহলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, এই সেই মৌখিক উত্তরাধিকারের ধারা, যার অসীম ক্ষমতার কথা আমরা এই লেখার গোড়াতেই বলাবলি করছিলাম। এমন শত শত কাহিনি আমাদের দেশের প্রাচীন ধূলিকণায় ছড়িয়ে আছে, প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ হয়েছে, চণ্ডীমণ্ডপে সহস্র বৎসর ধরে গীত হয়েছে 'মূর্খ' কথকের সুকণ্ঠে। ত্রিকূট পাহাড়ের সীতা-চাতালে বা মধ্যভারতের ভীমবেঠকায়—সর্বত্র এমন কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে। আমরা বিশ্বাস করি, রাম তাঁর ভক্তকে এমনভাবেই ভালোবাসবেন—যাতে তাঁর উচ্ছিষ্ট আহার করতেও তাঁর সঙ্কোচ ঘটবে না। এমনকী...

এমনকী যদি সেই ভক্তের নামও আমাদের অজানা থাকে!

শবরী যে-কোনও নাম নয়, একটি জাতিবাচক শব্দমাত্র—তা আপনারাও নিশ্চয়ই এবার খেয়াল করছেন। আর তার সঙ্গেই মনে পড়ে যাচ্ছে—কৌশল্যা, কৈকেয়ী, দ্রৌপদী—এর একটিও নাম নয়! কোশলদেশের কন্যা, কেকয়দেশের কন্যা, দ্রুপদের কন্যা—এর সবকটিই নারীর স্থানবাচক পরিচয় বা পিতৃপরিচয় দান করে। এমনকী রাম প্রায় আগাগোড়া রামায়ণে সীতাকে যে জানকী বলেই সম্বোধন করেন, এবার তাও আমাদের মাথায় আসতে বাধ্য!

রামের মহাভক্ত শবরীরও আমরা নাম জানি না!

এবার সেই ধাঁধাটার সমাধানও হয়ে যাক! সেই যে, কৃত্তিবাস যে খটকাটা রেখে গিয়েছিলেন! তখন বলিনি, এবার নিশ্চয়ই আপনারাই সমাধান করে ফেলেছেন তার।

তবু বলি!

'তখনই হইবে তব পাপ বিমোচন'—শবরী সম্পর্কে এই ছোট্ট ইঙ্গিতের কারণ কী? কোন পাপের কথা বলছিলেন কৃত্তিবাস? শবরীর কোনও গোপন পাপের কথা বুঝি?

না! আদৌ নয়! এখন, এই শেষবেলায় এসে আমাদের আর বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না—এই অমোঘ পাপ হল তাঁর নীচকুলে জন্ম নেওয়া। তিনি শুধু শবরী। শবরজাতীয় এক কন্যা। যত সাধনাই তিনি করে থাকুন, যত সেবাই করে থাকুন আজীবন তাঁর গুরু মতঙ্গ এবং অপরাপর তপস্বীদের—তাঁর ওই অনাদ্যন্ত জন্মগত পাপের কোনও ক্ষমা হয় না। তিনি এক নীচজাতির রমণী, যে পাপ মোচন করতে তাঁকে সারাজীবন অপেক্ষা করতে হয় স্বয়ং ঈশ্বরের জন্য। রামের জন্য।

আর তাই, মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি নয়, উপাধ্যায় পদবীধারী কৃত্তিবাস নয় (ওঝা শব্দটি এখান থেকেই এসেছে), মহাভক্ত তুলসীদাসও নয়—তাঁর সেই দুস্তর লজ্জা ঢেকে দেয় এই প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষেরা। নিজেরাই তাঁরা সৃষ্টি করেন এক নূতন কাহিনি—যে গল্পে স্বয়ং রাম এগিয়ে আসেন এক শবর বৃদ্ধার আজন্মের লজ্জা মোচন করতে।

তাঁর উচ্ছিষ্ট ফলটিকে এই দেশ যেন তুলে দেয় শবরীর লজ্জানত, কিন্তু উদ্ভাসিত মুখে! জন্ম যাঁকে অনন্ত লজ্জা দান করেছিল, মৌখিক উত্তরাধিকারের ধারা তাঁকেই শ্রেষ্ঠ ভক্তের আসনে বসিয়ে দেয়। প্রণাম করে।

এবার আর শবরীর কোনও পাপ অবশিষ্ট থাকে না!

ভরদ্বাজের আমন্ত্রণে...

'এ দিকে হয়েছে কী, ভরত তো খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন অযোধ্যায়! তা কোথায় সেই কেকয়ের মামাবাড়ি, আর কোথায় অযোধ্যা। আসতেই লেগে গেল সাতদিন। পৌঁছতেই তো ভরতের মাথায় একেবারে আকাশ ভেঙে পড়ল! কী সব্বনাশ! বাবা মারা গেছেন! দাদা আর ভাই, বৌদিকে নিয়ে চলে গেছেন বনবাসে! আর এই সবকিছুর পেছনে কে? না—তাঁরই মা—কৈকেয়ী! তাকে এই বুদ্ধি দিল কে? কুঁজি মন্থরা! আর যায় কোথা! মাকে খুব করে অপমান করে, মন্থরাকে শাস্তি দিয়ে ভরত বেরিয়ে পড়লেন রামকে ফিরিয়ে আনতে। ভরদ্বাজ মুনির কাছ থেকে সন্ধান পেয়ে সে-এ-ই চিত্রকূট পাহাড়ে গিয়ে, বন-জঙ্গল ভেঙে তিনি খুঁজে বের করলেন দাদাকে। কেঁদে বললেন, 'দাদা গো—অনেক কষ্ট পেলে বনে। এইবার বাড়ি চলো!'

আমাদের পুরোনো বাড়ির থেকে দু-মিনিটের পথ। বাজারের এক পাশে সাবেকি নাটমন্দির। তার এক পাশে দুর্গামণ্ডপ, যেটা পুজোর সময় ছাড়া খালি পড়ে থাকে। আর অন্য পাশে কৃষ্ণের মন্দির। এটায় রোজ কথকতা হয়। ঠাকুমা শুনতে যায়। আমি যাই সঙ্গে। সেইখানেই কথকঠাকুর ঠিক এমনি বৈঠকী ভঙ্গীতে বলে চলেছেন রামায়ণী-কথা। যুগ থেকে যুগান্তরে, দেশ থেকে দেশে ছড়িয়ে পড়ছে পুণ্য রামকথা।

সাধে কী আর অধ্যাপকী গদ্য দেখলে তাদের ঘেঁটি ধরে নাটমন্দিরে, 'অশিক্ষিত' ডক্টরেট-হীন কথকের সামনে বসিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে? সারল্য শিখতে হয়। জানতে হয়—যখন বিষয় জটিল, তখন প্রকাশভঙ্গির সারল্যই প্রমাণ করে আপনি নিজে বিষয়টাকে সরলভাবে বুঝেছেন। ভাষার জটিলতার আড়ালে নিজের অজ্ঞানতা লুকোচ্ছেন না।

যাক গে, দুঃখে ফল নাই। বাদ দিন।

বড় হয়ে অবিশ্যি জেনে গেছি, যতই সুন্দর করে বলা হোক, কথকঠাকুর একটা মারাত্মক দৃশ্য ফসকে গেছেন। বনবাসে যাওয়ার পথে রাম প্রয়াগে পৌঁছে দেখা করেছিলেন ঋষি ভরদ্বাজের সঙ্গে। তিনিই তাঁকে চিত্রকূটের হদিশ দিয়ে বলেন—সে ভারি সুন্দর জায়গা, রাম যেন লক্ষ্মণ আর সীতাকে নিয়ে সেখানেই কুটির বেঁধে বাস করেন। রামেরও সেখানে পৌঁছে জায়গাটি ভারি পছন্দ হলো। তাঁর কথায় লক্ষ্মণ সেখানেই খাসা একটি কুটির বাঁধলেন। একটা কৃষ্ণসার হরিণ ঝলসে নিয়ে, তারই মাংস দিয়ে গৃহপ্রবেশ করার জন্য পুজো দিলেন রাম স্বয়ং। বনবাসে রাম ফলমূল খেয়ে থাকতেন—আমরা সবাই জানি। তাহলে হরিণের মাংস রোস্ট করে খেল কে—আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। আমায় প্রসাদ দেয়নি। খুশি? হুঁঃ...

এদিকে সসৈন্য সপরিবার ভরত তো রামকে খুঁজতে খুঁজতে এলেন ভরদ্বাজের আশ্রমে। আসলে এই পর্যন্ত রামের হদিশ ছিল গুহের কাছেই—রামের বন্ধু সেই নিষাদরাজ—যাঁর ব্যবস্থাপনায় গঙ্গা পার হয়েছিলেন রাম। কিন্তু এখান থেকে রামেরা কোনদিকে গেছেন, তার সন্ধান জানেন শুধু ভরদ্বাজই। কাজেই সেনাবাহিনী এবং পরিবারকে দূরে রেখে ভরত একা, পদব্রজে গেলেন মুনির কাছে। লোকলশকর হাতিঘোড়া নিয়ে উপস্থিত হয়ে আশ্রমের শান্তিভঙ্গ করার ইচ্ছে তাঁর মোটেই ছিল না।

ভরদ্বাজ, সত্যি বলতে কি, ভরতকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তখনও। বেজায় অপমানজনক ভঙ্গীতে পইপই করে তিনি জিগ্যেস করে নিলেন, ভরত রামকে ক্ষতি করার জন্যই খুঁজে বেড়াচ্ছেন না তো? বশিষ্ঠ এবং অন্য মুনিরা সঙ্গে এসেছিলেন; তাঁদের কাছ থেকে সব সুলুকসন্ধান নিয়ে যখন তাঁর শান্তি হল, তখন তিনি পরের খোঁজে গেলেন। হাজার হোক, ভরত এখন উত্তর কোশলের রাজা (আজ্ঞে ভুললে চলবে না, 'অযোধ্যার রাজা' বলে কিছু হয় না। অযোধ্যা হল উত্তর কোশলের রাজধানী।) সে এমন একাবোকা পায়ে-হেঁটে মুনির আশ্রমে এসেছে কেন? তার সৈন্যসামন্ত লোকলশকর কোথা?

ভরত বললেন, মুনি-ঋষিদের আশ্রমে আসার সময় সৈন্য নিয়ে আসাটা ঠিক নয় বলেই তাঁর মনে হয়েছে। তাই তাদের তিনি ক্রোশ-খানেক দূরে রেখে এসেছেন।

শুনে ভরদ্বাজ তাদের সব্বাইকে নেমন্তন্ন করে বসলেন। ভরত স্বভাবতই ভাবলেন, এ শুধু কথার কথা। অত্ত সৈন্যসামন্তদের ভরদ্বাজ খাওয়াবেন কেমন করে? যতই মহর্ষি হোন, তিনি তপোবন-নিবাসী মুনি তো বটে! তা ভরদ্বাজ আর কিছু না বলে তাঁকে বললেন সৈন্যদের নিয়ে আসতে।

এইবার, আসুন, এক মধুর বিস্ময়ের মুখোমুখি হওয়া যাক!

ভরদ্বাজ বস্তুতই রামের পক্ষপাতী ছিলেন, আর সে কথা তিনি মোটেই লুকোননি। কিন্তু যখন ভরতের উপর থেকে তাঁর অকারণ সন্দেহের নিবৃত্তি ঘটল, তখন তিনি তাঁর সমস্ত তপোবলকে কাজে লাগালেন ভরতের সেনাবাহিনীকে আতিথ্যদান করার কাজে। সর্বাগ্রে তিনি আহ্বান করলেন বিশ্বকর্মা এবং ইন্দ্র, বরুণ ও কুবের—তিন লোকপালকে। নদীদের ডাকা হল। তারা মৈরেয় মদ্য, উত্তম সুরা ও অন্যান্য পানীয়ের আয়োজনের দায়িত্ব পেল। নৃত্যগীতের মাধ্যমে অতিথিদের মনোরঞ্জন করার জন্য ডেকে নেওয়া হল বিশ্বাবসু, হাহা, হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব; ঘৃতাচী, নাগদত্তা প্রমুখ অপ্সরাদের। ভগবান সোমদেব প্রচুর পরিমাণে চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সৃষ্টি করলেন, যা সৈন্যদের ক্ষুধা দূর করবে। পুষ্করিণী ভরে উঠল পায়েসে, গাছে সকল ঋতুর ফল ধরল একইসঙ্গে।

ভরতের সৈন্যরা এসে দেখল, চ যোজন ব্যাপ্ত এক বিশাল ভূমিকে সমতল করে এক দিব্য পুরী গড়ে তোলা হয়েছে, তাতে কীসের ব্যবস্থা নেই! খাদ্যপানীয় পরিবেশন করা হল উদার হস্তে, গন্ধর্ব ও অপ্সরারা নাচগান করতে লাগলেন। এক-একজন সৈন্যকে সাত-আটজন সুন্দরী বারাঙ্গনা নদীতে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে সুরাপান করাতে লাগল। দীঘিগুলো মদ্যে পূর্ণ হয়ে উঠল; গরম গরম মৃগমাংস, ময়ূরের এবং মুরগির মাংস যদৃচ্ছা খেতে লাগল সবাই—*'বাপ্যো মৈরেয়পূর্ণাশ্চ মৃষ্টমাংসচয়ৈবৃতাঃ। প্রতপ্তপৈঠরৈশ্চাপি মার্গমায়ূরকৌক্কুটৈঃ।।'* মৈরেয় হল মৌরি থেকে প্রস্তুত এক প্রকার মদ্য। যাই হোক, এইরকম স্বর্গীয় নিমন্ত্রণে সর্বপ্রকারে তুষ্ট হয়ে সৈনিকেরা যা বলাবলি করতে লাগল, তা বোধকরি কখনও পুরোনো হবে না—'এই জায়গা ছেড়ে আমরা

আর কোথাও নড়ছি নে বাপু! আমরা অযোধ্যাতেও যাচ্ছি নে, দণ্ডকারণ্যেও যাব না; ভরত ভালো থাকুন, রামও সুখী হোন।' এই অসম্ভব সুন্দর শ্লোকটা উদ্ধার করার লোভ সম্বরণ করা অসম্ভব :

নৈবাযোধ্যাং গমিষ্যামো ন গমিষ্যাম দণ্ডকান্
কুশলং ভরতস্যাস্তু রামস্যাস্তু তথা সুখম্।

হ্যাঁ মশাই, একে বলে ভোজ, একেই বলে নিমন্ত্রণ—অ্যাঁ? কী বলেন? আজকের আচ্ছা আচ্ছা বড়লোকেরও সাধ্যি নেই এমন আয়োজন করে; আর তার চেয়েও বড় কথা—যদি করেও, তাহলে সাধারণ সৈনিক, সাধারণ মানুষ তাতে প্রবেশাধিকার পাবে না। ধনী আমন্ত্রণ জানাবে ধনীকেই—যার নিজের জন্যও এই আয়োজন করার ক্ষমতা আছে। তাহলে আর বিশেষ কী হল, বলুন দেখি?

আমার কেন যেন এই বর্ণনাটা পড়লে প্রত্যেকবার মনে হয়, ভরতকে উপলক্ষ করে ভরদ্বাজ মুনি আসলে বোধহয় ওই দরিদ্র, বুভুক্ষু অথচ পরিশ্রমী মানুষদের একদিনের জন্য স্বর্গসুখ দিতে চেয়েছিলেন। অথবা, আমাদের আদিকবিটি সারাক্ষণ রাজারাজড়ার গল্প বলতে বলতে, এই একটিবারের জন্য নিতান্ত সাধারণ মানুষের মন রাখতে চেয়েছিলেন, যারা এই বিলাসিতা দূর থেকে দেখতে পায়—কিন্তু যাতে তাদের অধিকার নেই।

বড্ড বেশি ভেবে ফেলছি নাকি? কে জানে বাপু, হয়তো আমরা নিতান্ত সাধারণ এলেবেলে মানুষ বলেই এভাবে ভাবতে ভালোবাসি! অন্তত একদিনের জন্যও ওই স্বর্গ করায়ত্তগত হোক, এমন একটা বাসনা তো থেকেই যায় আমাদের নৈমিত্তিক গতানুগতিক জীবনে! একবার! একদিনের জন্য হাতে আসুক সেই কামনার মোক্ষধাম অলকাপুরী—যেখানে আমাদের সকল দুরাকাঙ্ক্ষা পূর্ণতালাভ করবে! সকল স্বপ্ন সত্য হবে! যা কিছু আজীবন চেয়ে এসেছি, আর যা কক্ষনো পাইনি—সেই সবকিছু—স অ অ ব—একটিবারের জন্য হঠাৎ পেয়ে যাই!

আচ্ছা, থাক সেই স্বপ্নপূরণের গল্পকথা। মাস্টার মানুষ! লুচি খাওয়ার পয়সা নেই, মৈরেয় মদ্য আর মৃগমাংসের স্বপ্ন দেখছে! ভাগো!

ফিরে আসি বরং আমাদের মূল বিষয়ে।

বাল্মীকি না-হয় ক্ষণিকের স্বর্গ গড়ে তুললেন ভরতের সঙ্গে রামকে খুঁজতে-আসা সৈন্যদের জন্য। কিন্তু তাঁর অনুবাদকেরা? কৃত্তিবাস বা তুলসীদাস? তাঁদের কাব্যেও কি রয়ে গেল এমন সোচ্চার উৎসবের আমিষ, সুরাগন্ধী উৎসারের বর্ণনা?

দেখে নিই বরং একবার। ভারি তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে কিন্তু এই দেখে নেওয়াটা। কারণ, এই সমস্ত টুকরো-টাকরা ছবির মধ্যেই লুকিয়ে থেকে যায় সমাজবীক্ষা। থেকে যায় সমাজের আর সময়ের পাওয়া-না-পাওয়া, চাওয়া-না-চাওয়ার গল্প।

শ্রীরামচালীতে কৃত্তিবাস এই দৃশ্যটিতে প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করে গেছেন বাল্মীকির। এখানেও ভরদ্বাজের সেই নিদারুণ সন্দেহ, এবং ভরতের অকপট ব্যবহারে সেই সন্দেহের ভঞ্জন। এখানেও ভরদ্বাজের নিমন্ত্রণ, এবং ভরতের দ্বিধা। এবং অবশেষে ভরদ্বাজের সকল দেবতাদের, গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের আহ্বান জানানো। হ্যাঁ, কিঞ্চিৎ ফেরফার থাকবে বইকি! তিন লোকপাল দেখা দেবেন দশ দিকপাল হিসেবে—এটুকু তো স্বাভাবিক।

কিন্তু আসল পার্থক্যটি অতিশয় সূক্ষ্ম, এবং সেই কারণেই সহসা তা আমাদের চোখে পড়ে না।

বাল্মীকির 'সুরা' কৃত্তিবাসের হাতে পড়ে 'সুধা'-য় পরিণত হয়েছে।

'আইলেন সুধাকর সুধার নিধান।

পরম কৌতুকে সবে করে সুধাপান।।'

প্রাচীনকালে আমাদের পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস ছিল, চাঁদের প্রভাবেই সোমের লতায় মাধ্বীগুণ জন্মায়। তিথি-বিশেষে তাই ঋষিরা সংগ্রহ করতেন সোমলতা; বিশেষ তিথিতে, বিশিষ্ট রীতিতে তা পিষ্ট করে নিষ্কাশন করা হত সোমরস—যা দেবতাদেরও প্রিয়! সোম শব্দের আর এক অর্থ যে চাঁদ, তাও নিশ্চয়ই আপনারা ভোলেননি! এই মাধ্বীগুণের জন্যই তো বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা সোমরসের উদ্বাহু বন্দনা গেয়েছেন :

'যো অস্মৈ ঘ্রংস উত বা য ঊধনি সোমং সুনোতি ভবতি দ্যুমাঁ অহ।'

সোজা কথায়, যে যজমান দিনরাত ইন্দ্রকে সোমরস পান করান, তিনি দীপ্তিশালী হয়ে ওঠেন। এমনই সোমের প্রভাব!

এরই স্বাভাবিক পরিণতিতে পরবর্তীতে এসেছে নানাবিধ মদ্য—মৈরেয়-সুরা-মাধ্বী ইত্যাদি! দেখাই যাচ্ছে, ভরদ্বাজ মুনিও সৈনিকদের তার আস্বাদ থেকে বঞ্চিত রাখেননি!

কিন্তু কৃত্তিবাস তাকেই পরিণত করলেন সুধায়। সুধা শব্দের অন্য অর্থ—অমৃত; কাজেই ব্যাপারটার প্রত্যক্ষ মত্ততা ইচ্ছাকৃতভাবেই এড়িয়ে গেলেন তিনি। সে যে ভারি ইয়ে ব্যাপার! তার স্থান নিল ইক্ষুরস নদী, মধুরস নদী, দধি-দুগ্ধ-ঘৃত...

এ তো গেল পানীয়ের কথা। আর খাওয়া-দাওয়া? তার কী দশা হল অনুবাদে?

আহা, বাঙালির আহার-সংক্রান্ত স্বপ্ন শুরু আর শেষ হয় যার মধ্যে—তার উল্লেখ থাকবে না? না, না, তা কক্ষনো হতে পারে না। কাজেই :

'নির্মল কোমল অন্ন যেন যুথীফুল।
খাইল ব্যঞ্জন কত নাম হৈল ভুল।।'

যুঁইফুলের মতো ধবধবে সাদা ভাতই যদি পরিবেশিত না-হল, তাহলে স্বর্ণথালে আহার করলাম, না দেবকন্যারা পরিবেশন করল—তাতে কী এসে-যায় বলুন দেখি! আর তার সঙ্গে নানাবিধ ব্যঞ্জন—মানে তরিতরকারি আর কি! তারপরেই অবিশ্যি আবার ফিরে আসে সেই 'ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু মধুর পায়েস' ইত্যাদির উল্লেখ। স্বাভাবিক। এবার খাদ্যতালিকা বানাচ্ছেন এক মধ্যযুগীয় বাঙালি কবি!

এর পরে অবশ্য যথেষ্ট সাহসী হয়ে উঠে কৃত্তিবাস সরাসরি পৌঁছে যান সৈনিকদের শয্যাদৃশ্যে—তারা আকণ্ঠ আহার করে বহু কষ্টে আচমন করে 'খাটে গিয়া প্রিয়া লয়ে করিল শয়ন।' দেবীরা এসে তাদের অঙ্গ সংবাহন করতে লাগলেন। চারিদিকে মলয় বাতাস বইতে লাগল, কোকিল ডাকতে লাগল, অপ্সরাদের নৃত্যগীত চলতে লাগল। এক অপূর্ব বসন্ত রাত কাটাল সৈনিকেরা সেই সব অপার্থিব রমণীদের সঙ্গে। প্রায় বাল্মীকির প্রতিধ্বনি করে তারা বলতে লাগল 'যে যায় সে যাক আমি না যাইব ঘরে।' এক পরমপ্রাপ্তির সুখে যেন এই পঙক্তিটি ভরে আছে; যদিও বাল্মীকির শ্লোকটিতে যে স্খলিত মত্ততা আছে, তা এখানে মিলবে না। খুব মেঠো ভাষায় বলতে গেলে—উটি মাতালের গদগদ উন্মত্তপ্রায় উচ্ছভাষ, ইটি তৃপ্ত পুরুষের স্বগতভাষণ। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য একেবারে মূলগত।

বেশ বেশ। এবার আর এক পা এগোই? তুলসীদাস।

গোড়াতেই কিন্তু তুলসীদাস আলাদা হয়ে গেলেন, কারণ এক্ষেত্রে ভরদ্বাজের ভরতের প্রতি সন্দেহ বা অবিশ্বাসের কোনও প্রশ্নই উঠল না! ভরদ্বাজ যে অন্তর্যামী! অন্তর্যামীদের নিয়ে মুশকিল এই—তাঁদের কোনও অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকে না—যা আধুনিক সাহিত্যের মূল অবলম্বন! আগে থেকেই সব জেনে-টেনে বসে-থাকা

ব্যাপারটা একটু একঘেয়েও না? জীবনের মজাই তো তার অপ্রত্যাশিত বিস্ময়গুলো। নইলে এই ছাইশ মনুষ্যজীবনে আর আছেটা কী—বলুন দেখি!

যাক, এ সব গোলমেলে কথা ছেড়ে আসল কথায় আসি। অন্তর্যামী হওয়ায় ভরদ্বাজ আর ভরতের অস্বস্তি বাড়ালেন না, অর্থাৎ গোলমেলে কোনও প্রশ্ন করার দরকারই পড়ল না। রীতিমাফিক কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা এবং উপদেশ দানের পরেই তিনি সোজাসুজি নিমন্ত্রণ করলেন সসৈন্য ভরতকে, এবং বলেই দিলেন—'কন্দ মূল ফল ফূল হম, দেহিঁ লেহু করি ছোহু।' ফল-ফুল-কন্দ-মূল যা আছে, অর্পণ করছি, ভরত। তুমি গ্রহণ করো।

আমরা অবশ্য ভাবতেই পারি, সে তো বাল্মীকির রামও বনবাসে যাওয়ার আগে পইপই করে বলে গিয়েছিলেন—তিনি ওই ফলমূল খেয়েই থাকবেন। ও হরি! প্রথম দিনেই চারখানা পশু শিকার করে শূল্যপক্ক মাংস! এই নাকি ফলমূল আহার করে সাত্ত্বিক জীবনের নমুনা! তিনটে মানুষ, চারটে শিকার!!

কাজেই, হতেই পারে—ভরদ্বাজের ওই ফলমূলকন্দের কথাটাও নেহাত কথার কথা; ছোটকাকু যেমন 'দুপুরে আমার লগে বইয়া একটু ডাইল-ভাত খাইয়ো, বাবা!'—বলে নেমন্তন্ন করে তিনরকম মাছ খাওয়াত!

কার্যক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা ঘটল না। ভরদ্বাজ ভরতের জন্য সত্যিই আয়োজন করলেন ফল-মূল-কন্দেরই; এবং তুলসীদাস সে কথা আরও একবার মনে করিয়ে দিতে ভুললেন না—'চাহিয়া কীহ্নি ভরত পহুনাঈ। কন্দ মূল ফল আনহি জাঈ।।' অতিথি হিসেবে ভরতের যত্ন নেওয়ার জন্য ভরদ্বাজের শিষ্যরা ফল-পাকুড় নিয়ে এল।

তা নয় হল। ভরত তখন রামের শোকে উদ্‌ভ্রান্ত, তিনি নাহয় ফলমূলই খেলেন। বাল্মীকিও আলাদা করে ভরতের খাওয়া-দাওয়ার বর্ণনা দেননি। দিয়েছেন তাঁর সৈন্যদের। এবার দেখি তো—তারা কী খেল?

তুলসীদাস কিন্তু এবার কৃত্তিবাসের পথরেখাও পরিত্যাগ করলেন। ভরদ্বাজ এবার স্বর্গের সমান আড়ম্বরপূর্ণ প্রকাণ্ড প্রাসাদ গড়ে তুললেন তপোবলে, সেখানে ভোগৈশ্বর্য ইত্যাদির কোনও অভাব রইল না। যে সকল বসন দেওয়া হল, তাও অপার্থিব। পলকপাতে নির্মিত হল বিতান, বাটিকা, পশুপাখি, আসন, সুখশয্যা, সুনির্মল জলাশয়—কী নয়! বসন্তের মলয় বাতাস বইতে লাগল ঋষির পুণ্যপ্রভাবে।

কিন্তু ইয়ে...মানে আহারাদি?

হ্যাঁ, তারও আয়োজন হল বইকি! আতিথ্যে ত্রুটি রাখলেন না মুনি। 'অসন পান সুচি অমিয় আমী সে। দেখি লোগ সকুচাত জমী সে।।' আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। শুচি। এমন সব শুচিশুদ্ধ আহার্য এবং পানীয় পরিবেশন করা হল যে, সংযমী মানুষও সংকুচিত হয়ে পড়বে; সোজা কথায়—সংযম রক্ষা করাই দায়!

শুচি আহার! কোথায় মদ্যপান করে, আকণ্ঠ আহার করে স্খলিতচরণ স্খলিতরসনা সেই সব সুখী সৈনিক; আর কোথায় পবিত্র আহারাদি সম্পন্ন করে গম্ভীরমুখে রামের খোঁজে যাওয়া সৈন্যদল! তায় আবার সাধক তুলসীদাস আমাদের মনে করিয়ে দিতে ভুললেন না—এই অনন্ত ভোগৈশ্বর্যের মধ্যে বসেও ভরত ভাবতে লাগলেন, তপস্যার কী মহিমা! এর কাছে লোকপাল দেবতাদের প্রতাপও তুচ্ছ। আর এই সকল ভোগসুখ যে মায়াবন্ধন-মাত্র—তাও তিনি ভুললেন না। যথারীতি, তুলসীদাস একটি অনবদ্য উপমায় তা বুঝিয়ে দিলেন—ভরত চখাচখীর মতো ভোগসুখের খাঁচায় মুনির আদেশে বন্দি হয়ে থাকলেন বটে, কিন্তু কিচ্ছুটি ভোগ করলেন না। পরদিন সকালে মোহের পিঞ্জর থেকে তাঁর মুক্তি হল।

রামায়ণ বলে, বাল্মীকি নিজেও মহামুনি ছিলেন। মুনিপুঙ্গব। রামায়ণের মূল কাহিনিটুকু আবার তাঁকে শুনিয়েছিলেন স্বয়ং দেবর্ষি নারদ। দেখা যাচ্ছে, মহর্ষি বাল্মীকি যে ভোগের বর্ণনায় মুক্তকণ্ঠ, সোচ্চার উচ্ছ্বসিত শব্দে উজাড় করে দিচ্ছেন সৈনিকদের মর্ত্যব্যাকুল বাসনা; সেখানেই সসংকোচ আড়ষ্ট পায়ে সাবধানে হেঁটে যাচ্ছেন তাঁর উত্তরসাধকেরা। বোধহয় মহর্ষি নন বলেই! বোধহয় যুগ বদলাচ্ছে বলেই! বোধহয় সময় সবকিছু আর সবাইকে পালটে দেয় বলেই!

ভোগের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে পরদিন সকালে রামের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন তুলসীদাসের ভরত। সঙ্গী ছিলেন গুহ। নিষাদরাজ।

আমরা কোন পথে এগোচ্ছি—কে জানে?

ছায়াসীতা

আমাদের চারপাশে অবাক হওয়ার মতো, শ্রদ্ধায় অবনত হওয়ার মতো উপকরণ ছড়িয়ে আছে অজস্র, অগুন্তি। মুশকিল হল, আমরা এত সাঙ্ঘাতিকভাবে আত্মমগ্ন হয়ে থাকি যে, তা লক্ষ্য করাই আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, আমাদের সব্বার হাতে একখানা করে অদৃশ্য আয়না আছে, আর মুগ্ধ চক্ষে তাতে আপন রূপমাধুরী দর্শন করে আমাদের প্রত্যেকের একেবারে তাক লেগে গেছে!

কিন্তু কোনওক্রমে একবার যদি নজর ঘুরিয়ে একটু অন্যের দিকে তাকানো যায়, তাহলে দেখবেন— দুনিয়ায় সত্যি সত্যিই তাক-লাগানো মানুষ আর বিষয়ের কোনও অভাব নেই। পৃথিবী এক আশ্চর্য বিচিত্র স্থান। মানুষ এক বিচিত্রতর সৃষ্টি।

তা এমনই একজনের কথা দু'লাইনে বললে আপনারা নির্ঘাত চটে যাবেন না।

ইনি আমার এক বান্ধবীর মা। আমার বান্ধবীটি বয়সে আমার চেয়ে খানিক ছোট, অর্থাৎ তার মা নিজেও বয়স্ক মানুষ। তার উপর তাঁকে ধরেছে এক কালরোগে, যার হাত থেকে আর রেহাই নেই। তায় আবার একটি চোখ প্রায় জবাব দিয়েছে। সব মিলিয়ে, অবস্থা বিশেষ সুখকর বলা যায় না। কিন্তু এক অদম্য প্রাণশক্তি নিয়ে তিনি লড়ে যাচ্ছেন মারণব্যাধির সঙ্গে, দৃষ্টিক্ষীণতার সঙ্গে। এখনও তাঁর সারাক্ষণের সঙ্গী নাতি আর বই।

তা এই অধমেরই লেখা একটি বই তখন খণ্ডে খণ্ডে বেরচ্ছিল। দ্বিতীয় খণ্ড নিয়মমাফিক বেরোনোর পর নানান কারণে শেষ খণ্ড বের হতে বেজায় দেরি হয়ে গেল। তায় আবার বোঝার উপর শাকের আঁটি হয়ে নেমে এল বিশ্বজোড়া মহামারী। অখণ্ড সংস্করণ বেরল নির্ধারিত সময়ের প্রায় ছ'মাস পরে।

তার সপ্তাহ দুয়েক পর ফোন করে তিনি আমাকে হাসি-ভরা গলায় বললেন,'এই ক'দিনে তিন-চারবার পড়ে ফেললুম। আহা! বড় ভালো লিখেছ! আমি না তোমায় বলেছিলুম বাবা, এই বই শেষ না-করে আমি

মরছি না!'

নিজেরও তো বয়েস হয়েছে মশাই! আজকাল চট করে চোখে জল এসে যায়, বুঝলেন। দিন দিন ন্যাকা হয়ে যাচ্ছি আর কি।

তিনি অবিশ্যি আমার নীরবতাকে পাত্তা যা-দিয়ে দিব্যি বলতে লাগলেন, 'কী যে ভালো লাগল! তবে অনেক প্রশ্নও এসেছে মাথায়। তা সে সব তোমায় পরে জিগ্যেস করব 'খন; এখন তো বোধহয় তুমি 'বাল্মীকি-রামায়ণ' নিয়ে কী একটা মস্ত কাজ করছ শুনলাম।'

আমি সবে দস্তুর অনুযায়ী 'হেঁ হেঁ, কী যে বলেন মাসিমা...' ইত্যাদি বলছি, তিনি বললেন,'আচ্ছা রাজা, ছেলেবেলায় শুনেছিলাম, রাবণের নাকি সাধ্যিই ছিল না সীতাকে স্পর্শ করে! সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর রূপ কিনা! তারপর সেই কী-একটা নকল সীতা...মানে ছোটবেলায় শোনা গল্প, ভুলও হতে পারে...'

মাসিমা ঈষৎ সন্দিগ্ধ গলায় এইসব শুধোচ্ছেন যখন, আমি তখন বসে আছি বইয়ে-ঘেরা আমার লেখার জায়গাটিতে, সামনের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরের নাগরিক আকাশরেখা। আর এবার সেসব ধীরে ধীরে মুছে দিয়ে আমার চোখে ফুটে উঠল এক দিগন্তবিস্তৃত চাষের মাঠ। তার এক পাশ দিয়ে চলে গেছে একটা অগভীর খাল, যাতে আর স্রোত প্রায় নেই বললেই চলে, অজস্র শাপলা আর শালুক ফুটে আছে। তারই পাশে আমাদের গ্রামের শ্মশান। এইসব জায়গাতেই কিশোরদের সিগারেট খাওয়ার হাতে-খড়ি হয়—কে না জানে! আমরাও একই উদ্দেশ্যে এখানে আসতাম। ধানক্ষেত ছুঁয়ে-আসা জোরালো হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যেত সিগারেটের ধোঁয়া, শক্তি চাটুজ্জের কবিতা। ছোট্ট একটা নড়বড়ে চায়ের দোকান সরগরম হয়ে উঠত আমাদের আড্ডায়।

আর একদিন সেইখানেই দেখেছিলাম সেই নাম না-জানা মানুষটাকে। টিংটিঙে রোগা, প্রতিটি হাড় গোনা যায়। পরনে একটা ময়লা ধুতি, খালি গা, সরু পৈতে বুকের উপর দুলছে। এক হাতে চায়ের গেলাস, অন্য হাতে গাঁজার কল্কে। চোখ দুটো টকটকে লাল।

বসে যাওয়া গলায় সে বলে চলেছে, 'অত বড় লাউ-খান মাচা থিক্যা ঝোলে সরু একখান লতায় ভর কইরা। কই, পড়ে না তো ছিঁড়্যা! পড়বে ক্যান? মা যে! গাছখান হইল মা, ফল তার সন্তান! শোনছ কখনও, মায়ের কোল থিক্যা পোলামাইয়া পইড়্যা গ্যাসে?'

সেই অজানা শ্মশান-পুরোহিতই বলে চলেছে, 'রাবণের সাইধ্য আছিল সীতারে ছোঁয়? অত সোজা? যেইডারে রাবণ তুইল্যা লইয়া গ্যালো—হেইডা সীতাই না! ছায়া, বোঝলা, ছায়া! আসল সীতারে তো তার আগেই দ্যাবতারা মিইল্যা সরাইয়া রাখসে!'

কী আশ্চর্য! এ যে আমার শোনা গল্প! কিন্তু এটুকু তো নিশ্চিত, এই ছায়াসীতার গল্প বাল্মীকি-রামায়ণে নেই! তাহলে বারবার এই কথাটা আসছে কেন? কখনও শিক্ষিত মানুষের সুসভ্য ড্রইংরুম থেকে, কখনও শ্মশানবাসী তথাকথিত 'অশিক্ষিত' পুরোহিতের মুখ থেকে?

তেমন সমস্যা অবিশ্যি হল না এর উৎস খুঁজে বের করতে। তুলসীদাস। আজ্ঞে না, কৃত্তিবাস এর উল্লেখ করেননি বলেই বাঙালির রামায়ণ-চর্চায় ততটা প্রভাব ফেলেনি এই কাহিনি; কিন্তু তুলসীদাস উল্লেখ করেছেন বটে ছায়াসীতার। সেটা কেমন ভাবে—তা একবার দেখে নিই আগে, কারণ নির্ভুল ভঙ্গীতে তা চিনিয়ে দেয় কবির মানস-জগতকে।

শূর্পণখার কাছ থেকে রাম-লক্ষ্মণের বৃত্তান্ত, এবং সীতার অলৌকিক রূপের কথা শুনে রাবণ স্থির করলেন, এই কর্মে তাঁকে সহায়তা করবেন মারীচ। এঁর ছদ্মবেশ ধারণ করার অসামান্য ক্ষমতার উপর রাবণের অসীম আস্থা। মারীচ তখন রামের হাতে দস্তুরমতো শায়েস্তা হয়ে সাগরপাড়ে আশ্রম করে রয়েছেন। রাবণ কুবেরের কাছ থেকে কেড়ে-আনা পুষ্পকরথে চড়ে চললেন তাঁর আশ্রমে।

এদিকে অন্তর্যামী রাম সেই সব কিছুই জানতে পারলেন। বুঝলেন, রাবণের প্রকৃত অভিসন্ধি হল সীতাহরণ। তখন তিনি লক্ষ্মণকে পাঠালেন বনে, ফল-মূল-কন্দের খোঁজে। এই ফাঁকে বলে রাখি,

তুলসীদাসের রাম কিন্তু পাক্কা নিরামিষাশী, ওই ফল-মূল-কন্দ ছাড়া আহার নেই। মৃগয়া করতে যেতেন বটে, কিন্তু সে কেমন মৃগয়া কে জানে! হরিণেরাও সেই দৃশ্য দেখে মোহিত হয়ে যেত, শিকারি দেখে ভয়ে ছুটে পালাত না! আর বাল্মীকির রাম যে আস্ত হরিণের শূল্যপক্ক মাংস খেতে কী ভালোই বাসতেন! চিত্রকূটের কুটিরে গৃহপ্রবেশ করার আগে লক্ষ্মণ সেই যে কৃষ্ণমৃগটাকে আগুনে ফেলে বেশ উত্তপ্ত আর শোণিতশূন্য করলেন যজ্ঞের জন্য—*'অথ চিক্ষেপ সৌমিত্রিঃ সমিদ্ধে জাতবেদসি। তত্তু পক্কং সমাজ্ঞায় নিষ্টপ্তং ছিন্নশোণিতম্'।*

যাক গে, খাওয়াতে তো পারব না। খামোখা আপনাদের লোভ দেখিয়ে লাভ নেই। বাদ দিন। আমাদের কপালে ওই ফলমূলই আছে।

থাক সে সব দুঃখের কথা। তো লক্ষ্মণ বনে চলে যাওয়ার পর রাম সীতাকে স্মিত হাস্যে বললেন, 'শোনো জানকী! এইবার তোমায় আমি কিছু নরলীলা দেখাব। আপাতত কিছুদিনের জন্য তুমি অগ্নির মধ্যে বাস করো। সেই অবসরে আমি রাক্ষসদের ধ্বংস করি!'

সুনহু প্রিয়া ব্রত রুচির সুশীলা।
মৈঁ কুছ করব ললিত নরলীলা।।
তুম পাবকমহুঁ করহু নিবাসা।
জৌঁ লগি করৌঁ নিশাচর নাসা।।

রাম এইসব বুঝিয়ে বলার পর সীতা প্রভুপদ নিজের হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করে অগ্নিমধ্যে গমন করলেন। রেখে গেলেন নিজের একটি প্রতিবিম্ব—'নিজ প্রতিবিম্ব রাখি তহঁ সীতা।' সেই প্রতিবিম্ব সীতার মতোই রূপবতী, সুশীলা।

এই স্থান-পরিবর্তনের কথা এমনকী লক্ষ্মণও জানতে পারলেন না। রাম-সীতা ছাড়া আর কেউই এই গুহ্য তত্ত্ব জানতেন না। তার মানে, রাবণ জানতেও পারলেন না যে, যে নারীকে হরণ করে নিয়ে গেলেন তিনি—সে আদৌ সীতাই নয়, এক প্রাণহীন পুত্তলী মাত্র! প্রতিবিম্ব!!

বোঝা গেল, তুলসীদাস-সৃষ্ট রাম যেহেতু সকল দেবতারও আরাধ্য দেবতা, তাঁর কাহিনি যেহেতু স্বয়ং শিব শোনাচ্ছেন দুর্গাকে—তাই সীতাহরণের অজুহাতে তাঁর দরকার নেই। রাক্ষস-বধের জন্যই তাঁর নররূপ ধারণ, তাঁর 'নরলীলা।' সেই কারণেই পত্নীকে খামোখা কষ্টে না-ফেলে তিনি তাঁকে অগ্নির কাছে সুরক্ষিত রাখলেন। রাবণ-বধ তো তাঁর অবতীর্ণ হওয়ার কারণই! সে তো তিনি এমনিও করবেন, এমনকী যদি এ-কথাও তাঁর জানা থাকে যে—রাবণ আদৌ সীতাহরণ (মানে 'আসল' সীতাকে হরণ) করেনইনি!

ইয়ে...যুক্তিটা একটু কেমন শোনাচ্ছে, না?

তা সে তো আমি আগেই বলে নিয়েছি বাপু, আদিকবি যেমন সচরাচর যুক্তির পথ ছাড়তে রাজি নন, তুলসীদাস বা কৃত্তিবাসের বেলায় সেটি ভাবলে হবে না। বিশেষত তুলসী আগে ভক্ত। কাজেই তাঁর কাছে রামের সকল কর্মই লীলা; আর এ কথাও আমি ঢের আগেই বলে নিয়েছি—লীলার কোনও যুক্তি লাগে না!

তা নয় হল। কথা হল, এই কাহিনির তো একটা শেষ থাকাও চাই! মানে সোজা কথায়, ছায়াসীতার বদলে আসল সীতা, যিনি অগ্নির কাছে গচ্ছিত রইলেন, তাঁকে তো ফিরিয়ে আনতে হবে, নাকি?

এইবার তুলসীদাস রামের একটি অন্যায়ের অজুহাত হিসাবে এই ঘটনাটিকে ব্যবহার করে নিলেন চমৎকার ভঙ্গীতে।

রাবণ-বধের পর রাম সীতাকে নিয়ে আসার জন্য পাঠালেন হনুমানকে। এরপর যা ঘটেছিল, তা নিশ্চিতভাবেই আপনারা ভোলেননি, কারণ সীতার দুঃখময় জীবনেও এমন তীক্ষ্ণধার দুঃখ তাঁকে কমই বহন করতে হয়েছে—যখন স্বয়ং রাম তাঁকে এত তিক্তভাবে অপমান করেছেন। এও আপনাদের মনে আছে, তারপরেই সীতা অগ্নিতে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিলেন, যে ঘটনাকে আমরা হামেশাই উত্তরকাণ্ডের অন্তিমে

ঘটে-যাওয়া অগ্নিপরীক্ষার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি, আর 'যে রাম তার বউকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল...' ইত্যাদি বলে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করে থাকি।

এইবার তুলসীদাস সেই অগ্নিপ্রবেশ-কাণ্ডকে ব্যবহার করলেন আসল সীতাকে ফিরিয়ে আনার জন্য। তিনি বললেন, রাম তো আগেই সীতাকে অগ্নিতে রেখে দিয়েছিলেন! এইবার সীতাকে ফিরিয়ে আনবেন বলে অন্তর্যামী রামচন্দ্র স্থির করলেন—'সীতা প্রথম অনল মহুঁ রাখি। প্রগট কীনহ চহ অন্তর সাথী।' তাই তিনি সীতাকে 'কিছু দুর্বাক্য' বললেন, সামান্য 'কছুক দুর্বাদ!' তখন প্রভুর বচন শিরোধার্য করে সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। বিপ্রের রূপ ধরে অগ্নি স্বয়ং লক্ষ্মীরূপিণী সীতাকে রামের হাতে ফিরিয়ে দিলেন। আসল সীতা তাঁর নিজের জায়গায়, অর্থাৎ স্বামীর কাছে ফিরে এলেন, মধুরেণ সমাপয়েৎ।

আচ্ছা, সে না-হয় হল। কিন্তু কথা হল, এই গল্পটা কি তুলসীদাসের স্বকপোলকল্পিত, না আজকের ভাষায় 'সংগৃহীত?' আগেও বলেছি—পুরাণ-মহাকাব্য লেখাই হয় যুগে যুগে রূপ বদলে উৎস বা উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হবে বলে। এই উপাদানগুলো ভারতের বহু সহস্রাব্দের নিজস্ব সম্পদ, যা এই দীর্ঘ পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থায় হাঁটতে হাঁটতেও কখনও পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। অনেক অত্যাচার, অনেক মার সয়েছে; অনেক পুড়ে গিয়েও অনেক বেঁচে গেছে—এই রক্ষে।

হ্যাঁ, এই ছায়াসীতার গল্পটিও তেমনি। পুরাণে এর মূল নিহিত আছে, এবং শুধু তাই নয়, এই ছায়াসীতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে রীতিমতো এক পৃথক উপকাহিনি।

শুনুন তবে।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে একটি কাহিনি আছে, যার মূল উপজীব্য বেদবতী—বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে যাঁর উল্লেখ আছে, যুদ্ধকাণ্ডেও এঁর নাম করে রাবণ কিঞ্চিৎ হাহুতাশ করেছিলেন। সেখানে ইনি একজন বিষ্ণুসাধিকা, রাবণ যাঁকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে শাপগ্রস্ত হন। ইনিই পরবর্তীতে সীতারূপে জন্ম নিয়ে রাবণের সগোষ্ঠী ধ্বংসের কারণ হয়েছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এই বেদবতীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক পৃথক উপকাহিনি। কুশধ্বজ নামের এক রাজার কন্যা এই বেদবতী বহু তপস্যা করেছিলেন বিষ্ণুকে স্বামী-রূপে পাওয়ার জন্য। রামায়ণের কাহিনির মতোই এখানেও তাঁকে স্পর্শ করলেন রাবণ, এবং বেদবতী তাঁকে অভিশাপ দিয়ে নিজে প্রাণবিসর্জন দিলেন।

পরজন্মে তিনি সীতা-রূপে জন্ম নিয়ে বিষ্ণুর পরিপূর্ণতম রূপ—রামকে পতি হিসেবে লাভ করলেন। বনবাসে থাকাকালীন একদিন স্বয়ং অগ্নিদেব বিপ্রের বেশ ধরে রামের কাছে এসে বললেন, কালের গতি রোধ করা অসম্ভব। সীতাহরণের সময় আসন্ন হয়েছে। তাই আপাতত সীতাকে আপনি আমার আশ্রয়ে রেখে নিজে ছায়াসীতাকে সঙ্গে রাখুন। তাই হল, অগ্নির সৃষ্টি করা সীতার সমান গুণসম্পন্ন মায়াসীতাকে রামের কাছে রেখে প্রকৃত সীতাকে অগ্নি নিজের কাছে রাখলেন—*'বহ্নির্যোগেণ সীতায়া মায়াসীতাং চকার হ। তত্তুল্যগুণসর্বাংশাং দদৌ রামায়...।'*

রাবণবধের পর সেই তথাকথিত অগ্নিপরীক্ষার সময় অগ্নিদেব প্রকৃত সীতাকে ফিরিয়ে দিলেন রামের কাছে।

এই পর্যন্ত পড়ার পর আর সন্দেহ থাকে না, তুলসীদাস তাঁর ছায়াসীতার উপাদান কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন। তা সে তো কৃত্তিবাসও স্কন্দপুরাণ থেকে রত্নাকর-বৃত্তান্ত নামধাম পাল্টে গ্রহণ করেছেন। ওকে সেকালে কৈতববৃত্তি ভাবা হত না। কিন্তু কথা হল, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গল্পটি এখানেই শেষ হয় না। এর একটি খাসা উপসংহার আছে; এবং সেটি ভারি চিত্তাকর্ষক। সেটুকুও বলি তবে!

এবার, প্রকৃত সীতা রামের কাছে ফিরে আসার পর ছায়াসীতা অগ্নিদেব এবং রামের কাছে নিজের কর্তব্য জানতে চাইলেন। অগ্নি বললেন, 'তুমি পুষ্করে গিয়ে তপস্যা করো। তপোবলে তুমি স্বর্গলক্ষ্মী হবে।'

তাই হল। ছায়াসীতা স্বর্গলক্ষ্মী হলেন। কিন্তু রামের রূপ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাই শিবের কাছে বর চাইবার সময় তিনি পাঁচবার করে বলে বসলেন, 'আমাকে স্বামী দান করো। আমাকে স্বামী দান করো।' *'পতিং*

দেহি পতিং দেহি পঞ্চবারং চকার সা।' রসিকেশ্বর শিব স্মিতহাস্যে তাতেই সম্মতি দিলেন। এরই ফলে দ্বাপরযুগে ইনি দ্রৌপদী-রূপে জন্ম নিলেন, এবং পঞ্চপাণ্ডবদের স্বামী হিসেবে পেলেন।

গল্পটা এইদিকে বাঁক নেওয়ার ফলে অবশ্য আমরা কিঞ্চিৎ আতান্তরে পড়ে গেলাম, কারণ দ্বাপরে বিষ্ণুর অবতার পঞ্চপাণ্ডব নন। বলরাম। কৃষ্ণ তো পরবর্তীকালে অবতার থেকে অবতারীতে পরিণত হলেন। কিন্তু পাণ্ডবেরা যে বিষ্ণুর অবতার—এমন বললে তাঁদের জন্মবৃত্তান্তই গোলমালে পড়ে যায়। কুন্তীর সেই মন্ত্রবলে দেবতাদের আবাহন জানানোর ক্ষমতার কথা আমরা ভুলিনি। তাঁরই আহ্বানে সূর্য-ধর্ম-ইন্দ্রেরা একে একে এসে কর্ণ, যুধিষ্ঠির বা অর্জুনের জন্মের 'বর' দিয়েছিলেন। আর সবচেয়ে বিখ্যাত দশাবতার তালিকায় জয়দেব গোস্বামী তো স্পষ্টাক্ষরে বলদেবের কথা বলেই দিয়েছেন!

'বহসি বপুশি বিসদে বসনম জলদাভম হল-হতি-ভীতি-মিলিত-যমুনাভমকেশব ধৃত-হলধর রূপ জয় জগদীশ হরে।'

তা সে যাক। এবার ভাবুন—এই কাহিনি থেকে আমরা কী শিক্ষা পেলাম?

প্রার্থনা করার সময় সামলে চলুন, বুঝেছেন? এক কথা বারবার বলে ঠাকুরের মাথা খাবেন না, খবরদার! বরের বাড়াবাড়ি অনেকসময় আক্ষরিক অর্থেই 'বর'-এর বাড়াবাড়ি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

হে আমার সুকুমারমতি পাঠিকা! খুউউব সাবধান!!

অহল্যা-উদ্ধার

আজকের শিশুদের মনে নিশ্চিতভাবেই একটা সখেদ চিন্তা আছে। যেসব পূর্ণবয়স্ক মানুষ নিছক জ্ঞানদানের নির্মোহ চেষ্টা থেকে আত্মসংবরণ করে বাচ্চাকাচ্চাদের সঙ্গে গল্পগুজব করার মতো সদবুদ্ধিও রাখেন, তাঁরাই শুধু এ খবর জানেন।

তো তাদের ধারণা—আমাদের শৈশবে 'এন্টারটেনমেন্ট' বা মনোরঞ্জন ব্যাপারটার বেজায় অভাব ছিল। আমার শিশুপুত্র (মানে যখন সে শিশু ছিল), এবং তার আগে-পরে বিস্তর ভাগ্নি-ভাইঝি-ভাইপো, এবং বন্ধুপুত্র ও কন্যাদিগের সঙ্গে মনোজ্ঞ আলোচনা করে আমি তাদের মধ্যে এই ধারণাটির সন্ধান পেয়েছি। আমরা, যারা সত্তরের দশকের জাতক—তাদের শৈশবে যে টিভি থেকে ইউটিউব চ্যানেল, এবং নেটফ্লিক্স থেকে ডোরেমন পর্যন্ত কিস্যু ছিল না; তা জেনে তারা হতভম্ব হয়ে যায়। এরপরেই আসে অনিবার্য প্রশ্ন—'তাহলে তোমরা সময় কাটাতে কী করে?'

এই প্রশ্নের উত্তরে পাল্টা হতভম্ব হয়ে যাওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু করার থাকে না। সকালে পড়া, দুপুরে ইস্কুল, বিকেলে কালভেদে ফুটবল এবং ক্রিকেট তথা ব্যাডমিন্টন; বর্ষায় ক্লাবে ক্যারাম শেষ করে ফের পড়া, এবং বাড়িতে একগোছা ভাইবোন এবং বাইরে অগুন্তি বন্ধুবান্ধব সামলে ভালো করে ঘুমনোর সময় হত না! আর বলে কিনা—সময় কাটাতাম কী করে? অ্যাঁ! মেয়েগুলো পর্যন্ত গুচ্ছখানেক খেলা খেলত বসে, আড্ডা দিত ঠেসে! তারপর ছিল ব্রতচারী। সময় কাটানো! ধুর! সময় কোথা?

কিন্তু হৃদকমলে আসল ধুমটা লাগত শীতকালে। তখন বাড়ির সামনের মাঠটায় পরপর আসত সার্কাস, যাত্রা, গানের আসর—যাকে বলা হত 'ফাংশান', পর্দা খাটিয়ে দিনে তিনটে করে সিনেমা, এবং ম্যাজিক শো। ফলে গোটা শীতকালটাই হয়ে উঠত একটা দীর্ঘস্থায়ী কার্নিভাল, সন্ধ্যায় ভেসে আসত যাত্রার চড়া স্কেলের মিউজিক; কিংবা গভীর রাতে সিংহের ডাকের অশরীরী অনুভব! এক কথায় 'মফস্বল জমজমাট!'

তা অন্য কথা থাক। পি. সি. সরকার দুজন। একজন সিনিয়র, একজন জুনিয়র। এ কথা তো আমরা সব্বাই জানি, খোদ আজকের সরকার মশাইও তাই-ই জানেন। কিন্তু তিনি যা জানেন না, তা হল—তাঁদের বংশানুক্রমিকভাবে উপার্জিত অসামান্য খ্যাতি তামাম গ্রামবাংলার ম্যাজিশিয়ানদের পদবি বদলে দিয়েছে। অর্থাৎ আমাদের গঞ্জের মাঠে শীতে যে তাঁবু পড়ত, তাতে যিনিই খেলা দেখাতে আসুন না কেন, অনিবার্যভাবেই তাঁর পদবি হবে সরকার। জাদুকর মানেই...সরকার। এবং তাঁদের নামের গড়নও মোটের উপর একইরকম—ডি. কে. সরকার, টি. জে. সরকার—এই জাতীয় কিছু একটা; যা সেই বিশ্বখ্যাত নামটির সঙ্গে ধ্বনিসাম্য বজায় রাখতে পারে। সে কী আড়ম্বর! মস্ত, কিন্তু নানারঙের তাপ্পি-মারা পুরোনো তাঁবু, তার চারদিকে কাঠের বেড়া, শীতের ঘন নীল আকাশে নানা রঙের নিশান উড়ত। হমীনস্ত!

এবং এমনই এক জাদুকরের তাঁবুতে আমার সঙ্গে অহল্যার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। সে এক অপূর্ব ব্যাপার! একটা খেলা দেখাতেন সেই লাল কোট আর সোনালি পাগড়ি-পরা জাদুকর—'অহল্যা-উদ্ধার!' তাতে মঞ্চের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড কাপড়ের-তৈরি পাথর এনে রাখা হত। ধুতি-পরা খালি গায়ে একজন লোক রাম সেজে এসে যেই সেই পাথরে পা ছুঁইয়ে দিত—অমনি স্টেজে একটা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠত, আর দেখা যেত—এক পরমাসুন্দরী নারী পাথরের বদলে বসে আছে! তারপর সে উঠে রাম সেজে-থাকা লোকটাকে খুব ভক্তিভরে প্রণাম করত, আর অমনি ব্যাকগ্রাউন্ডে গান বেজে উঠত—'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।' বুড়োরা তো বটেই, আমরা ছানাপোনারাও বেজায় ভক্তিশ্রদ্ধা-সহকারে প্রণাম করতাম। হেনকালে ম্যাজিশিয়ান ঢুকে নিজেও দর্শকদের প্রণাম করত, আর অমনি চটাপট হাততালি পড়ত তাঁবু কাঁপিয়ে।

তা এসব কাঁচা খেলা বড় হয়ে আর কাউকে দেখাতে দেখিনি, কেউ দেখায় বলেও শুনিনি। কলকাতার সেয়ানা দর্শক মহাজাতি সদনে 'আসল' পি. সি. সরকারের ম্যাজিক দ্যাখে; তারা এসব খেলা দেখবেই বা কেন? এসব ওই চল্লিশ বছর আগের মফসসলেই মানাত। তে হি নো দিবসা গতা।

কিন্তু পাথর হয়ে-যাওয়া এক নারী যে রামের পাদস্পর্শে উদ্ধার পেয়েছিল—এই গল্পটা গোটা বাংলায় এভাবেই ছেয়ে আছে বটে। পরে জানতে পারি, উহুঁ, শুধু বাংলা নয়—গোটা উত্তর ভারতেই এই গল্পটা রামমহিমার একটি প্রধান উপকরণ—তিনি পাষাণে পরিণত অহল্যাকে উদ্ধার করেছিলেন।

কিন্তু মুশকিল তো ওই! এই পাষাণে পরিণত হওয়ার গল্পটা আবার বাল্মীকির রামায়ণে নেই!

তাহলে আছেটা কী?

আসুন, আগে বাল্মীকির বলা গল্পটা কাছ থেকে একবার দেখে নিই।

রামের জীবনের প্রধান দুটি ঘটনা যে আসলে তাঁর দুটি অভিযান—তা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন? প্রথমবার তিনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়েছিলেন মাত্র বারো বছর (দশরথ বলেছেন পনেরো) বয়েসে, বিশ্বামিত্রের সঙ্গে তাড়কা-বধের জন্য। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাঁকে অযোধ্যা ছাড়তে হয়েছিল পিতার প্রতিজ্ঞাবাক্য পালন করার জন্য। রামায়ণে যে আসলে এই দুটি পর্বেরই বিস্তৃত বর্ণনা আছে, বাকি কথা সংক্ষেপে সেরে নেওয়া—তা নির্ঘাত আপনারও চোখ এড়ায়নি। এর মধ্যে প্রথমটির অন্তর্গত ঘটনা এই অহল্যা-উদ্ধার।

বিশ্বামিত্র যখন দশরথের সভায় এসে রামকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন, তখন দশরথ স্বভাবতই বালক-পুত্রকে ছাড়তে চাইলেন না। রাক্ষসদের উপদ্রব থেকে যজ্ঞরক্ষার প্রয়োজনই যদি হয়ে থাকে, তাহলে দশরথের বালক জ্যেষ্ঠ সন্তানটি কেন যাবে? স্বয়ং রাজা দশরথ চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে যাবেন বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষা করতে, রাক্ষসদের দমন করতে—এটাই তো স্বাভাবিক! কিন্তু বিশ্বামিত্র রীতিমতো ভয় দেখিয়ে বৃদ্ধ দশরথকে রাজি করালেন; অবশ্য তাঁর প্রাচীন শত্রু বশিষ্ঠ মুনিও বিশ্বামিত্রের পক্ষেই মত দিলেন।

এবং সম্পূর্ণ অনাহূত এক প্রচ্ছায়ার মতো রামের সঙ্গে চললেন লক্ষ্মণ—সেই আশ্চর্য মানুষটি যাঁকে সম্পূর্ণ রামায়ণে কখনও আমরা পূর্ণ রূপে দেখেই উঠিনি কোনওদিন! অথচ যাঁকে ছাড়া রামায়ণ বস্তুত অর্ধেক! রামও!

তা সে যাই হোক—এই সূত্রেই রামের প্রথম অভিযান। প্রাপ্তির ঝুলি ভরে উঠল তাঁর, কেননা বিশ্বামিত্র তাঁকে দান করলেন বলা ও অতিবলা মন্ত্র, যার সুপ্রভাব অপরিসীম; দিলেন অসংখ্য দৈবী অস্ত্রশস্ত্র। রাম ভবিষ্যতের মহান কর্মের—অর্থাৎ রাবণ-বধের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন নিজের অজ্ঞাতেই।

তাড়কা ও সুবাহুকে বধ করে, মারীচকে দমন করে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ নিষ্কণ্টক করে তুললেন রাম ও লক্ষ্মণ। তারপর বিশালা পুরী পার হয়ে তাঁরা এগিয়ে চললেন মিথিলার দিকে, কারণ সেখানে রাজা জনক একটি মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছেন। বিশ্বামিত্র সেখানে নিমন্ত্রিত। তিনি রামকে বললেন সেই বিখ্যাত হরধনুর গল্পও।

মিথিলার উপকণ্ঠে একটি পরিত্যক্ত আশ্রম দেখে রাম কৌতূহলী হয়ে বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটি পূর্বে কার আশ্রম ছিল?

আপাত-নিরীহ এই প্রশ্নই আমাদের সামনে খুলে দিল অহল্যা নামক এক বিচিত্র চরিত্রের দ্বার—যাকে কেন্দ্র করে আমরা মুখোমুখি হব কিছু আশ্চর্য ও অনিবার্য যুগলক্ষণের। কারণ, এক অদ্ভুত সময়যাত্রা শুরু করতে চলেছি আমরা; শুধু পিছনবাগে—এই যা।

বিশ্বামিত্র এই ছোট্ট প্রশ্নের যে উত্তর দিলেন, তা থেকে আমাদের মনে হতে বাধ্য—তিনি রামকে স্বেচ্ছাকৃতভাবেই এই পথে নিয়ে এসেছেন, যদিও মুহূর্তকাল পূর্বেও এমন কোনও ইঙ্গিত আদিকবি দেননি। যাই হোক, কাহিনিটি সংক্ষেপে এইরকম :

পূর্বকালে এই স্থানে ঋষি গৌতমের আশ্রম ছিল। তাঁর স্ত্রী অহল্যার সঙ্গে তিনি এখানে বহু বৎসর তপস্যা করেছিলেন। একদা ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধারণ করে, তাঁর অনুপস্থিতিতে অহল্যার কাছে এসে রতিপ্রার্থনা করলেন। অহল্যা বুঝতে পারলেন ইনি ইন্দ্র; কিন্তু দিব্যরমণের বিষয়ে কৌতূহলবশতঃ তিনি ইন্দ্রের প্রার্থনা পূরণ করলেন। পূর্ণমনোরথ হয়ে তিনি ইন্দ্রকে বললেন, 'হে দেবরাজ, এইবার দ্রুত এখান থেকে প্রস্থান করুন, তাতে আমার এবং আপনার—দুজনেরই গৌরব রক্ষা পাবে।' পরিতুষ্ট ইন্দ্র হাসতে হাসতে সেখান থেকে ব্যস্ত পায়ে প্রস্থান করতে গেলেন, কিন্তু বেরিয়েই তিনি স্বয়ং গৌতমের মুখোমুখি হলেন। স্নান-প্রত্যাগত গৌতম ইন্দ্রকে দেখে সবই বুঝতে পারলেন; এবং স্বভাবতই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে অভিশাপ দিলেন,'তুই আমার রূপ ধরে এই অন্যায় করেছিস—তাই তুই অণ্ডকোষহীন হবি।'

তারপর অহল্যার উপর তাঁর ক্রোধ আপতিত হল। তাঁকেও তিনি অভিশাপ দিলেন বটে, কিন্তু না! আমরা বরাবর যেমনটি জেনে এসেছি, তেমন করে মোটেই 'তুই পাথর হয়ে যা হতচ্ছাড়ি!' বলে চিল্লিয়ে উঠলেন না গৌতম। তিনি অভিশাপটি দিলেন অতিশয় রহস্যময় ভাষায়। বললেন,'তুই এই আশ্রমে বহু সহস্র বৎসর অনাহারে ভস্মশায়িনী হয়ে অনুতপ্ত অবস্থায় বাস করবি। কেউ তোকে দেখতে পাবে না। *'বাতভক্ষ্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী। অদৃশ্যা সর্বভূতানামাশ্রমে'স্মিন্ বসিষ্যসি।।'* শেষে যখন রাম এই বনে আসবেন, তাঁর সেবা করে তোর মুক্তি হবে, তখন তুই আমার কাছে আসবি।'

ইন্দ্রের অভিশাপের দিকটা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নয়, কাজেই সেটা আমরা উপেক্ষা করলাম। 'সহস্র বৎসর' ব্যাপারটাও আমরা বাদ দিচ্ছি, সেকালে বৃহৎ কালব্যবধান বোঝাতে অমন বলাটা প্রথা ছিল। মোদ্দা ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াল এই—গৌতমের অভিশাপ অনুযায়ী আসলে অহল্যা লোকসমাজ থেকে পরিত্যক্তা হলেন, একাকী অনাহারে অনাথিনী অবস্থায় পরিত্যক্ত আশ্রমে পড়ে রইলেন তিনি।

মুশকিল হল, এর সঙ্গে রামকে জড়িয়ে ফেলা বেশ মুশকিল; কারণ তাহলে মেনে নিতে হয়, গৌতম তপোবলে এ কথা আগে থেকেই জানতেন, রাম বিষ্ণুর অবতার—যে কথা তখনো পর্যন্ত বিশ্বামিত্র বা বশিষ্ঠর মতো নিকটতর মহর্ষিরাও আকারে-ইঙ্গিতে পর্যন্ত বলছেন না। অবতারত্বের বিষয়টা মেনে নিলে অবিশ্যি গোল চুকে যায়; কারণ অবশিষ্ট কাহিনিটি মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে অত্যন্ত যৌক্তিক এবং সঙ্গত। দৈব যৌনতার প্রতি যদি অহল্যার কৌতূহল থেকে থাকে, তাকে আপনি খুব বেশি হলে অন্যায় বলতে পারেন, অসঙ্গত বলতে পারেন না; বিশেষত যেহেতু গৌতম সম্পর্কে বা তাঁদের দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে আমাদের

হাতে আর কোনও তথ্য নেই। বৃদ্ধ ঋষির যুবতী ও কামপরায়ণা স্ত্রীর কাহিনি আমাদের মহাকাব্যে ও পুরাণে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে; বোধহয় সেকালে প্রোষিতভর্তৃকা নারীর ন্যায় বৃদ্ধ মুনিদের যুবতী মুনিপত্নীরাও কবিদের সহর্ষ কল্পনার উদ্রেক ঘটাতেন। মহর্ষি চ্যবণ এবং তাঁর যুবতী পত্নী সুকন্যাকে আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি। সেক্ষেত্রে গৌতমের ক্রুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক, কারণ তাঁর পত্নী জ্ঞাতসারে পাপকর্মে রত হয়েছেন, বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন।

যাই হোক, রামের আগমনে অহল্যা মুক্তি পেলেন। লক্ষণীয়ভাবে, এতদিন তিনি অন্যের পক্ষে অদৃশ্য ছিলেন, মনে হত যেন তিনি 'মায়াময়ী।' এবার রামের আগমনে তিনি সকলের পক্ষে দৃশ্যমান হলেন। রাম ও লক্ষ্মণ সেই সঙ্গীবিহীন তপস্বিনীকে প্রণাম করলেন, তিনিও রামকে প্রণাম করে পাপ থেকে মুক্তি পেলেন।

গোটা ঘটনাটাকে রূপক ও প্রতীকের জটাজাল থেকে মুক্ত করলে বোধ হচ্ছে, রাম-লক্ষ্মণ এবং স্বয়ং মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আগমন হওয়ায় অহল্যা সম্পর্কে যে সামাজিক অলঙ্ঘ্য নিষেধাজ্ঞা ছিল, তার অবসান ঘটেছিল। দুই রাজপুত্র এবং এক মহাতপস্বী পরিত্যক্ত আশ্রমটিতে পদার্পণ করা-মাত্রই 'ট্যাবু' যা ছিল, তার অবসান ঘটল অহল্যা সামাজিক স্বীকৃতি ফিরে পেলেন। গৌতমও ফিরে এলেন, এমনকী সামান্য পরেই আমরা অহল্যার পুত্রটিকেও খুঁজে পাব; শতানন্দ, জনকের পুরোহিত—রাম তাঁর মাতাকে উদ্ধার করেছেন বলে যাঁর কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

এক্ষেত্রে একটিমাত্র কথা আপনাদের আরেকবার খেয়াল করিয়ে দিয়ে আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাত্রা করব। মনে রাখবেন—অহল্যা যা করেছেন, তা স্বজ্ঞানে করেছেন, জেনেবুঝে কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে করেছেন। মনে থাকবে?

বেশ! পরের ধাপে যাই? কৃত্তিবাস ওঝা।

তিনি কিন্তু অহল্যা-উদ্ধারের বর্ণনা শুরুই করলেন পাথরের উল্লেখ করে। অহল্যার তপোবনে ঢুকেই বিশ্বামিত্র রামকে বললেন,'পাষাণ উপরে পদ করহ অর্পণ।' রাম এই অদ্ভুত আদেশের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, এবং সেই সূত্রে আমরা ইন্দ্র ও অহল্যার মিলনকাহিনিটি পুনর্বার শুনতে পেলাম। গল্প মোটের উপর একই। কিন্তু এইবার একটি সূক্ষ্ম, অথচ তীক্ষ্ণধার পরিবর্তন ঘটে গেল—যা গোটা ঘটনার ভরকেন্দ্রই বদলে দিল।

এক্ষেত্রেও ইন্দ্র এলেন গৌতমের ছদ্মবেশ ধারণ করে। এক্ষেত্রেও অহল্যা মিলিত হলেন তাঁর সঙ্গে। পার্থক্য শুধু এই—এবার তিনি এই কর্মটি করলেন অজান্তে; অর্থাৎ তিনি ছদ্মবেশধারী ইন্দ্রের স্বরূপ চিনতে পারলেন না। সফলকাম হয়ে ইন্দ্র বিদায় নেওয়ার কিছুক্ষণ পর তপস্যা সাঙ্গ করে গৌতম ফিরলেন আশ্রমে। অহল্যার সর্বাঙ্গে শৃঙ্গার-লক্ষণ দেখে তিনি তাঁকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। অহল্যা স্বভাবতই অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন,'আপনি করিয়া কর্ম দোষহ আমারে!'

এইবার ধ্যানযোগে প্রকৃত সত্য জানতে পেরে প্রবল ক্রুদ্ধ হয়ে শিষ্য ইন্দ্রকে তিনি অভিশাপ দিলেন, 'যোনিময় হোক তোর সর্ব কলেবর।' আর অহল্যাকে শাপ দিলেন, তিনি প্রস্তরীভূত হবেন। অহল্যা তাঁর পায়ে পড়ে শাপমোচনের উপায় জিজ্ঞাসা করলে গৌতম বলে দিলেন—দশরথ-পুত্র রাম যখন সেই পাষাণে পদস্পর্শ করবেন, তখন অহল্যার পাপ দূর হয়ে তিনি আবার স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করবেন।

ইন্দ্র অবশ্য অচিরাৎ অশ্বমেধ যজ্ঞের মাধ্যমে পাপমুক্ত হয়েছিলেন, তাঁর সর্বাঙ্গের যোনিচিহ্ন নেত্রে পরিণত হল। আর অহল্যাও রামের পদস্পর্শ পেয়ে পাষাণ থেকে ফের মানবী হলেন, তাঁকে ফিরে পেয়ে গৌতমও বেজায় খুশি হলেন—যাকে বলে মধুরেণ সমাপয়েৎ।

শুধু একটা ছোট্ট প্রশ্ন থেকেই গেল।

অহল্যা আদৌ শাপগ্রস্ত হলেন কোন অপরাধে? সেইটে তো আমাদের বোধগম্য হল না! তিনি গৌতমের ধর্মপত্নী; স্বামী স্বয়ং এসে রতিপ্রার্থনা করেছেন, সাধ্বী ও পতিপ্রাণা স্ত্রী হিসাবে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কামনা পূর্ণ করে দিয়েছেন। দোষ করেছেন ইন্দ্র। তিনি জ্ঞানত একজন সরলা মুনিপত্নীকে ভোগ করেছেন ('ধর্ষণ'

শব্দটি আজকের প্রচলিত অর্থে অবশ্য এর কোনও ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায় না; কারণ প্রথম ক্ষেত্রে কৌতূহলবশত, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইন্দ্রকে স্বামী বলে ভুল করে অহল্যা সহযোগিতাই করেছেন। ইন্দ্র কখনোই বলপ্রয়োগ করেননি। করতে হয়নি বলাই ভালো।)। কিন্তু অহল্যা যে কী দোষ করে পাষাণে পরিণত হওয়ার অভিশাপটি পেলেন—তা আমাদের মাথায় ঢুকল না। আরও বিস্ময়কর হল অহল্যার বিনা-প্রশ্নে, নির্বিচারে এই অবিচার মেনে নিয়ে তৎক্ষণাৎ স্বামীর পায়ে পড়ে যাওয়া। তিনি একবারও বলতে চাইলেন না—এই গোটা ঘটনাটায় তিনি শুধু প্রতারিত হয়েছেন মাত্র! স্বামীকে তিনি প্রতারণা করেননি! বিনা-বাক্যব্যয়ে তিনি প্রস্তরে পরিণত হলেন।

আর এইভাবেই আমাদের সমাজ ধীরে ধীরে নারীকে পিছিয়ে দেয়। করে তোলে প্রশ্নবিহীন, প্রতিবাদবিহীন এক সত্ত্বা—যার কাজ শুধু নির্বিচারে মেনে-নেওয়া। লম্পট কামুক পুরুষের—এমনকী পুরুষ দেবতারও—অন্যায়ের দায় বহন করে চলা তার কাজ, দায়িত্ব। স্বামীর দেওয়া শাস্তি, তা সে যতই অকারণ বা অযৌক্তিক হোক—সে বহন করে প্রতিবাদ না-করেই! বাল্মীকি থেকে কৃত্তিবাসে আসার পথে আমরা এগিয়ে যাই না, পিছিয়ে যাই। বাস-কন্ডাক্টারের সেই অলীক চিৎকার আবার শুনতে পাচ্ছি আমরা—'পিছনের দিকে এগিয়ে যান!'

আর তুলসীদাস?

সসঙ্কোচে তিনি এড়িয়ে যান গোটা প্রসঙ্গটাই। অহল্যার উদ্ধার ও শাপমোচন অবশ্যই তাঁর কাছে রামের এক অপার্থিব মহিমা! তিনি শুধু সরাসরি চলে যান গৌতমের শাপগ্রস্তা পত্নীর পাষাণপ্রতিমার উল্লেখে, 'গৌতম নারী শ্রাপ বস, উপল দেহ ধরি ধীর।' রামের পদস্পর্শ যখন অহল্যাকে তাঁর স্বমূর্তি ফিরিয়ে দেয়, তখন অহল্যা বরং বলেন, স্বামী তাঁকে শাপে বর দিয়েছেন, কারণ সেই শাপের ফলেই রামের দর্শন হল তাঁর—'মুনি শ্রাপ যো দীহ্না অতি ভল কীহ্না পরম অনুগ্রহ মৈ মানা!' তারপরেই চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী তুলসী ফিরে যান রামের ঐশ্বরিক মহিমার স্তবে। কোন অপরাধে, কেন অহল্যার এই শাপ—তার কিছুই তুলসীদাস বর্ণনা করেন না। পরম ঔদাসিন্যে সেসব তুচ্ছ কথা এড়িয়ে যান তিনি; কারণ তাঁর গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য শুধুই রাম-মহিমার প্রচার। সেখানে এক দুর্ভাগিনী মুনিপত্নীর শাপগ্রস্তা হওয়ার ঘটনাটি নিতান্তই অবান্তর!

আরও এক ধাপ পিছিয়ে যান অহল্যা এই উদাসীনতার অভিঘাতে; কারণ এক্ষেত্রে তাঁর অভিশপ্ত হওয়ার কারণটিও কবির কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। প্রয়োজনীয় হয়ে থেকে যায় শুধু তাঁর উদ্ধারের উল্লেখটুকু, কারণ তা রামের পক্ষে গৌরবজনক। ব্যস।

আর হ্যাঁ, অহল্যার সঙ্গে সঙ্গে অবান্তর হওয়ার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যান ভারতীয় নারীসমাজ।

নাকি পিছিয়ে যান?

অকাল-বোধনে আমি তোমাকে চাই...

খুব ছেলেবেলার কিছু দৃশ্য দেখবেন অগ্রপশ্চাৎ কার্যকারণ ছাড়াই মগজে গেঁথে থাকে। মানে, তার আগের কথাও কিছু আপনার মনে নেই, পরবর্তী দৃশ্যাবলীও ঝাপসা হয়ে গেছে; শুধু ওই একটা খণ্ডদৃশ্য আপনার অবচেতনে কোনও অজানা কারণে পাকাপোক্ত জায়গা করে নিয়েছে—ব্যস, তার অকারণ অমরত্ব প্রাপ্তি হয়েছে।

এমন সব ছেঁড়াফাটা দৃশ্যে আমাদের সবার মগজ ভরে থাকে। সহায়ক পরিস্থিতি পেলে তা লম্ফ দিয়ে উঠে আসে, আর ছোট্টোবেলার বন্ধুর মতো দাঁত খিঁচিয়ে হেসে বলে—'কী রে? ভুলিসনি এখনও?'

আমারও আছে এমন সব পুরোনো দৃশ্যের অনিবার্য সম্বল। তার মধ্যে একটা বলি। আমাদের পুরোনো বাড়িটার টানা বারান্দার মাথার দিকের ঘরটা ঠাকুমার। দরজার সামনে জলচৌকিতে চিরাভ্যস্ত ভঙ্গীতে বসে আছে ফর্সা ধবধবে, ছোট ছোট করে ছাঁটা সাদা চুলের ঠাকুমা। সামনেই একটা কাঠের হাতল-ভাঙা চেয়ারে রাখা আছে প্রকাণ্ড বুড়ো রেডিয়োটা। পাশের দেওয়ালটায় হেলান দিয়ে আমরা, একমুঠো নাতিনাতনি, ঢুলছি। তারপর বাবা-ছোটকাকু-জ্যাঠামণি-জেঠিমারা। তারা ঢুলছে না। উঠোনে স্থলপদ্ম গাছটা সাদা ফুলে ভরে আছে। আমি ততদিনে জেনে গেছি—বেলা বাড়লে ওগুলোই রঙ বদলে গোলাপি হয়ে যাবে। পদ্মগাছটার পাশে একটা উনুনে মস্ত পাত্রে চা ফুটছে; আর ফুটন্ত পদ্মফুল, শিউলি আর সস্তার চায়ের গন্ধে আমাদের গাছগাছালিতে ভরা উঠোনের ভোরের বাতাস ভরে উঠছে, সে হাওয়ায় বেশ শীত শীত ভাব। সেটা বুঝে ফেলে দিদিভাই—মানে আমাদের একেবারে বড় যে দিদি, সে সব ঢুলতে-থাকা ভাইবোনগুলোকে চাদর দিয়ে, আর বোধহয় আদর দিয়ে...মুড়ে দিচ্ছে। এমন সময়...

এমন সময় রেডিয়োটা হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠত ঠাকুমার হাতের ছোঁয়া পেয়ে। সংক্ষিপ্ত একটা ঘোষণা, তিনবার শঙ্খধ্বনি, সেটার শব্দ কেমন বাঁশির মতো, তারপরেই অনেকে মিলে গেয়ে উঠত একটা গান—'যা চণ্ডী মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী' না কী যেন। অমনি ঠাকুমা, বড়োজ্যাঠামণি, রাঙা জ্যাঠামণি সবাই কপালে

জোড়হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করত; দেখাদেখি আমরাও। বাবা, ছোটকাকু, ন'জ্যাঠামণি ওরা করল না। (আশ্চর্য ব্যাপার হল, যখন অনেকক্ষণ পরে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় না কে যেন 'তব অচিন্ত্য রূপচরিতমহিমা' গানটা গেয়ে শেষ করত—অমনি ন'জ্যাঠামণি প্রণাম করত। কাকে, কে জানে?)

তারপরেই একটা ঐশী পুরুষকণ্ঠে বেজে উঠত অদ্ভুত একটা সুরেলা গদ্য—'আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জীর...।' আমার সমস্ত অবুঝ শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠত সেই সুরের অনুরণনে। ততক্ষণে চা হয়ে গেছে। ওইটুকুর লোভে আরও মিনিট চেক বসে থেকে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে আধো-তন্দ্রায় ডুবে যেতাম আমি। শুধু ফুলের গন্ধ, চায়ের গন্ধ, সুরের গন্ধ, একটা মস্ত বড় পরিবারের গন্ধ আর শারদপ্রাতের গন্ধ এসে ফিসফিস করে বলে যেত আমাদের সবার কানে কানে :

'পুজো এসে গেল গো!'

স্মৃতির পথে পথে যদি পরের দৃশ্যগুলোকে এলোমেলো বসিয়ে যাই—তাহলে এর পরেই আসে বাজারের নাটমন্দিরে সারাদিন বসে-থাকা পুজোর দিন, ক্যাপ ফাটার শব্দ, মাইকে হেমন্ত-শ্যামল-মান্না-সন্ধ্যা...

প্রথম কোনও কিশোরীর মুখ দেখে বুক ধড়াস করে ওঠা...

ক্লাস টেনে পড়া কিছু বিচ্ছিন্ন লাইন :

'আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্রমাসে মোর পূজা শুক্লা অষ্টমীতে।।'

এটা কেমন হল? তাহলে কি অন্নপূর্ণা আর দুর্গা আলাদা? কিন্তু তার খানিক আগেই যে ইনি ব্যাজস্তুতির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখলেন আপন পরিচয় :

'কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।।'

বাংলার স্যর মানে বুঝিয়ে দিয়েছেন—'কণ্ঠভরা বিষ' মানে মোটেই গালিগালাজ করা নয়; শিবের কথা হচ্ছে। শিব সমুদ্রমন্থনজাত কালকূট হলাহল পান করেছিলেন, ফলে তাঁর কণ্ঠ নীল হয়ে গিয়েছিল। বেশ, তাহলে ইনিই তো শিবানী? শিবের ঘরণী—যাঁকে নিয়ে ভারতচন্দ্রের শব্দখেলা (তখনও মুকুন্দ চক্রবর্তী পড়িনি, কাজেই ভারতচন্দ্র যে এই কর্মে প্রথম ব্রতী হননি, তা জানা ছিল না।)! তাহলে? তাঁর, মানে দেবী দুর্গার পুজো তো আশ্বিনের শারদপ্রাতই মাতিয়ে তোলে! সহসা চৈত্রমাস এল কোত্থেকে?

তারপর ইউনিভার্সিটি, আর সেই রাজকীয় কণ্ঠের ঘোষণা 'অকাল-বোধনে আমি তোমাকে চাই...!'

এই তাহলে সেই অকাল-বোধন—যা আজ আমাদের কাছে এক ও অদ্বিতীয় 'পুজো!' 'পুজো এসে গেল রে!' বললে আমরা—বাঙালিরা অন্য কিছু বুঝি না! অথচ সেই পুজো তার শাস্ত্রসম্মত সঙ্গত সময়ে না হয়ে হচ্ছে অশাস্ত্রীয় শরৎকালে!

কেন?

হেঃ! এ একটা প্রশ্ন হল? সবাই জানি আমরা—রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে, শরৎকালে দুর্গাপুজো করেছিল—সেই থেকেই...

এবং যেটা জানি না, তা হল—এই ঘটনাটি বাল্মীকি-রচিত রামায়ণে নেই!

কিন্তু সেই 'নেই'-তে প্রবেশ করার পূর্বে যা 'আছে', সেইটে একবার দেখে নেওয়া যাক!

শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণকে মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখে মহাক্রোধে রাম প্রথমেই রাবণকে ভয়ঙ্কর আক্রমণ করে রণক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করলেন। ইতোমধ্যে সুষেণের পরামর্শে হনুমান মহোদয়-নামক ঔষধগিরির দক্ষিণ শৃঙ্গ থেকে বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী, সঞ্জীবকরণী এবং সন্ধানকরণী—এই চারটি মহৌষধি আনতে গেলেন; কিন্তু চিনতে না-পেরে গোটা শৃঙ্গটাই তুলে নিয়ে এলেন। ঔষধ-প্রয়োগে লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এইবার রাম ও রাবণের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হল। কিন্তু দেবতারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, 'রাবণ উত্তম রথে আরূঢ় হয়ে যুদ্ধ করবেন, আর রাম ভূমিতে দাঁড়িয়ে—এ ন্যায়যুদ্ধ হচ্ছে না।' ইন্দ্র তখন মাতলিকে বললেন তাঁর রথটি নিয়ে যেতে; রাম যেন তাতে চড়ে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

রাবণ আবার রামের বাণে আহত হয়ে অচেতন হয়ে পড়লে সারথি তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে এলেন। রাম নিজেও তখন হতক্লান্ত। তাই দেখে, ইত্যবসরে অগস্ত্য যুদ্ধক্ষেত্রে এসে রামকে 'আদিত্যহৃদয়' মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে গেলেন। এই মন্ত্রের প্রভাবে রামের অবসাদ দূর হল। ইতোমধ্যে রাবণ জ্ঞান ফিরে পেয়ে রণাঙ্গনে ফিরে এলে যেমন ভয়ানক যুদ্ধ হল—তার কেউ কোনও তুলনা খুঁজে পেলেন না। গন্ধর্ব এবং অপ্সরারাও সকৌতূহলে এই যুদ্ধ দেখছিলেন। তাঁরা পরস্পরকে বলতে লাগলেন :

'সাগরঞ্চাম্বরপ্রখ্যমম্বরং সাগরোপমম্।
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণায়োরিব।।'

সাগরের উপমা যেমন সাগর নিজেই, আকাশের তুলনা যেমন শুধু আকাশের সঙ্গেই হতে পারে—রাম-রাবণের যুদ্ধকে তেমন একটিমাত্র বিষয়ের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। তা হল—রাম-রাবণের যুদ্ধ। (এটি আমার বড্ড প্রিয় পঙক্তি। উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করাই গেল না!)

কিন্তু রাম বারবার রাবণের মস্তক কেটে ফেলা সত্ত্বেও তা পুনর্নির্মিত হচ্ছে দেখে রামও মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলেন। এমন সময় ইন্দ্রের রথচালক মাতলি বললেন, রাম যেন অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা রাবণের প্রাণ হরণ করেন। রাম সেই ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন; সমস্ত পৃথিবীকে সন্ত্রস্ত, কম্পিত করে সেই মহাবাণ রাবণের বক্ষ বিদীর্ণ করে ভূমিতে প্রবেশ করল, তারপর আবার বিনীতভাবে রামের তূণীরে এসে প্রবেশ করল। রাবণের গতায়ু প্রাণহীন দেহ রথ থেকে মাটিতে পড়ে গেল। বানরদের তুমুল আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে সহসা অগ্রজের শোকে এই প্রথমবারের জন্য হাহাকার করে উঠলেন বিভীষণ। রাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, *'মরণান্তানি বৈরাণি নিবৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্'*—'মৃত্যুর পরে আর কোনও বৈরিতা থাকে না, শত্রুতার অবসান হয়। তুমি এঁর শেষকৃত্যের আয়োজন করো।'

এই তাহলে মহর্ষি, আদিকবি বাল্মীকির বর্ণনা অনুযায়ী অতি সংক্ষেপে রাবণ-বধের বৃত্তান্ত, যা সমগ্র রামায়ণের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। এ ব্যাপারে অবশ্য আমাদের আরও কিছু বক্তব্য আছে, তা সে না-হয় পরে হবে 'খন। দেখা যাচ্ছে এই কাহিনিতে ভগবানের নাক গলানোর ঘটনা ঘটছে মাত্র একবার; ইন্দ্র সারথি-সহ একটি রথ পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু তাতে রাম কোনও বাড়তি সুবিধা পাচ্ছেন না, বরং এতক্ষণ যে ক্ষেত্রটিতে তিনি পিছিয়ে ছিলেন, অর্থাৎ পদাতিক হিসাবে একজন রথীর সঙ্গে যুদ্ধ করার অসুবিধা—তার সাম্যবিধান হল মাত্র। আর রইল অগস্ত্য মুনির মন্ত্রদান। এর থেকে রাম যে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোনও সহায়তা পেয়েছেন—এমন কিছু অন্তত বাল্মীকি উল্লেখ করছেন না। দুই মহাবীরের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছে; রামের বীরত্ব রাবণের চাইতে বেশি, কিংবা যেহেতু রামের পক্ষে ন্যায় আছে তাই তিনি জিতেছেন—এরকম একটা খুব সাদামাটা ভরতবাক্য উচ্চারিত হতেই পারে।

এবং অন্তত এখানে অকালবোধন নামক কোনও বিষয়ের ইঙ্গিত বা উল্লেখ-মাত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ, খুব সোজা করে বললে, আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির যেটি প্রধান উৎসব—তার কারণ বাল্মীকি নন!

তাহলে এর উৎস কোথায়?

দুর্গা নামক দেবীর সঙ্গে আমাদের নিকটতম পরিচিততম সাক্ষাৎটি ঘটেছিল সেই গ্রন্থটিতে, যা আমাদের মধ্যে 'চণ্ডী' নামে খ্যাত। মার্কণ্ডেয় পুরাণের এই অংশটিই মহিষাসুরের বধকাণ্ডটির বর্ণনা দেয়; এবং চণ্ডী, দুর্গা ও কালী—এই তিন অন্যতম প্রধান শক্তিশালিনী দেবীর উৎপত্তির কারণ, কার্যকলাপ ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা দেয়। মুশকিল হল, এঁরা সকলেই যেহেতু মূলগতভাবে মহামায়ার (অর্থাৎ শক্তির বা প্রকৃতির) বিভিন্ন রূপ—তাই বর্ণনাংশে প্রায়শ সমতা নেই; একই দেবীকে একাধিক নামে স্তবস্তুতি করা হয়—চণ্ডী-দুর্গা-কালী-অম্বিকা—বিভিন্ন শ্লোকে এই নামগুলি পরস্পর স্থানবিনিময় করে। আবার দেবী নিজে এক স্থানে দেবতাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন, দুর্গম নামের এক অসুরকে বধ করার জন্য তিনি দুর্গা নাম ধারণ করবেন — *'তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্। দুর্গাদেবী ইতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।'*

এই 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' নামে প্রচলিত যে গ্রন্থাংশটি, তাতে রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি—এই দুই দুর্ভাগা শ্রোতাকে মেধা ঋষি কয়েকজন অসুরের বধোপাখ্যান শুনিয়েছিলেন। সে সব কাহিনি অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক বটে, কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে আমরা এর যে দ্বিতীয় ঘটনাটি—অর্থাৎ 'মহিষাসুর বধ'—সেটিকেই বেছে নিয়েছি পুজো করার জন্য। বস্তুত, লক্ষ করলে দেখব—একজন দেবীর মূর্তিকে নয়; আমরা পূজা করি একটি মুহূর্তকে—যে মুহূর্তটি এই কাহিনির নাটকীয়তম অংশ—ঠিক যখন মহিষের ছদ্মবেশ ত্যাগ করে অসুর নির্গত হচ্ছে, আর ঝলসে উঠছে দেবীর ত্রিশূল! এ এক অসামান্য পরিকল্পনা বটে!

এখন কথা হল, এই দেবীর পূজা ঠিক কোন তিথিতে করতে হবে, তার কোনও নির্দেশ এই গ্রন্থে নেই। রাজ্যচ্যুত রাজা সুরথ এবং গৃহচ্যুত সমাধি—দুজনেই মেধা ঋষির কাছ থেকে দেবীর মাহাত্ম্য জানতে পেরে নদীর তীরে তিন বছর ধরে কঠোর সাধনায় দেবীকে তুষ্ট করে মনোমত বর পেয়েছিলেন। একজন রাজ্য ফিরে পেলেন, অন্যজন ব্রহ্মজ্ঞান। এই সমগ্র কাহিনিটি শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে বিস্তৃত আকারে বর্ণিত হয়েছে, এবং আমরা বাঙালিরা যাকে 'মহালয়া' বলে চিনি, তা আসলে এই গ্রন্থটির পাঠ; যার সঙ্গে রয়েছে কিংবদন্তি শিল্পীদের কণ্ঠে কিছু গান।

আর আগেই বলেছি, রামায়ণে এই পূজার উল্লেখমাত্র নেই! তাহলে এই বোধন, বিশেষত 'অকাল-বোধন' কথাটি এল কোত্থেকে?

এই রহস্যের সমাধান করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই বাঙালি কবিটির কাছে।

কৃত্তিবাস ওঝা।

রাম আর রাবণের মধ্যে অন্তিম যুদ্ধ শুরু হল। রাম যমদণ্ড, ঐষিক, ধর্মচক্র প্রভৃতি বিবিধ বাণে ক্রমাগত রাবণের শিরচ্ছেদ করে চললেন; কিন্তু ব্রহ্মার বরে রাবণের কর্তিত মুণ্ড যথাস্থানে ফিরে আসতে লাগল বারংবার। শেষে অধৈর্য হয়ে হনুমান রাবণকে প্রবল মুষ্ট্যাঘাত করলেন, রাবণ হতচেতন হয়ে পড়ে গেলেন।

এইবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে রাবণ এক বিচিত্র কর্ম করতে লাগলেন। অম্বিকার স্তব করে তাঁকে তুষ্ট করার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি—'কোথা মা তারিণী তারা হও গো সদয়। দেখা দিয়া রক্ষা কর মোরে অসময়।।' শেষে এমনও বললেন, 'শঙ্কর ত্যজিল তেঁই ডাকি মা তোমারে।'

এবং কী আশ্চর্য, রাবণের এই স্তবে প্রসন্ন হয়ে মাতা অম্বিকা 'বসিলেন রথে কোলে করিয়া রাবণ!' রাম এইবার হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন; স্বয়ং জগন্মাতার সঙ্গে সংগ্রামের অবতীর্ণ হওয়া তাঁরও সাধ্যাতীত। হতাশ হয়ে তিনি মাটিতে বসে পড়লেন।

কিন্তু তাঁকে এমন হতাশ্বাস অবস্থায় দেখে দেবতারা দুশ্চিন্তায় পড়লেন—রাম যদি যুদ্ধ ত্যাগ করেন, তাহলে যে রাবণ-বধ অসম্ভব!

আর ঠিক এই সময় কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রথমবার উল্লিখিত হল এই শব্দবন্ধটি—অকাল-বোধন! ইন্দ্র ব্রহ্মাকে এই অচলাবস্থার সমাধান জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, '...বিধি আছে চণ্ডী-আরাধনে। হইবে রাবণ-বধ অকাল-বোধনে।' ইন্দ্রের অনুরোধে ব্রহ্মা নিজেই রামকে গিয়ে এই অকাল-বোধনের উপদেশ দিলেন। রাম বিস্মিত হয়ে বললেন, শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী বসন্তের কৃষ্ণা নবমী তিথিতে দেবীর বোধন করতে

হয়। কিন্তু ব্রহ্মা বিধান দিলেন, সুরথের পথ খণ্ডন করে রাম যেন শরতের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে দেবীর বোধন করেন। এই আদেশ দিয়ে ব্রহ্মা অন্তর্হিত হলেন।

পরদিন, শুক্লা ষষ্ঠী তিথির 'সায়াহ্নকালেতে রাম করিল বোধন।' সেইদিন—খেয়াল করুন—'আচারেতে আরতি করিলা অধিবাস। বান্ধিলা পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস।' পরদিন সপ্তমীতে যথাবিধি পূজা হলো, অষ্টমীর 'নিশাকালে সন্ধিপূজা কৈলা রঘুনাথ।' নবমীতে নিশি-জাগরণও হলো। অর্থাৎ, আজ যে মূল প্রথাগুলি মেনে দুর্গাপূজা হয়, তার প্রায় হুবহু বর্ণনা পেয়ে গেলাম আমরা। কিন্তু...

তৎসত্ত্বেও দেখা দিলেন না ভগবতী।

সীতার উদ্ধার অসম্ভব জেনে রাম যখন কাতর ক্রন্দন করছেন, তখন চিরবন্ধু বিভীষণই তাঁকে পরামর্শ দিলেন, 'অষ্টোত্তরশত নীল পদ্ম করো দান।' সেই দুর্লভ পুষ্প কোথায় পাওয়া যাবে—তাও বলে দিলেন তিনিই—'অবনীতে দেবীদহে নীলপদ্ম আছে।' মুহূর্তের মধ্যে হনুমান তা-ও এনে দিলেন। ততক্ষণে রামের আকুল স্তবে ভবানী বড়োই প্রীত হয়েছেন, তবু নীল পদ্মে পূজিতা হওয়ার আশায় তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন, দেখা দিলেন না। উলটে, হনুমানের এনে দেওয়া পদ্ম থেকে একটি হরণ করলেন রামকে পরীক্ষা করার জন্য।

রাম মহাবিপদে পড়ে হনুমানকে বললেন আর একটি পুষ্প এনে দিতে। হনুমান জানালেন, দেবীদহে আর একটিও নীলপদ্ম নেই। হতাশ রাম আর্ত হাহাকার করতে লাগলেন, 'করিলাম অর্চনা মা অকাল-বোধনে। তবু না হইল কৃপা মোর আরাধনে।।'

এমন সময় তাঁর সহসা মনে পড়ল, তাঁকে সকলে 'নীলকমলাক্ষ' বলে সম্বোধন করে বটে! নীল পদ্ম যখন পাওয়াই যাচ্ছে না, তখন সেই অভাব আমি পূরণ করব এইভাবেই—'এক চক্ষু দিব আমি দেবীর চরণে।' এই বলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে তূণ থেকে বাণ নিয়ে নিজের নীলবর্ণ চক্ষু উপড়ে ফেলার উপক্রম করলেন, এবং সেই মুহূর্তেই দেবী কাত্যায়নী স্বয়ং আবির্ভূতা হয়ে রামের উদ্যত হাত চেপে ধরলেন।

এর অধিকাংশ বর্ণনা, এতটা অনুপুঙ্খসমেত না-হলেও, প্রায় সমস্ত বাঙালির জানা। রামায়ণের গল্প আমাদের বাংলার হাটে-মাঠে, ধূলায়-মেলায় মিশে আছে; তার জন্য সর্বদা কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুখস্থ করার প্রয়োজন হয় না। কী করে যেন, যেন বা হাওয়ায় হাওয়ায়, ঘাসে জলে মিশে থেকে শেখা হয়েই যায় এইসব শাশ্বত গল্প। যখন শরত আসে, উঠোনে স্থলপদ্ম ফোটে, আকাশের রং বদলে যায়, আর...

আর বৃদ্ধ রেডিয়ো নিয়ে ব্রাহ্মমুহূর্তে বারান্দায় এসে বসেন সনাতনকালের এক চিরন্তন পিতামহী—কারণ একটু পরেই শুরু হবে মহালয়া।

তখনই আমাদের পুজো। রামের অকাল-বোধন এই বাংলার কবিই লিখেছিলেন। এই কারণেই তুলসীদাস এই ঘটনার উল্লেখমাত্র করেননি। চরম মুহূর্তে, একের পর এক বাণে রাবণের মস্তক স্কন্ধচ্যুত হয়েও যখন ফের স্বস্থানেই ফিরে আসছে, তখন তুলসীদাসের বিভীষণ রামকে বলে দিয়েছিলেন আসল কথাটি—রাবণের নাভিতে আছে অমৃতকুণ্ড! এই কারণেই রাবণ বারংবার প্রাণ ফিরে পাচ্ছেন। 'নাভিকুণ্ডসুধা বস যা কে। নাথ জিয়ত রাবনু বল তা কে।' শুনে রাম একবারে একত্রিশটি বাণ ধনুকে যোজনা করলেন—'খৈ চি সরাসন স্রবন লগি ছাড়ে সর একতীস।'

একেবারে গুণেগেঁথে একত্রিশ কেন? কারণ—একটি নাভিকুণ্ডে, দশটি শিরে এবং কুড়িটি হস্তে বিদ্ধ হবে যে! সেই বাণই রাবণের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল। এর জন্য রামের অকাল-বোধনের প্রয়োজন হয়নি।

কিন্তু আমাদের, বাঙালিদের হয়। তাই, বর্ষার শেষে চিরকালের বাঙালি প্রবাস থেকে ঘরে ফেরে। পুজো এসে গেল তাহলে!

না, শুধু পুজো এলেই হবে না অবশ্য। আরও একটু অভাববোধ বুঝি লেগে রইল প্রাচীন বারান্দায়। কারণ, আমাদের তার সঙ্গে আবার একটি অজর, অমর কণ্ঠের মন্দ্র মন্ত্রোচ্চারণও চাই যে! বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র!

এ কথা ভুলে গেলে ঘোর পাপ হবে—এমনকী কৃত্তিবাসও রামের অকাল-বোধনের বর্ণনা শুরু করেছিলেন একটি অনিবার্য পঙক্তি দিয়ে, যা বাঙালির সামাজিক উৎসবের ইতিহাসকেই পালটে দিয়ে গেছে চিরতরে :

'চণ্ডীপাঠ করি রাম করিলা উৎসব।
গীতনাট্য করে, জয় দেয় কপি সব।।'

সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে...
শুধু কী জানেন, বাল্মীকি বলুন, কৃত্তিবাস বলুন আর তুলসীদাসই বলুন—বড়োই খারাপ লাগে এইটে ভেবে যে—এঁরা কেউই বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ শুনতে পেলেন না!

সেতুবন্ধনম্

রামেশ্বর থেকে রামসেতুর দৃশ্য দেখে শিহরিত হননি, এমন কাউকে চেনেন? চিনলে বলবেন তো! একদিন আমিনিয়ায় নিয়ে গিয়ে ভালো করে খাইয়ে দোবো! এইসব দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহ মানুষজনের সঙ্গে আলাপ রাখলে তবু নাতিকে কিছু গল্পটল্প শোনাতে পারব বুড়ো বয়েসে।

ফিরোজা-রঙা সমুদ্রের মধ্যে এক অনন্ত উপবীতের মতো দেখতে দীর্ঘ এই রেখাটিকে দেখলে সত্যিই শিহরণ জাগে। আর অমনি মনে পড়ে যায় ছেলেবেলা থেকে শুনে-আসা দুটি কাহিনি—যা আমাদের সব্বার মুখস্থ। এক—কীভাবে তৈরি হল এই রামসেতু, আর দুই—কাঠবেড়ালিদের দেওয়া রামের সেই অক্ষয় উপহারের চিহ্ন।

জানি, আপনাদেরও প্রত্যেকেরই মনে পড়ে গেছে ঘটনাদুটিই। প্রথমে একবার মনে করে নিই সেই বিশ্ববিখ্যাত সেতুটি গড়ে ওঠার প্রসিদ্ধ ঘটনাটি, তাহলেই ওই দ্বিতীয়টা আপনিই এসে পড়বে।

সমুদ্র তো নিজেই রামের ভয়ে এসে বলে গেলেন তাঁর উপর দিয়ে সেতু বাঁধতে। রাম নিজের ধনুকের প্রান্তদেশ দিয়ে নিজেই চিহ্নিত করে দিলেন সেই স্থান, যেখান থেকে শুরু করতে হবে সেতুর নির্মাণ; তাই সেই জায়গার নাম হল ধনুষ্কোটি। বানরেরা এসে সমুদ্রে শিলা ফেলতে লাগল। কিন্তু সেই যে—ভারতচন্দ্র বলে গেছেন কোন কালে—'বানরে সঙ্গীত গায়, শিলা জলে ভেসে যায়, দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।' কাজেই বানরেরা যেমনি শিলা নিয়ে জলে ফেলতে লাগল, অমনি তা ডুবে যেতে লাগল অথই সমুদ্দুরে। শেষমেশ হনুমান পরামর্শ দিলেন, শিলাগুলোয় রামনাম লিখে দিতে। যেই না রামনাম লেখা হল, অমনি পাথর জলে ভাসতে আরম্ভ করল। সেই ভাসমান পাথরের উপর দিয়েই তৈরি হল রামসেতু।

আর একটা কথা। সেতুর উপরিতল মসৃণ করার কাজে হাত—থুড়ি—লেজ লাগাল ছোট্ট কাঠবেড়ালিও। তারা লেজ বুলিয়ে বালি ছড়িয়ে দিতে লাগল দুটি পাথরের মাঝখানে। রাম আদর করে তাদের পিঠে হাত

বুলিয়ে দিলেন, ফলে তাদের পিঠে সেই থেকেই দেখা যায় পাশাপাশি দাগ। রাম হাত বুলোনোর আগে কিন্তু অমন কোনও দাগ ছিল না।

জন্মাবধি এসব গল্প শুনে আসেনি, এমন ভারতীয় খুঁজে বের করা বেশ মুশকিলের কাজ। আর প্রথম গল্পটি তো এমনই খ্যাতিমান যে, এখন যদি ধনুষ্কোটি যান—তাহলে স্থানীয় মন্দিরে আপনি সত্যিই ভাসমান শিলা দেখতে পাবেন। আহা! অমন চোখ বড় বড় করে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকার কিচ্ছু নেই; অমন জলে-ভাসা পাথর সারা দুনিয়াতেই দেখা যায়। ওকে ইংরিজি ভাষায় 'পামিক স্টোন' বলে। জ্বলন্ত লাভা হঠাৎ করে ঠান্ডা মেরে গেলে অমন হয়, এসব নিতান্ত প্রাকৃতিক ঘটনা হেথা-হোথা আকছার ঘটে থাকে। কিন্তু ওই দ্বিতীয় গল্পটিও কিছু কম প্রচারিত নয়।

এবং, কাঁদো কাঁদো মুখে ফের একবার বলতেই হচ্ছে—এই দুটি ঘটনার একটিও বাল্মীকি-রামায়ণে নেই। রামানন্দ সাগরের রামায়ণে সেই বিখ্যাত দৃশ্য দেখে ছেলেবেলায় যতই চোখ ছানাবড়া করি না কেন, উঁটি নেই গো!

বেশ! আগে তবে দেখি, বাল্মীকি ঠিক কী বললেন সেতুবন্ধন বিষয়ে!

সত্যি বলতে কি, এমন নির্ঝঞ্ঝাট কাজ আর দুটি হয় না, বুঝলেন। এমনিতে সংস্কৃত ভাষার এক গোলমাল হল, এতে প্রায় কোনও শব্দেরই একটা অর্থ হয় না। তার উপর আদিকবি আবার ভাষার মধ্যে অসাধারণ সারল্যের সঙ্গে একাধিক স্তর নির্মাণ করতে পারতেন—সোজা কথায়, একই পঙক্তির একাধিক অর্থ (অবশ্যই আলঙ্কারিক অর্থে, নইলে যমক বা শ্লেষ অলঙ্কারে অমন হামেশা হয়!) তিনি আরাম-সে বানিয়ে ফেলতেন।

কিন্তু সেতু বাঁধতে গিয়ে যে ঘটনা ঘটল, তার বর্ণনা বাল্মীকি করেছেন প্রখর স্পষ্টতার সঙ্গে। কোনও রূপক-প্রতীকের ধার ধারেননি তিনি। সোজাসাপটা ভাষায় লিখে ফেলেছেন এক মহাবৈশ্বিক দৃশ্য।

রামের বাণের ভয়ে সাগর স্বয়ং এসে রামকে বলে গেলেন, তিনি আপন স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে রামকে পথ করে দিতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ, অন্য উপায় আছে বইকি! সুগ্রীবের গড়ে-তোলা বানরবাহিনির মধ্যেই আছেন নল। তিনি বিশ্বকর্মার পুত্র। তাঁরই প্রতিভাবলে সম্ভব হবে সমুদ্রের উপর দিয়ে সেতু বেঁধে ফেলা।

হনুমানের মতোই নলও নিজের প্রতিভা বিস্মৃত হয়েছিলেন। এখন সাগরের কথা শুনে তাঁর মনে পড়ল, পূর্বে মন্দর পর্বতে বিশ্বকর্মা তাঁর জননীকে বর দিয়েছিলেন, 'তোমার পুত্র আমারই তুল্য হবে।' *'ময়া তু সদৃশঃ পুত্রস্তব দেবি ভবিষ্যতি।'* এ অবশ্য নিছক রূপক, বোঝাই যায়। কারণ এই আত্মোপলব্ধির ঘুম-ভাঙা অনুভূতির কথা বাল্মীকি এর আগেই একবার বর্ণনা করেছেন। হনুমানের ক্ষেত্রে। মানুষ নিজের ক্ষমতা নিজে উপলব্ধি করতে পারে না প্রায়শ। তারপর যখন কেউ এসে তাকে তার নিজেরই প্রতিচ্ছবির সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়—নিজেরই বিপুল ক্ষমতার সামনে দাঁড়িয়ে তার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। সাগরের দ্বারা নলের, বা জাম্ববানের দ্বারা হনুমানের এই 'ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া' কাজটাই হয়েছিল আসলে।

তা এইসব রূপক-প্রতীকের পালা কিন্তু বাল্মীকি চুকিয়ে ফেললেন সেতু তৈরির কথা বলার আগেই। কারণ, তারপর তিনি যেভাবে বর্ণনা করে চললেন এক প্রকাণ্ড নির্মাণকাণ্ডের, তাকে বলা যায় নিতান্ত ব্যবহারিক বা কেজো ব্যাপার। এইবার রামের আদেশে বানরেরা জঙ্গলে ঢুকে কেটে আনতে লাগলেন মস্ত সব গাছ—বট-অশ্বত্থ-তাল-অশোক ইত্যাদি। সেগুলো এনে জড়ো করা হল সমুদ্রতীরে। বড় বড় পাথরের টুকরো, যাকে পর্বতের অংশের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে—'যন্ত্র' দ্বারা বহন করে আনা হল সৈকতে, *'পর্বতাংশ্চ সমুৎপাট্য যন্ত্রৈঃ পরিবহন্তি চ।'* (ইস! পড়তে পড়তে আমার সুকুমারমতি পাঠক-পাঠিকাদিগের অবিশ্বাস-জনিত বিস্ফারিত চক্ষুদ্বয়ের দীর্ঘ আঁখিপল্লবের কথা ভেবে এই অধমের মন ব্যাকুল হয়ে উঠছে...!) আজ্ঞে, ঠিকই পড়েছেন। যন্ত্র। মন্ত্র নয়। যন্ত্র—যাকে সোজা বাংলায় বলে মেশিন।

দাঁড়ান মশাই! আগেই ঘাবড়াবেন না, এখনও শেষ হয়নি। তারপর বানরেরা সেইসব প্রকাণ্ড পাথর সমুদ্রের জলে ফেলতে লাগল, ফলে জল ছিটকে উঠতে লাগল আকাশ-পানে। এদিকে কয়েকজন বানর আবার দড়ি ধরে সমুদ্রতলের উচ্চাবচ মাপতে লাগল— *'সূত্রাণ্যন্যে প্রগৃহ্নন্তি ব্যায়তং শতযোজনম্।'* ফলে দ্রুত কাজ এগোতে লাগল। প্রথম দিনে চোদ্দো যোজন, দ্বিতীয় দিনে কুড়ি, তৃতীয় দিনে একুশ এবং চতুর্থ দিনে বাইশ যোজন সেতু তৈরি হল। অবশেষে পঞ্চম দিনে তেইশ যোজন সেতু তৈরি করে লঙ্কার বেলাভূমির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল ভারতকে।

কী মনে হল, হুজুর? ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টের কাজ চলছিল, এইমাত্র শেষ হল—এবার শান্তি। তাই না?

আমি একনিষ্ঠ কবিতা-পাঠক। কাজেই জনান্তিকে জানাই, এই রুখাসুখা বর্ণনা পড়ে প্রথমবার বেশ হতাশ হয়েছিলাম। ওই যে বললাম—কেজো মনে হয়েছিল ভাষাটা, বর্ণনাভঙ্গিটা। তারপরেই অবিশ্যি আমাকে আমূল চমকে দিয়ে বাল্মীকি লিখে ফেললেন এই পঙক্তিটি— *'অশোভত সহান সেতুঃ সীমন্ত ইব সাগরে।'* সেই সেতু যেন সাগরের মাথার সীমন্তরেখার মতো—সিঁথির মতো শোভা পেতে লাগল।

বুঝতে অসুবিধে হয় না, কেন এই মানুষটিকে আদিকবির সম্মান দেওয়া হয়।

সে যাক। কিন্তু এই নাকি সেতুবন্ধন! অ্যাঁ! কাঠ-বাঁশ-গাছের গুঁড়ি দিয়ে কাঠামো বানিয়ে, তার উপর দিয়ে পাথর ফেলে বানানো ব্রিজ!! ছ্যা ছ্যা!!! এই নিয়ে এত মাতামাতি? এ জিনিস তো এখনও আকছার গাঁয়ের লোকজন বিলের মধ্যে বানিয়ে থাকে। অগভীর জলে, যেখানে নৌ-চলাচলের প্রশ্ন নেই—সেখানে এইভাবে চট করে বানিয়ে-নেওয়া সেতুই সবচাইতে নির্ভরযোগ্য পারাপারের মাধ্যম। আজও। আর বাল্মীকি কিনা...ছিঃ!

তাহলে আমাদের রামনামের মহিমা কে রক্ষা করবেন?

চলুন, শ্রীরামচালীতে একবার খানাতল্লাশি চালানো যাক। কৃত্তিবাস ওঝা কোন ভূত ঝাড়েন, সেটাও দেখে নিই। ভারি আকর্ষণীয় হতে চলেছে কিন্তু সেই তল্লাশির ফল।

এখানেও রামের ভয়ে সাগর দেহধারণ করে জল থেকে উঠে এলেন বটে, কিন্তু যা বললেন, তা মোটেই বাল্মীকি-রচিত রামায়ণের কথা নয়। তাঁর মতে, রামের সেনার মধ্যেই বিশ্বকর্মা-পুত্র নল আছেন। ইনি রামের হিতের জন্যই মুনির কাছ থেকে বর পেয়েছেন। জহ্নু মুনি নলকে শৈশবে পালন করেছিলেন। প্রত্যেকদিনই তিনি দণ্ড-কমণ্ডলু জলে বিসর্জন দিয়ে আসতেন। তখন মুনি ধ্যানযোগে জানতে পারলেন, বিষ্ণু স্বয়ং রাম-অবতার ধারণ করবেন। তাঁর কাজে লাগবে বলেই তিনি নলকে বর দিয়েছিলেন, তাঁর স্পর্শে পাথর জলে ভাসবে—'নলস্পর্শে সলিলেতে ভাসিবে পাষাণ।'

শুনে রাম নলকে ডেকে তাঁকে সাগরের উপর সেতু বানাতে বললেন। এবার কিন্তু নল সম্পূর্ণ অন্য এক কাহিনি বললেন।

মানস সরোবরে ব্রহ্মা ছিপ-কুশী নিয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করতে আসতেন। সেই কোশাকুশী নল রোজ জলে ফেলে দিতেন। নিজের ছিপ-কুশী বাঁচানোর তাগিদেই নাকি ব্রহ্মা নলকে বর দিয়েছিলেন, তাঁর হাতের ছোঁয়া লাগলে পাথরও জলে ডুববে না।

যাই হোক, কার্যকালে কিন্তু নল শুধু জলে-ভাসা পাথরের ভরসায় থাকলেন না। সমুদ্রের তীরে যে নলখাগড়ার বন ছিল, তা-ই জলে ভাসানো হল প্রথমে। তার উপরে চাপানো হল গাছ, তার উপরে পাথর। বানরেরা গাছ, পাথর ইত্যাদি বয়ে আনতে লাগল, নল বসে সেতু বানাতে লাগলেন।

দেখা যাচ্ছে, রামনামের মাহাত্ম্যে নয়, নলের করস্পর্শেই পাথর জলে ভাসে! তবুও তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। নলখাগড়া যে জলে ভাসে—সেই প্রাকৃতিক তথ্যকে কাজে লাগিয়েই তিনি সেতুর ভিত বানিয়ে নিচ্ছেন আগে। তারপর আসছে তার উপর গাছ-পাথর চাপানোর কথা! আশ্চর্য! ঘোর আশ্চর্য!!

কিন্তু ইয়ে, আমাদের সেই কাঠবেড়ালি? সে গেল কোথায়?

আছে, আছে। বাল্মীকি ঠাঁই না দিলেও কৃত্তিবাস তাকে ভোলেননি।

অন্তত দুবার রামকে সেতুবন্ধন কার্যে ভুল-বোঝাবুঝি মিটিয়ে দেওয়ার জন্য হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। একবার হনুমান ও নলের মধ্যে একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠতে যাচ্ছিল—সেইটে মিটিয়ে দিতে। অন্যটা এই কাঠবেড়ালিদের জন্য। প্রথমটার কথাও অবশ্য বাল্মীকি লেখেননি। কাঠবেড়ালিদের ব্যাপারটাও কৃত্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত। কাজেই একে একে দুটোই বলা যাক।

প্রথম গল্পটা কৃত্তিবাসের অনবদ্য মনুষ্যচরিত্র নিরীক্ষণের প্রমাণ।

অন্যান্য বানরদের সঙ্গে হনুমানও পাথর বয়ে আনছিলেন সেতু বাঁধার জন্য। তিনি লক্ষ করলেন, তাঁর আনা সমস্ত পাথরই নল বাঁ-হাতে ধরছেন। এ তো ভারি অপমানজনক ব্যাপার! হনুমানের মাথা বেজায় গরম হয়ে গেল; তিনি ঠিক করলেন—এমন প্রকাণ্ড এক পাথর নিয়ে আসবেন, যার নিচে নল চাপা পড়ে যাবেন। তবে নলের শিষ্টাচারের শিক্ষা হবে।

হঠাৎ করে হনুমানকে অমন প্রকাণ্ড একটা পাথর—কৃত্তিবাসের ভাষায় 'পর্বত'—নিয়ে তাঁর দিকে উড়ে আসতে দেখে নল বুঝতে পারলেন, তাঁর এই বাঁ-হাতে পাথর নেওয়ার অভ্যেসই হনুমানকে রাগিয়ে দিয়েছে। পাথর-চাপা পড়ে মরার ভয়ে তিনি ছুটে গেলেন রামের কাছে। সোজাসুজি আত্মসমর্পণ করে বললেন, 'হনুমান আনে গিরি/ বাম হাতে আমি ধরি/ কর্মীর স্বভাব রঘুনাথ।' 'কর্মী' শব্দটা এখানে কৃত্তিবাস যে অর্থে ব্যবহার করলেন, আজ তাকে আমরা 'রাজমিস্ত্রি' বলে জানি। শেষমেশ রাম হনুমানের পথরোধ করে দাঁড়ালেন, এবং বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দুজনের ভুল-বোঝাবুঝি মিটিয়ে দিলেন।

এই অকিঞ্চিকর, এবং কিছুটা অপ্রয়োজনীয় গল্পটি বুঝিয়ে দেয়, কৃত্তিবাস সেই বিশিষ্ট চক্ষুর মালিক ছিলেন, যা কোনও কিছুকেই অপ্রয়োজনীয় বলে উপেক্ষা করে না। রাজমিস্ত্রি-মাত্রেই যে অভ্যাসবশত বাঁ-হাতেই সাহায্যকারীর (গোদা বাংলায় যাদের 'জোগাড়ে' বলে) এগিয়ে-দেওয়া ইটটা নেবে, তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। এইখানে এসে সেই বৈশিষ্ট্যটুকুই খাসা একটি গল্পের কাজে লেগে গেল!

আর অন্য গল্পটা হল সেই কাঠবেড়ালির গল্প। এখানেও হনুমানের একটু অংশ আছে।

সেতু তৈরির কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এল কাঠবেড়ালিরাও। তারা সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে সারা গায়ে বালি মেখে নিতে লাগল, তারপর উঠে এসে তা পাথরের ফাঁকে ঝেড়ে ফেলতে লাগল। ফলে 'ফাঁক যত ছিল তাহা মারিল বিড়ালে'—দুটি পাথরের মাঝখানের যে ফাঁকা জায়গা, তা তারা বালি দিয়ে ভরাট করতে লাগল।

হনুমান এসব বুঝতে না-পেরে সেতুর উপরে কাঠবেড়ালি দেখলেই টান মেরে জলে ফেলে দিতে লাগলেন। বিপন্ন বেচারারা ছুটল সেই রামের কাছেই। নালিশ শুনে রাম ডেকে পাঠালেন হনুমানকে; তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, এমন অন্যায় কাজ তিনি যেন আর না-করেন। হনুমান তো সে কথা অন্য বানরদেরও বলে দিলেন। কাজ চলল মিলে-মিশে। আর রাম ভারি খুশি হয়ে কাঠবেড়ালির পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন।

বেশ। কিন্তু পিঠের সেই দাগের ব্যাপারটা?

নাঃ, সে দাগ কৃত্তিবাসও অঙ্কন করেননি—দেখাই যাচ্ছে।

আচ্ছা, তুলসীদাস কি এ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে পারেন? চলুন, চট করে দেখে নিই একবার। সত্যিই 'চট করে', কারণ তুলসীদাস বড়োই কম কথায় সেরে ফেলেছেন এই দৃশ্যটির বর্ণনা।

সাগরের কাছ থেকে সেতু তৈরির পরামর্শ শুনে রাম ডাক দিলেন নল আর নীলকে। তাঁরা এসে দায়িত্ব নিলেন, এবং ঝড়ের বেগে সেতু বানাতে আরম্ভ করে দিলেন; কারণ রামের মহিমায় শিলা জলে ভাসতে লাগল। তুলসী শুধু একবার আমাদের মতো মূঢ়মতি পাঠকদের সতর্ক করে দিয়েছেন, আমরা যেন ভুলেও এ কথা না-ভাবি—এই কৃতিত্ব সাগর, পাথর বা বানরের। সব কৃতিত্বই রামের। 'মহিমা ইয়ে ন জলধিকে বরনী। পাহন গুণ ন কপিনহকে করনী।' সেই যে ওয়াশিংটন মেমোরিয়ালের মাথায় লেখা আছে 'LAUS DEO'—এটা লাতিন শব্দবন্ধ। সোজা বাংলায়—সকল প্রশংসাই ঈশ্বরের প্রাপ্য। মনে থাকবে? আর কারোর নয়, হ্যাঁ?

তা নাহয় মনে রাখলাম। কিন্তু সেই রামনাম লিখে পাথর জলে ফেলার দৃশ্যটা গেল কোথায়? সে যে দেখছি কারোরই লিখে রাখতে মনে নেই!

উহুঁ! সত্যিই কারোরই মনে নেই। অমন কিছু কোত্থাও লেখা নেই। বাল্মীকি ব্যাপারটাকে একেবারে সোজাসাপ্টা ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন, এবং কেমন যেন মনে হয়, এর পিছনে খানিক সত্যতা—আজ্ঞে আমি ঐতিহাসিক বাস্তবতার কথাই বলছি সজ্ঞানে—আছে! আজ গুগল ম্যাপ খুললেই বোঝা যায়, সমুদ্রের এই অংশের গভীরতা সত্যিই অসম্ভব কম। আমাদের কাছে যা রামসেতু, বহির্বিশ্বে যার পরিচয় 'অ্যাডামস ব্রিজ'—একটি নিছক প্রাকৃতিক ব্যাপার। খুব সাম্প্রতিককালেও এটি প্রায় সর্বাংশে রীতিমতো পদব্রজে যাতায়াতের যোগ্য ছিল। সম্ভবত এটি একটি ক্ষীণ সূত্র, যা পূর্বে ভারত ও শ্রীলঙ্কাকে জুড়ে রেখেছিল। কারোর মতে, তা পরে জলে তলিয়ে যায়; কেউ বলেন, সমুদ্রতল উত্থিত হয়ে এই অংশটি গড়ে উঠেছে—মোদ্দা কথা—নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা যায় না। আমাদের সেই প্রাচীন পূর্বপুরুষদের নির্ঘাত পথটা জানা ছিল। কাজেই এটুকু বোঝা যায়, বাল্মীকি যে আসমানি কোনও পরিকল্পনা না-করে গাছের কাঠামোর উপর পাথর ফেলে সেতু গড়ে-তোলার কেজো এবং বাস্তব বর্ণনাটা দিতে পেরেছেন—তার কারণ, তিনি এই ভৌগোলিক সত্যটি জানতেন। সমুদ্রের গভীরতা এখানে যে নিতান্ত কম, এই সারসত্যটুকু জানা থাকার ফলেই তাঁর পরিকল্পনা এমন সাদামাটা। বেশি কল্পনাশক্তি খাটানোর দরকারই বোধ করেননি তিনি।

অন্যদিকে কৃত্তিবাস সমুদ্রকে অতল বলে জানবেন, সেটাই স্বাভাবিক। ততদিনে সমুদ্রের জ্ঞান বা স্মৃতি আর অবশিষ্ট নেই; আমরা জাতপাতের গভীর তর্জা নিয়ে বেজায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়েছে, ও জ্ঞান দিয়ে হবেই বা কী! কাজেই অতল সমুদ্দুরে কৃত্তিবাস নলখাগড়া ভাসিয়ে দিলেন, তার উপর গাছ-পাথর চাপিয়ে তৈরি করে দিলেন রামের সেতু। এবারেও পরিকল্পনা রীতিমতো স্বাভাবিক। রামনামের, বা ব্যক্তি রামের ঐশী প্রভাবের দরকার পড়ছে না এক্ষেত্রেও।

আর তুলসীদাসের এসব ভাবনাচিন্তারই দরকার হয় না। রাম আছেন, তাঁর এখন প্রয়োজন—তাই শিলা জলে ভাসে। এর অধিক যুক্তির প্রয়োজন হয় না তাঁর। রামের নাম লিখলে তবে শিলা জলে ভাসবে—এটুকুতেও তাঁর কাছে রামের অপমান হয়। কাজেই তিনিও রামনাম লেখার গল্পটি লিখলেন না।

এই সেই মহান উত্তরাধিকার—যার কথা আমরা আগের লেখাতেই বলাবলি করছিলাম। লিখিত নয়। মৌখিক। এসব কাহিনি এমনভাবেই মিশে আছে আমাদের অন্তর্গত সত্তার ভিতরে যে, সত্যাসত্য বিচারের কোনও প্রয়োজনই নেই আমাদের! আর এটুকুও মানতে আমরা বাধ্য, কোনও কল্পনা যদি কারোর ক্ষতি না-করে, তাহলে তার সত্যাসত্য বিচারে কাজ নেই, কী বলেন?

তবে কী, ছেলেমেয়েকে রামায়ণের গল্প শোনানোর সময় একটু খেয়াল রাখবেন যে, এই রামনাম লিখলে তবে শিলা জলে ভাসে, কিংবা সেই ভাসমান সেতু পেরিয়েই রাম তাঁর বানরসেনা নিয়ে লঙ্কায় গিয়েছিলেন—এসব গল্প অন্তত বাল্মীকি-রামায়ণে নেই। ব্যস।

হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন

কথকতা জিনিসটা ক্রমে উঠে যাচ্ছে, বুঝলেন। লোকজন মোটে শুনতে চায় না, কেবলই বলতে চায়—সেই কারণেই বোধহয়। আর আমার কথা বলতে নার্ভাস লাগে বলেই বোধহয় কথকতা শুনতে বেজায় ভালো লাগত ছোটবেলা থেকে। সেই যে নাটমন্দির—যার কথা আগেরদিন বলছিলাম, সেইখানে কত যে শুনেছি!

কিন্তু আজ যে কথাটা বলব, সেটা শুনেছিলাম বসিরহাটে। চেনেন বসিরহাট? গিয়েছেন কখনও? যেমন সুন্দর সাজানো শহর, তেমনি সুন্দর যশোরের টানে কথা বলে সেখানকার অধিকাংশ মানুষ।

উহুঁ! বলতেন। আজকাল আমরা ভদ্র হয়ে যাচ্ছি, শিক্ষিত হয়ে যাচ্ছি। উপভাষার কথ্য টানে ভারি লজ্জা হয় আমাদের। নতুন প্রজন্ম তাই সাধারণত সচেতনভাবেই এসব এড়িয়ে চলে। আমার ঢাকাইয়া টান আর বন্ধু ওঙ্কারের (ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য—বিখ্যাত চিত্রশিল্পী) হাওড়ার টান যে কতটা অনিবার্যভাবে আলাদা, তা বোধহয় আমাদের ছেলেমেয়েরা জানবে না।

Zaউক গা।

তা গিয়েছি বসিরহাটে, গানের অনুষ্ঠান করতে, আমি আর আমার এক বন্ধু। আমরা গাই বাংলা গান। কাজেই রাত এগারোটার মধ্যেই আমাদের ছুটি। এবার সারারাত ধরে হিন্দি গান হবে। অন্যদিন আমরা খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকিয়ে গাড়িতেই শুয়ে নিই। সেদিন পারলাম না। কারণ—সেই শরতের পূর্ণিমার রাতে, ইচ্ছামতী নদীর বুকে যখন মুহূর্তে মুহূর্তে তৈরি হতে থাকে জল আর জ্যোৎস্নার যাদুক্ষণ, মাঝরাত্তিরে নদী আর চাঁদ যখন অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে আর নিরুচ্চারে গল্প করে—তখন ঘুম আসতে চায় না কোনও তরুণেরই।

কাজেই খানিক ব্যর্থ চেষ্টার পর নদীর পাড় দিয়ে, সেই বর্ণনাতীত সৌন্দর্য দেখতে দেখতে, হাঁটতে হাঁটতে আমরা পৌঁছে গেলাম একটা বাজার ধরনের এলাকায়। মধ্যরাতে দোকান-বাজার সব স্বভাবতই বন্ধ। তার

জায়গায় চলছে 'সারারাত্রি-ব্যাপি এক বিশাল ধর্মীয় অনুষ্ঠান...' ; বাইরেই মস্ত পোস্টার টাঙানো আছে। আমরা দুজন যখন এই জায়গাটা পেরচ্ছি, তখন যে অংশটা কানে এল, লেখার চেষ্টা করছি ; কদ্দূর ওৎরাবে—জানি না।

'ত্যাকন হনুমানের তো সাগর দেইখে চোখ তালগাসে উইটে গেসে। সে যে বিশাল বড়! কিন্তু হনুমান ছাড়ার পাত্তর নয়। ন্যাজটারে ঘুইটকে ঘুইটকে নিজির দেহটারে ইয়্যাত্ত বড় কইরে মেইরেস নাপ— একেবারে সেএএএই অশোকবনে গিয়ে মা-সীতার পায়ের কাছে ভ্যাত্তর দিয়ে পইড়সে।'

হে আমার সুশিক্ষিত সুশীল পাঠক, কিছু কি বুঝলেন? ধরে নিচ্ছি, পুরোটা নয়। সে আমারই অক্ষমতা। কারণ, এই কথ্য ভাষাকে হরফে তর্জমা করার মতো যথেষ্ট ভাষাজ্ঞান আমার নেই। আর আপনিও তো আমার মতোই 'ভদ্র' হয়ে গিয়েছেন, না? এই প্রাকৃতজনের মৌখিক ভাষা আপনার জানার কথাও নয়।

কিন্তু মুশকিল হল, ঠিক এইরকম নানাবিধ অশিষ্ট ভাষাতেই আমাদের সাধের বঙ্গদেশের বারো-আনা মানুষ কথা কয়। ঠিক এইরকম অমার্জিত ভঙ্গিতেই তারা দেশময় ছড়িয়ে দেয় পুণ্য রামকথা, তাতে মিশে থাকে হরেকরকম 'আপন মনের মাধুরী।' তাতে খোদ রাজা রাম যদি কোনওকালে আপত্তি না জানান, আমরা জনা-কয় লোক ইশকুল-কলেজে পড়ে আর কীই-বা পারব?

কিন্তু কথাটা হল, হনুমান নাহয় ন্যাজটাকে পাকিয়ে পাকিয়েই শরীরটাকে মস্ত বড়ো করে সমুদ্দুর টপকালেন। সীতার পায়ের কাছে 'ভ্যাত্তর' দিয়েই (এর কাছাকাছি শব্দবন্ধ বোধহয় 'ধপাস করে' ; কিন্তু সেটাও তো ঠিক প্রবন্ধের মান্য ভাষা হচ্ছে না, তাই না? বক্ষ্যমাণ, প্রতীত্যসমুৎপাদ, ঋদ্ধতা, কিংবা সাতাশির জায়গায় সপ্তাশীতি না-লিখলে আর কী ছাতার প্রবন্ধ লিখলাম!) পড়লেন গিয়ে সেই অশোকবনে। তাতে ক্ষতিটা কী? তাঁর একশো যোজন লম্ফ দেওয়ার ক্ষমতা ছিল, অন্যদের ছিল না বলেই তো বজরঙ্গবলি হিসাবে তিনি সারা ভারতে পূজিত! নাকি?

সে তো বটেই। তা তো ঠিকই। ঝাড়খণ্ড-বিহার-উত্তরপ্রদেশে যান, যে-কোনও বুনো গাঁয়ে পর্যন্ত একটা লম্বা ডাণ্ডার মাথায় বাঁধা লাল নিশান দেখতে পাবেনই পাবেন। ওর নাম হনুমান-ধ্বজা। ঘন বনের মধ্যে হামেশাই এই ধ্বজা মনুষ্যবসতির দিকচিহ্ন-স্বরূপ।

কিন্তু মজার কথা হল, হনুমান—পরবর্তীকালে যাঁর বীরত্বের প্রাবাদিক খ্যাতি খোদ রাবণদমন রামকেও ছাপিয়ে যাবে—তিনি কিন্তু নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন! আমি শুধু একশো যোজন লম্ফের কথাই বলছি না কিন্তু! পরবর্তীতে ইনি যা যা আশ্চর্য সব কাণ্ড ঘটাচ্ছেন—তার একটা বিচিত্র উপক্রমণিকা আছে, যা আমাদের আজকের পাঠকদের পক্ষে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন তাৎপর্য বয়ে আনতে পারে। একটু বলি সেই কথা, কারণ মহাকাব্য-পুরাণাদি আসলে তো লেখাই হয় যুগে যুগে নতুন করে পড়া হবে, নব নব ব্যাখ্যায় নবীন হয়ে উঠবে বলেই, তাই না?

আচ্ছা, গোড়াতেই একটা কথা কয়ে রাখি। কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে হনুমান সম্পর্কে আমাদের যে গড়পড়তা ধারণাটা তৈরি হয়, তাতে হাস্যরসের মিশেল আছে ষোলো আনা। দুঃখের বিষয়, বাল্মীকি-রামায়ণে এর এক আনাও খুঁজে পাবেন না। এখানে হনুমান আদ্যোপান্ত সিরিয়াস, কেজো এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান এক চরিত্র। এঁর সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের যখন প্রথম দেখা হয়, তখন হনুমানের বাগবৈদগ্ধে রাম মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন—ঋক-সাম-যজু—তিন বেদের উপর পূর্ণ অধিকার না থাকলে এমনভাবে কথাই বলা যায় না! *'নানৃগ্বেদবিনীতস্য নাযজুর্বেদধারিণঃ। না সামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্।'* বুঝুন! এ হেন চরিত্রকে কৃত্তিবাস কিনা কমিক রিলিফ বানিয়ে ছেড়েছেন! আহা রে!

এখন কাজের কথাটা হল, হনুমান তো অন্যান্য বানরবীরদের মতোই সীতার সন্ধানে বেরিয়েছেন। রাম বুদ্ধিমান ; তিনি পূর্বেই বুঝেছিলেন, সীতাকে খুঁজে বের করার সম্ভাবনা হনুমানেরই সবচাইতে বেশি। এঁরা রওনা দেওয়ার আগেই তাই তিনি তাঁর হাতেই তুলে দিয়েছিলেন নিজের চিহ্ন—আঙুলের আংটি—সীতা যা দেখলে নিশ্চিত হতে পারবেন, এ ব্যক্তি রামেরই দূত।

সুগ্রীব অবশ্যই একটি মাত্র দল পাঠাননি! চারদিকেই গিয়েছিল সবাই। এই দলটি গিয়েছিল দক্ষিণে। একেবারে বাছাই-করা যোদ্ধাদের দল এটি; হনুমান ছাড়াও এই দলে ছিলেন স্বয়ং যুবরাজ অঙ্গদ, জাম্বুবান, নীল, সুষেণ, গজ, গবাক্ষ—এক কথায় শ্রেষ্ঠ বীরেদের বেছে নিয়েছিলেন সুগ্রীব। অন্য দলগুলি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেও এই দলটি দক্ষিণ-সাগর-কূলে পৌঁছে সম্পাতির কাছ থেকে সীতার সংবাদ জোগাড় করে ফেলল। কিন্তু তারপরেই এল মহা সমস্যা। এইবার সামনে একশো যোজন সমুদ্র। এ কী করে পার হওয়া যাবে?

আচ্ছা, এখানে আমাদের মনে একটা খটকা লাগতে বাধ্য। আদিকাণ্ডেই আমরা পড়েছি, রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে বিশ্বামিত্র সরযূ পেরচ্ছেন, গুহ তাঁদের নিয়ে গঙ্গা পার হচ্ছেন—তার মানে ব্যাপারটা মোটেই এমন নয় যে, এঁদের কাছে জলযান ব্যাপারটাই অচেনা! না, তা অবিশ্যি নয়। কিন্তু সাদা চোখে এটুকু বুঝতে তাঁদের মোটেই অসুবিধা হয়নি—গঙ্গা পার হওয়ার নৌকো এক বস্তু, আর সমুদ্রগামী বহিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা থাকলে, পরে সসৈন্যে এই জায়গায় এসে রাম সেতুর পরিকল্পনা না করে জাহাজ বানানোর আদেশ দিতেন। ঠিক কিনা?

যাই হোক, একে একে বানরেরা বলতে লাগলেন—তাঁরা এক লাফে কতদূর যেতে পারবেন। গজ বললেন, তিনি দশ যোজন এক লাফে পার হতে পারেন। গবাক্ষ পারেন কুড়ি যোজন। শরভ তিরিশ। জাম্বুবান বললেন, যৌবনে তিনি ত্রিলোক প্রদক্ষিণ করতে পারতেন; এখন এই বৃদ্ধ বয়েসেও নব্বই যোজন তিনি পেরতে পারবেন অনায়াসে। অঙ্গদ জানালেন, একশো যোজন পার হয়ে লঙ্কায় তিনি পৌঁছতে পারবেন বটে, কিন্তু তারপরে তাঁর আর ফিরে আসার শক্তি থাকবে কিনা—তা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারলেন না। মোদ্দা, কাজ সম্পন্ন করা কারুর ক্ষমতাতেই কুলোচ্ছিল না।

শেষমেশ জাম্বুবান তাকালেন হনুমানের দিকে। তাঁকে বললেন, 'তুমি বাছা সাড়াশব্দ দিচ্ছ না কেন, শুনি? আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে বড় বীর যে তুমিই—তা কি নিজে ভুলে মেরে দিয়েছ? তুমি সুগ্রীবের সমান বলবান, রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে কোনও অংশে কম নও তুমি!'

এইবার জাম্বুবান সকলকে বললেন, এককালে পুঞ্জিকস্থলা নামে এক অপ্সরা ছিলেন। ঋষির অভিশাপে তিনি অঞ্জনা নাম নিয়ে বানরী হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন অঞ্জনাকে 'মনুষ্যবেশে' দেখতে পেয়ে বায়ু বা পবনদেব মুগ্ধ হয়ে তাঁর বসন হরণ করেন, এবং 'মনে মনে' উপগত হন—*মনসাস্মি গতো যত্বাং!* এরই ফলে হনুমানের জন্ম হয়। জন্মমাত্রে হনুমান সূর্যকে ফল ভেবে গ্রাস করার জন্য মহাবেগে উড়ে যাচ্ছিলেন। ইন্দ্র তা দেখতে পেয়ে তাঁর উপরে বজ্রাঘাত করেন। ফলে হনুমান মৃত অবস্থায় পর্বতের চূড়ায় পড়ে যান।

ছেলেকে বিনা-দোষে এইভাবে জন্মমাত্র মৃত্যুবরণ করতে দেখে পবন প্রবাহিত হওয়াই বন্ধ করে দিলেন। বিপাকে পড়ে দেবতারা পবনকে অনেক স্তবস্তুতি করে সন্তুষ্ট করলেন। হনুমান মেলাই বর-টর পেয়ে গেলেন তপস্যা না করেই; ব্রহ্মা বর দিলেন যে, যুদ্ধে অস্ত্রাঘাতে তাঁর মৃত্যু হবে না। ইন্দ্র বর দিলেন, তাঁর স্বেচ্ছামৃত্যু হবে—ইত্যাদি।

সব বলে-টলে জাম্বুবান বললেন, 'তাহলে বাপু, সাক্ষাৎ পবনপুত্র হয়েও, মহাবলের অধিকারী হয়েও এখন এই দরকারের সময় তুমি চুপটি করে বসে আছ কেন, শুনি? প্রাণ বাঁচাও আমাদের, আর উদ্ধার করো সীতাকে!'

এতক্ষণ যে হনুমানকে আমরা প্রধানত বাকপটু এবং ঠান্ডা মাথার মানুষ হিসেবেই দেখে এসেছি—তাঁর মধ্যে এই কথাগুলো শুনে এক আশ্চর্য ভাবান্তর হল। ক্রমে তাঁর দেহ বর্ধিত হতে লাগল। লাঙুল আস্ফালন করতে লাগলেন তিনি (এইবার নিশ্চয়ই সেই 'অশিক্ষিত' কথক-ঠাকুরের কথাটা মনে পড়ে আর হাসি পাচ্ছে না, না?)—যেন এই কথাগুলো শুনেই তাঁর এক জন্মান্তর ঘটে গেছে! বানরদের মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন,'বায়ুর পুত্র আমি। মেরুপর্বতকেও আমি হাজারবার লঙ্ঘন করতে পারি বিশ্রাম না-নিয়েই। মেঘ ছিন্নভিন্ন করে, পর্বত কম্পিত করে উড়ে যাব আমি। একমাত্র পবন স্বয়ং, এবং বৈনতেয় (মানে বিনতার পুত্র

আর কি) গরুড় ছাড়া এ বিষয়ে কেউই আমার সমকক্ষ নয়। অক্লেশে আমি উড়ে যেতে পারি দশ হাজার যোজন। বানরেরা! তোমরা এবার দ্যাখো! আমি হয় সীতার সংবাদ নিয়ে আসব, নয় রাবণকেই বেঁধে আনব।'—এই বলে...

এই বলে তিনি কী করেছিলেন, তা আমরা সবাই জানি। বাল্মীকি সেই সমুদ্র-লঙ্ঘনের যেমন ছবি এঁকে গিয়েছেন, তার সত্যিই তুলনা হয় না; এবং তেমন মহাবৈশ্বিক ঐশী কল্পনাশক্তি এবং প্রকাশক্ষমতা না-থাকলে যে কেউ কোনও ভাষার আদিকবি হিসেবে পূজিত হয় না—যতবার এই বর্ণনা পড়ি, ততবারই সে-কথা নতুন করে বুঝতে পারি। মহেন্দ্র পর্বতের চূড়া থেকে হনুমানের যাত্রারম্ভ, এবং আকাশপথে সমুদ্রের উপর দিয়ে হনুমানের গমন করার সেই দৃশ্য বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ; এবং, কী আর বলি—ম্যাজিক রিয়ালিজম বা সুর-রিয়ালিজমের আগেও যে সাহিত্য ছিল—তা এসব না-পড়লে বিশ্বাস হবে না মশাই! সত্যি বললাম!

কথা সেটা নয়। আমাদের যা বেশ বিস্মিত করে, তা হল হনুমানের এই অভূতপূর্ব রূপান্তর—একটু আগেও যার জন্য বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলাম না আমরা। কখন যে বাকপটুত্বের স্থান নিল শারীরিক সক্ষমতা—তা আমরা লক্ষ্যই করিনি! অথচ বাল্মীকি সহসা সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করে, প্রস্তুতির তোয়াক্কা না-করেই অতর্কিতে আমাদের তুলে দিলেন মহেন্দ্র পর্বতের উপরে, যেখান থেকে একটু পরেই ভীমবেগে আকাশে উল্লম্ফন করবেন হনুমান!

আচ্ছা, এ বাবদে যেটুকু কথা বাকি রইল, তা নাহয় পরেই আলোচনা করা যাবে 'খন। এইবার চটপট একবার ঝালিয়ে নিই—দুই অনুবাদক এ বিষয়ে কী বক্তব্য রাখলেন।

আগেভাগে বলে রাখি, এ যাত্রায় বাপু আমরা বয়সে ছোট তুলসীদাসকেই আগে রাখছি—কারণ তিনি এ ব্যাপারে প্রায় কিছুই বলেননি। আগেও বলেছি—তুলসীদাস যতটা কবি, তার চেয়ে ঢের বেশি করে ভক্ত। তাঁর কাব্যরচনার কারণই তাঁর ভক্তি। ফলে হনুমানের শক্তিবৃদ্ধির জন্য তাঁর কোনও পূর্বকথনের প্রয়োজন হয় না। একটুখানি রামনাম হলেই হনুমান সাগর পেরিয়ে গিয়ে সীতার সকল সংবাদ নিয়ে আসতে পারেন। রামকার্য সাধন করার চেয়ে বড় কোনও প্রেরণা বা প্রণোদনা পবনপুত্র বা তুলসীদাস—কারুরই লাগে না।

এই কারণেই রামচরিতমানস কাব্যে এই বৃহৎ কথোপকথনের প্রায় সবটাই পরিত্যক্ত হয়েছে। জাম্বুবান হনুমানকে তাঁর পিতৃপরিচয় মনে করিয়ে দিতেই হনুমান খুশি হয়ে পাশের পাহাড়টিতে উঠে পড়লেন, এবং জাম্বুবানের আদেশ অনুসারে শুধু সীতার সংবাদটুকু নিয়ে আসার জন্য লঙ্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সমস্ত কাজ মিটে গেল ভালোয় ভালোয়; কারণ জাম্বুবান বলেই দিয়েছেন হনুমান পৃথিবীতে অবতীর্ণই হয়েছেন রামের সাহায্য হবে বলে—'রামকাজ লাগি তব অবতারা।'

কিন্তু কৃত্তিবাস এই অসামান্য মুহূর্তটিকে বাংলা ভাষায় অনবদ্য চিত্রায়ণ দান করেই দায়িত্ব শেষ করেননি। আরও এমন কিছু উপাদান যোগ করেছেন—যা অভ্রান্তভাবে শুধু তাঁর নয়—আমাদেরও মানসভুবনকে চিনিয়ে দেয়।

কীরকম? আসুন, কাছ থেকে দেখি।

এই অংশের বর্ণনায় কৃত্তিবাস যে অসাধ্যসাধন করেছেন, তা ফের একবার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নিতে যে-কোনও পাঠকই বাধ্য হবেন। সংস্কৃত ভাষায় এমন এক ধরনের ওজস্বিতা আছে, যার ফলে যে-কোনও বীররসাত্মক বা রৌদ্ররসাত্মক বিষয়ের বর্ণনা অসম্ভব দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। আবার ওই ওজস্বিতার কারণেই এই ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী সৃষ্টি হওয়া প্রায় অসম্ভব; তা প্রায় নিশ্চিতভাবেই 'গীতগোবিন্দম'-এ পরিণত হবে। বাহ্যত এক হলেও এ দুই যে কতখানি পৃথক—তা অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই মরমে উপলব্ধি করেছেন।

আবার সেই একইভাবে, বাংলাভাষায় ওই দুই রস সৃষ্টি করা অতিশয় দুরূহ কর্ম। মাইকেল এই কারণেই পয়ার-ত্রিপদীর হাত ছেড়ে অমিত্রাক্ষরের হাত ধরেছিলেন; এবং একে 'ব্ল্যাংক ভার্স' হিসাবে মহানন্দে প্রচার করেছিলেন। আমরাও বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছিলাম—অধিকাংশ সংস্কৃত ছন্দেই অন্ত্যমিল নেই; সেই

অনুষ্টুপেও নেই—যা পুরাণ ও মহাকাব্যের নিরানব্বই শতাংশ স্থান জুড়ে রাজত্ব করছে। তাছাড়া মাইকেল দ্বিতীয় উপায় হিসাবে অসংখ্য তৎসম শব্দ ব্যবহার করে একটি 'প্রায়-সংস্কৃত' ভাষাও তৈরি করে নিয়েছিলেন।

বিপরীতে কৃত্তিবাস কিন্তু লিখেছেন খাঁটি বাংলা। ফলে এমন দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া তাঁর পক্ষে দ্বিগুণ কঠিন—যেখানে জাম্বুবান তেজসঞ্চার করছেন হনুমানের অন্তরে, এবং হনুমান সোৎসাহে উঠে দাঁড়িয়ে স্পর্ধা প্রকাশ করছেন হয়তো জীবনে প্রথমবারের জন্য।

কিন্তু অবিশ্বাস্য সাফল্যের উদাহরণ তৈরি করেছেন এক্ষেত্রে কৃত্তিবাস। খুব বেশি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার না-করে, অন্ত্যমিলের অতি সামান্য হেরফের ঘটিয়েই তিনি জাম্বুবানের উৎসাহদান, হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত—সবই বর্ণনা করে চলেন। গল্পে অবশ্য সামান্য ফেরফার আছে। এই কাহিনিতে পবন অঞ্জনাকে স্নানরতা অবস্থায় দেখে ধর্ষণ করেছিলেন—'বলে ধরি অঞ্জনারে করেন রমণ'; অর্থাৎ 'মনে মনে' মিলনের উপর কৃত্তিবাস আস্থা রাখতে পারেননি। আর হ্যাঁ, এক্ষেত্রে হনুমান যখন সূর্যকে ফল ভেবে খেতে যাচ্ছেন, ঠিক তখনই রাহুও সূর্যকে গ্রাস করতে উদ্যত। হনুমানকে দেখে ভয়ে পালাল রাহু; উপস্থিত হল সটান ইন্দ্রের কাছে। ঐরাবতে চড়ে অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে ইন্দ্রও ভয় খেয়ে গেলেন—পাছে হনুমান সূর্যকে ছেড়ে তাঁকে বা ঐরাবতকেই খেয়ে ফেলার চেষ্টা করেন! এই অংশটি কৃত্তিবাস গ্রহণ করেছেন উত্তরকাণ্ড থেকে। তারপর ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে...ইত্যাদি।

এক্ষুনি আমরা দেখছিলাম—এই কথাগুলোই হনুমানকে কেমন উৎসাহ যুগিয়েছিল! কেমন করে তাঁর দেহ দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল! সে সব বাল্মীকি-রামায়ণের আলোচনার সময়ই দেখলাম আমরা—তাই না?

কৃত্তিবাসী রামায়ণ অবশ্য এই সব কিছু বলার পর যোগ করে একটা অদ্ভুত ব্যাপার—যা আদিকবি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। এই একটি ক্ষেত্রে তাঁর ঐশী কল্পনাশক্তিও গেঁয়ো কৃত্তিবাসের কাছে বলে বলে দশ গোল খাবে। কীভাবে?

জাম্বুবানের সব কথা শুনে-টুনে হনুমান বললেন, নিজের জন্মবৃত্তান্ত তিনি আর একবার বলবেন। সেই আখ্যান অনুযায়ী, তাঁর পিতা কেশরী নামের কপিরাজ একটি দুষ্ট হস্তীকে বধ করে ভরদ্বাজ ও অন্যান্য মুনিদের নিশ্চিন্ত করায় তাঁরা তাঁকে বর দিয়েছিলেন—'ত্রৈলোক্যবিজয়ী হবে তোমার কোঙর।' পরে পরমাসুন্দরী অঞ্জনা নর্মদা নদীর জলে স্নান করতে গেলে বায়ু তাঁকে 'ঝড়ে বস্ত্র উড়াইয়া দিল আলিঙ্গন।' এই কারণেই হনুমানকে পবননন্দন বলা হয়।

এইবার! এতক্ষণে আমরা এসে গেছি ঠিক সেই অমোঘ জায়গায়—যেখান থেকে নির্ভয়ে লাফ দেওয়া চলে মহাকাব্যের মহাকাশে। ঠিক এইখানে এসে যে বাঁক নিলেন কৃত্তিবাস, সেইখানেই তাঁর এবং...আজ্ঞে হ্যাঁ, চমকাবেন না—আমাদেরও নিজস্বতার বহুবর্ণ ছবিটি বহুকাল ধরে আঁকা আছে। আঁকা আছে আমাদের সেকাল আর একালের মধ্যে থাকা অদৃশ্যপ্রায় সেতুটিও।

নিজের জন্মবৃত্তান্ত বলার পর সহসা জাম্বুবানকে সম্বোধন করে হনুমান বললেন, জাম্বুবান অকারণেই সভার মধ্যে লজ্জিত করার চেষ্টা করছেন তাঁকে। জাম্বুবান কার ছেলে—সে কথাও হনুমানের জানা আছে; বড় বড় যেসব বানর সেনাপতিরা এসেছেন—তাঁদের কার মা কেমন সতী—তা-ও সব্বাই জানে। নেহাত রামের কাজ বাকি পড়ে আছে, তাই হনুমান ঝগড়াঝাটি চাইছেন না—'রামকার্য করিতে না করি বিসংবাদ।' অত কথায় কাজ নেই; সবাই যেন নিশ্চিন্ত থাকেন—এই কাজ হনুমানই শেষ করবে। একাই। কারোর সাহায্যের প্রয়োজন হবে না তাঁর।

ঠিক এই বিন্দুতে এসে পৃথক হয়ে গেলেন বাল্মীকি আর কৃত্তিবাস; রামায়ণম আর শ্রীরামচালি। একটা মহাকাব্য হল, একটা চালি।

কেন? ঠিক ঠিক এই বিন্দুতে এসেই কেন?

কারণ, যে পিতৃপরিচয় বাল্মীকির হনুমানের পক্ষে সাতিশয় শ্লাঘার বিষয়, সেটাই বাঙালি হনুমানের কাছে হয়ে উঠল লজ্জাজনক। কৃত্তিবাসের হনুমান এটাকে নিলেন পারিবারিক কেচ্ছা হিসেবে—নিছক সামাজিক বদনাম হিসেবে। তীব্রভাবে তার প্রতিবাদ করেও তাই তাঁর শান্তি নেই, তিনি জাম্বুবানকেও ওই একই 'অপবাদ' দিলেন, অপরাপর বানর-প্রধানদের মায়েদেরও 'সতীত্ব' নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন। কেননা তাঁর কাছে মায়ের ধর্ষিতা হওয়ার অন্য কোনও দৈব অর্থ হয় না।

আর বাল্মীকির হনুমান?

তাঁর কাছে এই ঘটনা যেন এক আত্মোপলব্ধির মুহূর্ত। নিজের শক্তি, নিজের অতিমানবিক ক্ষমতা এতদিন কেন যেন ভুলে ছিলেন তিনি। বাল্মীকি এই অবোধ্য বিস্মরণের কোনও স্পষ্ট কারণ নির্দেশ করেননি। অবশ্য উত্তরকাণ্ডের কবি কোনও অস্পষ্টতা পছন্দ করেননি, সকল বিষয়ের একটি করে কৈফিয়ত দিয়ে দিয়েছেন—যেমন এক্ষেত্রে তিনি জানাচ্ছেন, অঙ্গিরা এবং ভৃগুবংশজাত মুনিরা হনুমানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁকে সেই শৈশবেই অভিশাপ দিয়েছিলেন, তিনি ঋষিশাপে বিমোহিত হয়ে নিজের শক্তি ভুলে থাকবেন। পরে কেউ মনে করিয়ে দিলে তাঁর হৃত শক্তি তিনি ফিরে পাবেন। তা উত্তরকাণ্ডের জন্য বাল্মীকিকে সোপর্দ করার কোনও মানে নেই, নিশ্চিত হয়েই বলা যায়—ও তাঁর লেখাই নয়! আমরা এতক্ষণ যখন ওই প্রক্ষিপ্ত বখেরায় যাইনি, আর গিয়ে কাজ নেই।

আমাদের কাছে অবশ্য হনুমানের এই আত্মবিস্মরণ এবং নিজেকে পুনরুদ্ধার করার গল্পটা নিতান্ত মানবিক এবং মানসিক বলেই মনে হয়েছে। প্রতিটি মানুষই অনন্ত সম্ভাবনার আধার। কিন্তু আপন অন্তরে নিহিত সেই বিপুল শক্তি সে ভুলে থাকে; তার অবহেলিত শৈশব, তার অসূয়ায় ভরা নিকটবৃত্ত, তার আত্মীয়স্বজনের উপহাস, তার বন্ধুদের তাচ্ছিল্য, তার কর্মক্ষেত্রের ছোটখাটো ব্যর্থতা নিয়ে সহকর্মীদের উল্লাস—এমন অজস্র উপাদান মিশে গিয়ে তৈরি হয় এক হিংস্র খোলস, যা তাকে নিজের শক্তি ভুলিয়ে দেয়। তারপর কোনও আকস্মিক ঘটনায় সহসা খসে পড়ে আত্মবিস্মৃতির নির্মোক; মানুষ নিজের মুখ দেখে আর নিজেকেই চিনতে পারে না। নিজের শক্তির এই অভ্যুত্থান তাকে ফিরিয়ে দেয় হারানো আত্মবিশ্বাস। তখন সে পারে না, হেন কর্ম নেই! যে সূক্ষ্ম অবহেলা তাকে এতদিন তা ভুলিয়ে রেখেছিল, তাকে সম্পূর্ণ তাচ্ছিল্য করে তখন সে উড়ে যায় সাফল্যের নতুন নতুন দিগন্ত স্পর্শ করার জন্য।

বাল্মীকির হনুমান যেন সেই আত্মবিস্মৃত মানুষ, জাম্বুবান মৃদু স্পর্শে যাঁর নির্মোক খসিয়ে দিয়েছেন। নিজেরই জন্মবৃত্তান্তকে 'লঞ্চিং প্যাড' হিসেবে ব্যবহার করে হনুমান যাত্রা করলেন অনন্ত সাফল্যের পথে।

কৃত্তিবাসের হনুমানের কাছে ওই একই জন্মবৃত্তান্ত নিছক জাম্বুবানের কুৎসা। উহুঁ, কুৎসা নয়, কেচ্ছা। চণ্ডীমণ্ডপ-আশ্রয়কারী বাঙালির সনাতন সংস্কৃতি। পরের ঘরের কেচ্ছা আউড়ে কণ্ডূয়নসুখ অনুভব করা। মুশকিল হল, এর পাল্টা কেচ্ছা শোনার জন্যও আপনাকে তৈরি থাকতে হবে কিন্তু! ওতে কান দিলে চলবে না। মনে রাখবেন—সারা পৃথিবী 'ক্যারেকটার' বললে 'চিত্তবল' বোঝে, চারিত্রিক দৃঢ়তা বোঝে, নিজস্বতা বোঝে। 'He/She has a character.' বাঙালি 'চরিত্র' বলতে নারীঘটিত কেলেংকারি বোঝে। 'ওর নাকি ক্যারেকটার ভালো না?'

কাজেই বাঙালি হনুমান যে বাঙালি জাম্বুবানের কথাকে লজ্জাজনক কেচ্ছা বলে মনে করে পালটা তাঁর নামে কেচ্ছা করবেন, আর বাঙালি কবির লেখা চালিতে সেই বৃত্তান্ত খুঁজে পেয়ে বাঙালি পাঠক যে বেজায় খুশি হবে—তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিস্যু নেই।

যে যেখানেই থাকি আমরা, প্রত্যেকে আসলে মনোগতভাবে বসে আছি এক-একটা প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপে, পরনে ধুতি বা ঢাকাই, হাতে হুঁকো বা পানের বাটা...বুয়েচেন...

রাবণের হরধনু-ভঙ্গ

দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, এই শিরোনামটি দেখার পর আমার পাঠক-পাঠিকারা গোল্লা চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন—এবং প্রাণপণে হিসেব করার চেষ্টা করছেন, রাজা ভটচাজ নামের 'ভদ্রলোক-হিসেবে-পরিচিত' মানুষটি ইদানীং কী কী নেশা ধরেছে। বাকিদের মনের মধ্যে ফুটে উঠছে ছেলেবেলায় 'ছবিতে রামায়ণ' বইতে দেখা সেই ছবিটা, এক শ্যামবর্ণ কিশোরের হাতে মস্ত একটা ভাঙা ধনুক, আর একটু দূরে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে দাড়িওলা মুকুট পরা একটা লোক। রাম, আর জনক—সীতার বাবা।

উপরের শিরোনামটা যে অত্যধিক নেশা-টেশা করার ফল—সে বিষয়ে এরপরেও সন্দেহ থাকে কি? রাম যে হরধনু ভেঙে বিয়ে করেছিলেন সীতাকে, একথা জানে না—এমন শিশুও তাবৎ ভারতবর্ষ খুঁজলে পাওয়া যাবে না। এর মধ্যে রাবণ কোত্থেকে এল?

দাঁড়ান মশাই, আগে একটু খোঁজখবর নিয়ে নেওয়া যাক—এই হরধনু জিনিসটা কী।

বাল্মীকি-রামায়ণে হরধনু প্রসঙ্গ প্রথম উত্থাপন করেছিলেন বিশ্বামিত্র। তাড়কাবধের পর রাম এবং লক্ষ্মণ গেলেন বিশ্বামিত্রের আশ্রমে। সেখানে যজ্ঞরক্ষা করতে হবে। মারীচ এবং সুবাহুকে দমন করে দুই ভাই, বিশ্বামিত্র এবং অন্য মুনিদের সঙ্গে সেখান থেকে গেলেন জনকের রাজ্যে, সেখানে তখন এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন হয়েছে। সেখানে যাওয়ার কথা ঘোষণা করার সময়ই মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রথম রাম-লক্ষ্মণের সামনে এই দৈবী ধনুকের কথা বললেন। আর হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে বলে রাখি—এই ধনুকটি, যাকে আমরা সাধারণভাবে 'হরধনু' নামেই চিনি—তার একটি নাম আছে। সুনাভ। এবং বিশ্বামিত্রের কথা অনুযায়ী, জনক (এটিও কিন্তু নাম নয়! মিথিলার সকল রাজারই সাধারণ নাম জনক! সীতাকে যিনি লালন করেছেন, অর্থাৎ রামায়ণের সমসাময়িক যে জনক—তাঁরও একটি নাম আছে। সীরধ্বজ। ইনিই রাম এবং লক্ষ্মণের শ্বশুর।) এটি যজ্ঞফল হিসাবে দেবতাদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন।

তদ্ধি যজ্ঞফলং তেন মৈথিলেনোত্তমং ধনুঃ।
যাচিতং নরশার্দুলং সুনাভং সর্বদৈবতৈ।।

পরে স্বয়ং জনক জানিয়েছিলেন, এই ধনু শিব বাস্তবে ব্যবহার করেননি। দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করার পর ক্রুদ্ধ শিব এই ধনুর সাহায্যে দেবতাদের শিরচ্ছেদ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু পরে দেবতারা স্তব করে তাঁকে শান্ত করলে তিনি তাঁদেরই সেই ধনু দান করেন। দেবতারা আবার নিমির পুত্র দেবরাতকে এই ধনু রাখতে দেন। এই দেবরাত হলেন জনকের পূর্বপুরুষ, সেই সূত্রেই ধনুকটি জনকের—অর্থাৎ সীরধ্বজের কাছে আছে। সীতা যৌবনপ্রাপ্তা হলে জনক তাঁকে বীর্যশুল্কা করেন; অর্থাৎ পণ করেন—যিনি এই মহাধনুতে জ্যা-রোপণ করতে পারবেন, তাঁর সঙ্গে সীতার বিবাহ দেবেন। এমন পণ রাখা সেকালে বিরল কিছু ছিল না—দ্রৌপদীর কথা মনে করুন।

রাম যে অক্লেশে সেই ধনুতে জ্যা রোপণ করে ধনুকটাকেই ভেঙে ফেলেছিলেন, এবং তার ফলেই তাঁর সঙ্গে সীতার বিবাহ হয়েছিল—সে কথা—ওই যে বললাম, শিশুতেও জানে। তাহলে অমন উদ্ভট শিরোনাম দিয়ে চমকে দেওয়ার মানেটা কী মশাই?

সবুর, সবুর।

তার আগে বরং একটু তুলসীদাসের রামচরিতমানসের পাতা উল্টে নিই, আসুন।

তুলসীদাস কিন্তু এক্ষেত্রেও বাল্মীকির পথ অনুসরণ করেননি। বাল্মীকি-রামায়ণে বিবাহের পূর্বে রাম-সীতার দেখাই হয়নি। কিন্তু তুলসীদাস তাঁদের বিবাহের পূর্বে একবার দৃষ্টি-বিনিময় করিয়ে দিয়েছেন এক অপূর্ব কাননে। এক পুষ্পবাটিকায় ভ্রমণ করতে করতে তাঁদের দেখা হয়েছে, এবং উভয়েই উভয়কে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন—'অধিক সনেহঁ দেহ ভৈ ভোরী। সরদ সসিহি জনু চিতব চকোরী।।'—এই বর্ণনা পড়ে বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদ মনে পড়তে বাধ্য। এই পূর্বরাগের সঞ্চার তুলসীদাসের একেবারে নিজস্ব পরিকল্পনা; ঠিক যেমন তিনি জনকের যজ্ঞটিকেই পরিণত করেছেন 'ধনুর্যজ্ঞে'—অর্থাৎ জনক সীতার স্বয়ংবর উপলক্ষেই এই যজ্ঞের আয়োজন করছেন।

এরপর যথাবিহিত আড়ম্বর-সহকারে আয়োজিত হয় সীতার স্বয়ংবর, সেখানে রাম-লক্ষণ উপস্থিত। সীতা রঘুবীর রামের ছবি আপন হৃদয়ে নিয়ে বারংবার সখীর দিকে তাকাচ্ছেন, এদিকে অন্যান্য রাজারা সীতার অপার্থিব সৌন্দর্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর কমল-হস্তের বরমাল্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

এইবার ভাট—অর্থাৎ ঘোষক উচ্চৈঃস্বরে জনক রাজার পণ ঘোষণা করতে গিয়ে প্রথমেই যা বললেন, তা আমাদের চমকে দেবে :

'রাবনু বানু মহাভট ভারে।
দেখি সরাসন গবঁহিঁ সিধারে।।'

সোজা বাংলায় এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, রাবণ এবং বাণাসুর দুই মহাবীর এই ধনুক দেখে ফিরে চলে গেছেন!

এই সেই চমক—যার কথা আমি বলছিলাম। বাল্মীকি-রামায়ণে রাবণের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের সময়, যখন দেবতারা বিষ্ণুকে রাবণের অত্যাচারের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাঁকে নরজন্ম ধারণ করার জন্য অনুরোধ করছেন। বিশ্বামিত্র যখন রামকে নিজের যক্ষরক্ষার জন্য নিয়ে যেতে এসেছেন, তখনও আমরা জানতে পারি যে, দশরথ রাবণের কথা বিলক্ষণ জানেন, এবং তাঁর থেকে তিনি অসম্ভব আতঙ্কিত—যে কারণে রামকে এমন কর্মে পাঠাতে তিনি আদৌ রাজি নন। অথচ সীতাহরণের

প্রাক্কালে রাবণ যখন সীতার কাছে নিজের সত্য পরিচয় উদঘাটন করেন, তখন বোঝা যায়—সীতা রাবণের নাম পর্যন্ত জানেন না, তাঁর পরিচয় জানা তো দূরস্থান!

আর রামচরিতমানসে সেই রাবণ নির্বিঘ্নে মিথিলায় এসে, হরধনু দেখে ফিরে চলে গেছেন! অথচ তুলসীদাস সেটিকে বর্ণনীয় বিষয় বলেও মনে করলেন না, উল্লেখমাত্র যথেষ্ট বলে মনে করলেন!

আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনারা ঠিকই ধরেছেন। এইখানে একটি মিসিং লিঙ্ক রয়েছে বটে। এবং সেটি আমাদের উপহার দিয়েছেন কৃত্তিবাস ওঝা—'শ্রীরাম চালী' নামক মহাগ্রন্থে। আসুন, এবার সেই বৃত্তান্ত জেনে নেওয়া যাক।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসারে আবার এই হরধনুটির বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ পৃথক। রামের যখন সাত বছর বয়স, তখন জনক যজ্ঞভূমি থেকে কুড়িয়ে পেলেন সীতাকে। অলোকসামান্যা রূপবিশিষ্ট শিশুটিকে তিনি আপন কন্যা হিসাবেই লালন করতে লাগলেন। বস্তুত, বাংলা মঙ্গলকাব্যের রীতি মান্য করেই সীতা কিন্তু স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী—রামের জন্যই তাঁর জন্ম হয়েছে।

দেবতারা চিন্তিত হয়ে পড়লেন, পাছে জনক অন্য কারোর সঙ্গে সীতার বিবাহ দিয়ে দেন। ব্রহ্মা শিবের কাছে পরামর্শ চাইলেন। শিব তাঁর ভক্ত পরশুরামকে ডেকে নিজের একটি ধনুক পাঠিয়ে দিলেন জনকের কাছে। পরশুরাম জনককে গিয়ে ছলনা করে বললেন, তিনি স্বয়ং সীতাকে বিবাহ করতে চান। আপাতত তিনি তপস্যা করতে যাচ্ছেন। এই ধনুক তিনি রেখে যাচ্ছেন জনকের কাছে। যথাকালে তিনি যদি ফিরে না আসেন, তাহলে জনক যেন এমন কারো সঙ্গে সীতার বিবাহ দেন—যিনি এই ধনুক উত্তোলন করে তাতে গুণ পরাতে পারবেন। দেবতারা নিশ্চিত ছিলেন যে, রাম ভিন্ন অন্য কারোর এমন সাধ্য হবে না, অর্থাৎ সীতার বিবাহ নিশ্চিতভাবে রামের সঙ্গেই ঘটবে।

কিন্তু জনকের কাছে থাকা সেই সত্তর যোজন লম্বা এবং দশ যোজন চওড়া ধনুকটির কথা জনারণ্যে রাষ্ট্র হল। এই ঘোষণাও রাষ্ট্র হল যে, সীতাকে বিবাহ করতে গেলে এই ধনুকটিকে উত্তোলন করে তাতে জ্যা রোপণ করতে হবে। অসংখ্য রাজা সেই সুমেরু পর্বতের মতো ধনুকখানি ওঠানোর চেষ্টা করে গেলেন। কৃত্তিবাস তাঁর স্বভাবোচিত একটি অপূর্ব মন্তব্য করেছেন, যা আপনাদের শোনানোর লোভ আমি সংবরণ করতে পারছি না :

'প্রত্যেকে কহিলে হয় পুস্তক বিস্তর।
তিন কোটি রাজা গেল মিথিলানগর।।'

নিতান্ত বই মোটা হয়ে যাবে—এই আশঙ্কায় কৃত্তিবাস তিন কোটি রাজার নাম আলাদা করে উল্লেখ করলেন না! নইলে আজ নির্ঘাত নেট পরীক্ষায় প্রশ্ন আসত—'হরধনু ভঙ্গ করতে যে তিন কোটি রাজা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে যিনি তেইশ লক্ষ সাতান্ন হাজার আটশো তেত্রিশ-তম—তাঁর নাম লিখুন।' আর হ্যাঁ, ছাত্রছাত্রীরা সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে ফুল মার্কস পেত, বৃত্তি পেত—আরও কত কী!

কিন্তু তারপরই এই কাহিনিতে একটি অপ্রত্যাশিত বাঁক আসে।

'না পারিল তুলিতে ধনুক কোন জন।
লঙ্কায় থাকিয়া শুনে রাক্ষস রাবণ।।'

অকম্পন, প্রহস্ত, মারীচ প্রমুখ অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে রাবণ মিথিলায় এসে জনকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁদের মধ্যে আলিঙ্গন বিনিময় হল, রাবণকে দিব্য সিংহাসনে বসিয়ে মিষ্টালাপ হল। তারপর দশানন বললেন, জনক যেন সীতাকে তাঁর হাতে দান করে দেন। জনকের উত্তরটি অত্যন্ত লক্ষণীয় :

'জনক বলেন ইহা সৌভাগ্য লক্ষণ।
তোমা বিনা পাত্র আর আছে কোন জন।।'

কী আশ্চর্য! বাল্মীকি-রামায়ণের সেই যজ্ঞনাশকারী, দেববৈরী, মহাবল রাবণ কখন যে একজন সুপাত্রে পরিণত হয়েছেন, আমরা জানতেও পারিনি! অন্তত জনকের বাচনভঙ্গি থেকে আদৌ এ কথা মনে হয় না যে, তিনি ভয়ে রাবণের সঙ্গে মিষ্টালাপ করছেন, বা ব্যঙ্গ করছেন তাঁকে!

রাবণ অবশ্য জনকের ধনুর্ভঙ্গ পণ সম্পর্কে খুব একটা চিন্তিত ছিলেন না। নিজের সাফল্য সম্পর্কে তিনি এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি জনককে বললেন, আগে যেন সীতার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়, বিদায় নেওয়ার আগে তিনি ধনুকখানা ভেঙে রেখে যাবেন 'খন।

এবারে অবশ্য জনক এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। তিনি আগে প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে বললেন। প্রহস্ত রাবণের মামা। তিনিও বললেন, 'যার যে প্রতিজ্ঞা—ভঙ্গ না করে কখন।' অন্যের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করাই রাবণের পক্ষে উচিত কর্ম হবে। অহংকারী কিন্তু আত্মবিশ্বাসী রাবণ তখন চললেন ধনুক ভঙ্গ করতে এবং সমস্ত মিথিলা নগরের যুবা-বৃদ্ধ-শিশু ছুটে এল সেই আশ্চর্য ঘটনা দেখতে।

কিন্তু প্রকাণ্ড ধনুকটিকে দেখামাত্র রাবণের অন্তরে দুশ্চিন্তা দেখা দিল, তাঁর আত্মবিশ্বাস ভেঙে পড়ল। তখন আর পিছিয়ে আসার উপায় নেই ; কাজেই :

'আঁটিয়া কাপড় বীর বান্ধিল কাঁকালে।
কুড়ি হস্তে ধরিল সে ধনু মহাবলে।।'

কিন্তু সেই ধনুক তোলার সাধ্য রাবণের হল না। নাকে হাত দিয়ে তিনি মামাকে বললেন, এই ধনুক তোলা তাঁর সাধ্য নয়। প্রহস্ত এইবার খেপে গেলেন, বললেন, 'লোক হাসাইলা আসি মিথিলানগর।' রাবণকে তিনি উৎসাহ দিলেন। দেহের সমস্ত বল এক করে আরেকবার চেষ্টা করতে বললেন। এবারেও রাবণ ব্যর্থ হলেন ; এবং স্বীকার করলেন—তিনি কৈলাস পর্বত এবং মন্দার পর্বত উত্তোলন করেছেন বটে, কিন্তু এই ধনুক উত্তোলন করা তাঁর সাধ্যের বাইরে। তাঁকে প্রাণপণে আর একবার প্রচেষ্টা করতে বললেন প্রহস্ত ; এবং এ যাত্রাতেও রাবণ ব্যর্থ হলেন। এর পরের বর্ণনাটা শুধু কৃত্তিবাসের পক্ষেই সম্ভব :

'কাঁকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরখে।
মনে ভাবে পাছে আসি ইন্দ্র ব্যাটা দেখে।।'

বিপদ বুঝে প্রহস্ত দরজার কাছে রথ প্রস্তুত করে রাখলেন। রাবণ আর দ্বিধা না-করে এক লম্ফে সেই রথে উঠে পালিয়ে চললেন, পিছন পিছন বালকেরা চলল তাঁকে টিটকারি দিতে দিতে। কিন্তু আকাশচারী দেবতাগণ নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলেন :

'শ্রীলক্ষ্মীপতির লক্ষ্মী লবে কোন জন।
তুলিবেন ধনুক কেবল নারায়ণ।'

প্রায় প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় আমাদের মনে পড়ে যাবে বাল্মীকি-রচিত সেই দৃশ্যটি, যেখানে বিশ্বামিত্র এসেছেন রামকে নিজের যজ্ঞরক্ষার্থে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তিনিই প্রথম উত্থাপন করছেন পুলস্ত্যের বংশধর রাবণের প্রসঙ্গ—'পৌলস্ত্যবংশপ্রভবো রাবণো নাম রাক্ষসঃ।' সেই রাবণ 'মহাবলো মহাবীর্যো রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ।'

দশরথও বিলক্ষণ অবগত আছেন রাবণের ভয়ঙ্কর প্রতাপের এবং অত্যাচারের কথা; তিনি জানেন, দেব-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ-পক্ষী—এমনকী সর্পেরাও যুদ্ধে রাবণের বীরত্ব সহ্য করতে পারেন না :

'দেবদানবগন্ধর্বা যক্ষা পতগপন্নগাঃ।
ন শক্তা রাবণং সোঢুং কিং পুনর্মানবা যুধি।।'

এমন ভয়ানক রাক্ষসের সঙ্গে মানুষ যুদ্ধ করবে কী করে?

সেই রাবণ কৃত্তিবাসের হাতে পড়ে সহসা সমস্ত গরিমা, সকল অভিভব হারিয়ে একজন সাধারণ রাজায় পরিণত হলেন এই একটিমাত্র দৃশ্যে। না! শুধু সাধারণ রাজা নন! হাস্যকর চরিত্র! কৌতুকাবহ এক চরিত্র, যাকে শিশুরা টিটকারি দিতে পারে!

আচ্ছা, এই সাদামাটা কৌতুককর দৃশ্যটি ঠিক কতটা প্রভাব ফেলতে পারে সামগ্রিক দৃষ্টিতে? সাধারণভাবে দেখতে গেলে এ এক খণ্ডদৃশ্য মাত্র, যার মূল কাহিনির সঙ্গে সে-অর্থে কোনও যোগ নেই, তেমন সঙ্গতিও নেই হয়তো—এমনই তো মনে হওয়া স্বাভাবিক, না?

এবং, এর উত্তর হল—না!

রাম একজন বীর। কেমন বীর? যিনি রাবণকে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করতে পারেন—তেমন বীর। অর্থাৎ রাবণের বীরত্বকে ছাপিয়ে ওঠার মধ্যেই রামের বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা, পরম সার্থকতা। তিনি সেই রাবণকে পরাস্ত এবং বধ করেছিলেন, দেব-দানব-যক্ষ-পন্নগেরা যাঁকে দেখলে শঙ্কিত হন, যাকে দেখলে বায়ু ধীরে প্রবাহিত হয়, সমুদ্রের কল্লোল স্তিমিত হয়, যিনি কৈলাস পর্বতকে প্রকম্পিত করেছিলেন...

সেই রাবণকে পরাজিত করেছিলেন রাম। তিনি এমনই বীর।

আর যদি রাবণ, সেই মহাবীর রাবণ—হরধনু তুলতে এসে অপমানিত হয়ে পলায়ন করেন, তাহলে শুধু রাবণের নয়—রামেরও বীরত্বগৌরব খর্ব হয়ে যায় যে! পূর্ণবয়স্ক রাবণ যে হরধনু তুলতেই পারেন না, সেই হরধনুই কিশোর রাম ভেঙে ফেললেন—ভবিষ্যৎ তো লিখেই ফেলা হল তখনই! রাবণের রামের হস্তে পরাজয় যে এমনিই নিশ্চিত হয়ে গেল!

ভক্তিরসের আধিক্য ঠিক এমনি করে নিজেরই অজান্তে মানুষকে অবতার, বীরকে ভগবান হিসাবে গড়ে তুলতে গিয়ে তাঁর যা প্রধান গুণ—তাতেই আঁচড় কেটে বসে ভুল করে। রামায়ণের গল্পটা যে আসলে একজন অসামান্য মানুষের নিজেকে ছাপিয়ে গিয়ে অসাধ্যসাধন করার গল্প বলে—আমরা সেইটে ক্রমে ভুলতে থাকি। সবই যদি পূর্বনির্ধারিত হয়ে যায়—তাহলে যে কর্মের কোনও মূল্য থাকে না; রাম বা লক্ষ্মণের অসীম কষ্টসাধ্য বৃহৎ কর্মের কোনও অর্থই থাকে না—সেই কথাটাই ভুলে বসি আমরা! রাম যে শুধু দৈবী ক্ষমতাসম্পন্ন একজন অবতার নন, তাঁর কাহিনি যে নীরবে আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে নিজেকে ছাপিয়ে-ওঠার; এক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজপুত্রের সুবিপুল কীর্তিস্থাপনের সেই অসাধারণত্ব সহসা নিতান্ত নিয়তি হয়ে গেলে তাঁর মহিমা যে খর্বই হয় আখেরে—সে কথা আমরা ভুলে যাই।

কৃত্তিবাসের রাবণ তাই মুহূর্তের জন্য আমাদের হাসির খোরাক হয়ে রামের পরম কীর্তিকেও আমাদের অজান্তেই লঘু করে ফেলেন।

এইজন্যই এমন কিচ্ছুটি 'বাল্মীকি-রামায়ণে নেই।'

রাবণ-বধ

সত্যি বলতে কী, এই ঘটনাটির তাৎপর্য রামায়ণে এতই বেশি যে, স্বচ্ছন্দে বইটির নাম রামায়ণের পরিবর্তে 'রাবণ-বধ' রাখা যেতেই পারত। বস্তুত, আদিকাণ্ডের চতুর্থ সর্গে সত্যিই এই কাব্যকে 'পৌলস্ত্যবধ' (অর্থাৎ রাবণবধ। রাবণ সপ্তর্ষির অন্যতম—পুলস্ত্যর পৌত্র।) বলেই উল্লেখ করা হয়েছে! রামায়ণের মূল ঘটনা এটি, এবং আদিকাণ্ডের দাবি স্বীকার করে নিলে বলতে হয়, রামের জন্মের কারণই এই—রাবণকে বধ করা। সীতাহরণ এরই অনিবার্য অজুহাত মাত্র। কারণ আদিপর্বে যখন দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করছেন, তখন যজ্ঞফল গ্রহণ করতে আসা দেবতারা ব্রহ্মাকে স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন যে—তাঁর বরেই দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষসদের অবধ্য হওয়ায় দুর্বিনীত রাবণ সর্বত্র অত্যাচার করে বেড়াচ্ছে। এবার ব্রহ্মাই যেন দেবতাদের বাঁচান।

ব্রহ্মা তখন বলেন যে, বর প্রার্থনার সময় রাবণ মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করে আলাদাভাবে তার কথা উল্লেখ করেননি, কাজেই মানুষের হাতে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত। এই কথা শুনে খুশি হয়ে দেবতারা সদ্য এসে উপস্থিত হওয়া বিষ্ণুকে অনুরোধ করলেন দশরথের পুত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করে রাবণকে বধ করতে। বিষ্ণু এই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং রাজা দশরথকে পিতা হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন—*'পিতরং রোচয়ামাস তদা দশরথং নৃপম।'*

বিষ্ণু দশরথের পুত্র হতে সম্মত হলে ব্রহ্মা আদেশ দিলেন—অন্যান্য দেবতারা, মহাত্মা ঋষি, সিদ্ধ, বিদ্যাধর—এঁরাও যেন বিষ্ণুর সাহায্যকারী পুত্র সৃষ্টি করেন; তিনি নিজে ইতোমধ্যেই জাম্বুবান নামক ঋক্ষকে (ভল্লুক) সৃষ্টি করেই রেখেছেন। তখন এঁরা বালী, সুগ্রীব, নল, নীল, মৈন্দ, এবং বিশেষত হনুমানকে সৃষ্টি করলেন। অর্থাৎ শুধু রাম নয়, তাঁর সম্পূর্ণ সেনাবাহিনিটিও জন্ম নিয়েছে একই অভিন্ন কার্যকে সাকার করার উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই এক ও একমাত্র উদ্দেশ্যই হল—রাবণ-বধ।

এর আগেই আমরা আলোচনা করছিলাম—কোনও নায়ক ঠিক ততটাই বড়, যত বড় খলনায়ক তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। এই মূল সূত্রটি রামের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। তিনি মহত্তম নায়ক, কারণ তিনি ভয়ংকরতম রাক্ষসকে বধ করেছেন, নিষ্ঠুরতম অন্যায়কে শাস্তি দিয়েছেন। পরস্ত্রীহরণের শাস্তি প্রদান করেছেন তিনি যোগ্যতম উপায়ে—অন্যায়কারীকে সম্মুখযুদ্ধে হত্যা করে। এই 'সম্মুখযুদ্ধ' শব্দটা নিয়েও স্পষ্ট করে আলোচনা সেরে নিয়েছি আমরা 'অকাল-বোধন' শীর্ষক লেখাটায়—তা-ও আপনি ভোলেননি নিশ্চয়ই। সেখানে তিন রামচরিতকার—বাল্মীকি, কৃত্তিবাস এবং তুলসীদাস ঠিক কীভাবে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন তাও আমাদের মনে আছে। বাল্মীকি-রামায়ণে রামকে ব্রহ্মাস্ত্র বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন ইন্দ্রের সারথি মাতলি। আবার তুলসীদাসী 'রামচরিতমানস' গ্রন্থে রামকে রাবণের নাভিকুণ্ডে শরসন্ধান করার পরামর্শ দিয়েছিলেন বিভীষণ। কিন্তু দুজনের কেউই রামের হাতে কোনও বাড়তি সুবিধা তুলে দেননি; অর্থাৎ পরিভাষায় যাকে বলে সম্মুখযুদ্ধ—তার গৌরব থেকে রামকে কেউই বঞ্চিত করতে চাননি। শুধু একজন—কৃত্তিবাস—এক্ষেত্রে খুব স্পষ্ট করে আলাদা। আর এইখান থেকেই এমন কিছু তথ্য উঠে আসে—যা বাল্মীকির রামায়ণে নেই।

না! শুধু এইটুকু বললে, 'অতি অল্প হইল।' আসলে কৃত্তিবাস আমাদের হাতে এমন কিছু তুলে দেন, যা রাম, রাবণ এবং রামায়ণ—এই সবকিছুর মূল যে রসায়ন, তার তাৎপর্যকেই একেবারে ভিত্তি থেকে বদলে দেয়।

বেশ! তাহলে ফের গোড়া থেকে শুরু করা যাক আরেকবার।

বাঙালির রামায়ণের আরও দুই বিশেষত্ব—মহীরাবণ ও অহীরাবণ বধ সেরে হনুমান রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে ফিরে এলেন পাতাল থেকে পৃথিবীতে। এই সুসংবাদ শুনে বানরেরা সিংহনাদ করতে লাগল। এদিকে মহাবীর পুত্র মহীরাবণ মারা গেছে—খবর পেয়ে রাবণ উন্মত্ত হয়ে নিজেই যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। কিন্তু এইবার তাঁকে ঘিরে ধরলেন তাঁর হাজার দশেক রাণী। তাঁরা কেউ রাবণকে যুদ্ধ থেকে ফেরাতে পারলেন না। অবশেষে মন্দোদরী তাঁকে গিয়ে বললেন—মহামুনি বিশ্বশ্রবার পুত্র হয়েও কেন রাবণের এমন দুর্মতি হল—তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

মন্দোদরী তখন রাবণকে রামের স্বরূপ বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেন। রাম স্বয়ং ঈশ্বর; বিষ্ণুর অবতার। তাঁরই মহিমায় শিলা জলে ভাসে এবং পাষাণ মনুষ্য হয় (এই দুটি বিষয় নিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই বিস্তারে আলোচনা করেছি)—এমন কে কবে শুনেছে? কাজেই রাবণের উচিত সীতাকে এই মুহূর্তে রামের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে নিজের প্রাণ ও রাজত্ব রক্ষা করা।

রাবণ স্বীকার করলেন, বিভীষণ তাঁকে নিয়ে হাসবেন—এই ভয়েই তিনি সীতা ফিরিয়ে দিতে রাজি নন।

এই লঘু উক্তিতে মন্দোদরী আরও রুষ্ট হলেন, এবং স্বামীকে তীক্ষ্ন বাক্যে বিদ্ধ করলেন। রাম স্বয়ং বিষ্ণু, এবং সীতা লক্ষ্মীস্বরূপা। অথচ তাঁরাই রাবণের শত্রু হয়ে উঠেছেন রাবণেরই কর্মদোষে। 'যে জন পালনকর্তা সেই জন মারে। অভাগ্য তোমার মতো নাহিক সংসারে।।'

এইবার রাবণ ঈষৎ হেসে এক অদ্ভুত কথা বললেন। মন্দোদরীকে বললেন, 'তুমি আমাকে যা বোঝালে, তা আমি আগে থেকেই খুব ভালো করে জানি—'শক্তিরূপা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।' যে মহালক্ষ্মীকে কত মানুষ সারাজীবন পূজা করেও পায় না, তিনি অনাদরে পড়ে আছেন লঙ্কায়। যে বিষ্ণু-চরণ পাওয়ার জন্য তপস্বীরা সারা জীবন অনাহারে তপস্যা করে কাটান—সেই রাম ক্রমাগত আমার কথা চিন্তা করেন—তা হলই-বা শত্রু হিসাবে! আমি রামের হাতেই মারা যাব। স্বয়ং বিষ্ণুদূত এসে আমাকে বিমানে তুলে নিয়ে যাবে বৈকুণ্ঠে, এবং আমি, দশানন রাবণ—'সমান প্রতাপে যাব জীবন-মরণে।'

এইখানে এসে আমাদের বাল্মীকি পড়ার অভিজ্ঞতা ফেল খেয়ে যায়। বাল্মীকি-সৃষ্ট রাবণ একজন সত্যিকারের খলনায়ক—যাঁর খারাপ হওয়ার জন্য কোনও অজুহাতের প্রয়োজন হয় না, যাঁর নারী-লোলুপতার কোনও কৈফিয়ৎ নেই। উত্তরকাণ্ড জুড়ে অসংখ্য অভিসম্পাত যোজনা করে তাঁর পরিণতি ক্রমে স্পষ্ট করে তোলা হয় বটে, কিন্তু যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত—অর্থাৎ রামায়ণে দেখা দেওয়ার পর থেকে নিজের মৃত্যু পর্যন্ত যে দশগ্রীব রাবণ আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠেন—তিনি একজন অবিমিশ্র 'দুষ্টু লোক।' রাম নিজের সমস্ত সত্তাকে, সাধ্যকে ছাপিয়ে উঠে তাঁকে বধ করেন, আর সেখানেই তাঁর নায়কত্ব।

কিন্তু স্বয়ং রাবণও যদি তরণীসেনের মতোই জন্ম হইতেই রামের জন্য বলি-প্রদত্ত, তাঁর হস্তে মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হয়েই থাকেন, তাহলে রামের বীরত্বের কী হইবে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক এইভাবেই রামের ক্ষাত্রতেজকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে রাম-রাবণের চিরন্তন শত্রুতার সম্পর্ককে নতুন করে বিনির্মাণ করেন কৃত্তিবাস ওঝা। তাঁর সৃষ্ট রাবণ একজন পরম রামভক্ত, শত্রুরূপে রামকে তিনি ভজনা করেন বৈকুণ্ঠধাম যাওয়ার জন্য। সীতাকে হরণ করেন রামকে শত্রু করে তোলার জন্য। তৃতীয়বার যুদ্ধক্ষেত্রে রামের মুখোমুখি হয়ে সহসা রামের স্তব শুরু করেন তিনি—হুবহু তরণীসেন বা বিভীষণের ভাষাতেই। যখন মহাকাল বাণে রাম তাঁকে বিদ্ধ করলেন, তখন হাতের ধনুর্বাণ মাটিতে ফেলে দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে রাবণ রামের সম্পর্কে বলতে লাগলেন :

'বিশ্বের আরাধ্য তুমি, অগতির গতি।
নিদানে সৃজিতে সৃষ্টি তুমি প্রজাপতি।।'

এবং হুবহু তরণীসেন-বধের ক্ষেত্রে যা হয়েছিল—রাম এবারেও মুহূর্তে মন পরিবর্তন করলেন :

'কেমনে এমন ভক্ত করিব সংহার।
বিশ্বে কেহ রামনাম না লইবে আর।।'

—এই বলে তিনি ধনুঃশর ত্যাগ করলেন। দেবতারা প্রমাদ গুনলেন—এবার বুঝি রাবণ-বধই হবে না। কাজেই দ্রুত দেবী সরস্বতী দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি রাবণের মুখ থেকে কটূক্তি 'বলিয়ে নিলেন,' এবং রামও মুহূর্তকাল পূর্বের দুর্বলতা ভুলে ফের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু দেখা গেল, যতবারই রাবণের দশটি মাথার একটি বা একাধিক কেটে ফেলা হচ্ছে, ততবারই তা ফের নিজের স্থানে ফিরে আসছে।

এর পরেই যে অম্বিকার আগমন, এবং রামের অকাল-বোধন ইত্যাদি—তা তো আমরা দেখেই ফেলেছি। কিন্তু তাতেও ব্যাপারটা সম্পর্কে কৃত্তিবাস নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। কাজেই এবার এগিয়ে আসতে হল হনুমানকে। ততক্ষণে বৃহস্পতি রাবণের মঙ্গলকামনায় চণ্ডীপাঠ শুরু করেছেন। হনুমান সেই চণ্ডীর পুথি থেকে কিছু অংশ মুছে ফেললেন, ফলে শ্লোক অশুদ্ধ পাঠ করা হল। অম্বিকা বিরক্ত হয়ে ফিরে গেলেন কৈলাসে।

এইবার বিভীষণ আসল কাজটি করলেন। তাঁর মনে পড়ল, তাঁরা তিন ভাই—তিনি, রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ—একসঙ্গে তপস্যা করেছিলেন। রাবণ অমরত্বের বর প্রার্থনা করায় ব্রহ্মা তাঁকে একটি মৃত্যুবাণ দিয়ে বলেছিলেন, প্রকারান্তরে তিনি রাবণকে অমরত্ব দিলেন; অর্থাৎ এই বাণ যদি রাবণের শত্রুর হস্তগত না হয়, তাহলে আর আশঙ্কার কিছুই থাকে না।

কিন্তু সমস্যা হল, বিভীষণ মৃত্যুবাণের কথা বললেন বটে, কিন্তু সেই বাণ কোথায় লুকোনো আছে—তা বলতে পারলেন না। সেই অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হল হনুমানকে।

হনুমানকে আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণে মূলত হাস্যরসাত্মক চরিত্র হিসেবে পাই, যেমন তুলসীদাসে তাঁর মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই রামভক্তি। কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয়ই ঘটে বাকবৈদগ্ধ্যের বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে, যখন সুগ্রীবের সন্ধানে রাম ও লক্ষ্মণ ঋষ্যমূক পর্বতে এলেন। রাম-লক্ষ্মণের দর্শনে ভীত-সন্ত্রস্ত সুগ্রীবকে তিনি বলেন—অকারণে ভয় পেয়ে ছুটোছুটি করে সুগ্রীব শুধু তাঁর 'বানরত্বই' (!) প্রকাশ করছেন; তাঁর উচিত বুদ্ধি ও বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে ইঙ্গিতমাত্রে কর্ম করা, কারণ রাজা বুদ্ধিহীন হয়ে কখনোই প্রজাদের শাসন করতে পারেন না :

'বুদ্ধিবিজ্ঞানসম্পন্ন ইঙ্গিতৈঃ সর্বমাচর।
নহ্যবুদ্ধিং গতো রাজা সর্বভূতানি শাস্তি হি।'

হনুমান এরপর সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করে স্বয়ং দেখা করলেন দুই ভাইয়ের সঙ্গে, উদ্দেশ্য—তাঁদের পরিচয় জেনে নেওয়া। তাঁর আত্মপরিচয় দেওয়ার প্রকরণ থেকেই রামের মনে হয়েছিল—ঋক সাম এবং যজুর্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ না হলে কেউ এমন সুন্দর করে কথা বলতে পারেন না। বীরত্বের পূর্বেই হনুমান নিজের বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন—তা কিন্তু আমরা আগেই দেখে নিয়েছি।

কৃত্তিবাস সেই বুদ্ধিকে প্রয়োগ করলেন এইবার। এক বৃদ্ধ জ্যোতিষীর ছদ্মবেশ ধারণ করে হনুমান পৌঁছে গেলেন রাবণের অন্তঃপুরে, মন্দোদরীর মহলে—যেখানে রাবণের মৃত্যুবাণ লুকিয়ে রাখা আছে। তারপর বারংবার মন্দোদরীকে বুঝিয়ে বললেন, তিনি যেন কোনওক্রমেই এই মরণবাণের সংবাদ কাউকে বলে না-দেন। বিভীষণ যে সব গোপন তত্ত্বই রামকে বলে দিতে পারেন, তাও তিনি মনে করিয়ে দিলেন বারবার। হিতাকাঙ্ক্ষার এই অতিরেকে টাল সামলাতে না-পেরে মন্দোদরী বলে বসলেন :

'তব আশীর্বাদে তাহা কে লইতে পারে।
রেখেছি জড়িত এই স্তম্ভের ভিতরে।।'

মুহূর্তে স্বরূপ ধারণ করে, পদাঘাতে সেই স্তম্ভ ভগ্ন করে মৃত্যুবাণ বের করে আনলেন হনুমান। এনে দিলেন রামের কাছে। সেই ভয়ংকর হংসাকৃতি বাণ রাম তাঁর ধনুকে যোজনা করতেই রাবণ তা চিনতে পারলেন, ভয়ে তাঁর প্রাণ উড়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, বিদ্যুদ্বেগে সেই বাণ রাবণের বক্ষ ভিন্ন করে দিল।

এই অবধি এসে...

তিষ্ঠ পাঠক! তিষ্ঠ ক্ষণকাল!! (ছেলেবেলায় লেখকেরা এই লাইনটা লিখেছেন দেখলেই আমি সোজা হয়ে বসে ভাবতাম—'আরিব্বাস! আমায় বলল!')

আমি বলেছি, রাবণের বক্ষ ভিন্ন করে দিল। রাবণ মারা গেলেন—বলিনি কিন্তু! মানে, আমি না...স্বয়ং কৃত্তিবাস ওঝার কথাই বলছি। তিনিই লেখেননি কিনা, তাই আমিও বলিনি।

এই খেয়েছে! দেবতা মনুষ্যরূপ ধারণ করে, প্রায় তেরো বছর বনে-বাদাড়ে কষ্ট পেয়ে, পত্নীবিরহ সহ্য করে, অযোধ্যা থেকে হেঁটে হেঁটে লঙ্কায় পৌঁছে গেলেন যে কর্মটি করতে—সেটি কি ফসকে গেল শেষে?

অনিবার্যভাবে আমাদের মনে পড়ে যেতে বাধ্য, সুকুমার রায় তাঁর অতিবিখ্যাত 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালা শুরুই করেছিলেন রাবণের মৃত্যু-সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব দিয়ে। রাম স্বপ্ন দেখেছেন, রাবণ তালগাছে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মরে গেছেন। পরদিন সকালে রামের কাছ থেকে শুনে জাম্বুবান বললেন, তবে রাবণ ব্যাটা নিশ্চয়ই মরেছে—রাজস্বপ্ন মিথ্যে হয় না। রাম তখন বললেন, রাবণ পড়ে গেছে দেখে তিনি স্বপ্নেই

হনুমানকে বলেছিলেন, তাকে সমুদ্দুরে ফেলে দিয়ে আসতে। হনুমান এসে বলেছিল, ফেলবারও দরকার হল না—সে এক্কেবারে মরে গেছে।

তারপর থেকে ভেবেই চলেছি—এ আবার কীরকম কথা! 'অল্প করে' কি মরা যায়? মরলে তো 'এক্কেবারে' মরেই যায়!

তা সে যাক গে', একটু পরেই অবিশ্যি রাবণের রথ দেখা গেল, তাতে লাঠি-কাঁধে রাবণকেও বসে থাকতে দেখা গেল। জাম্বুবান সোজাসুজি হনুমানকেই দোষ দিলেন—স্বপ্নের মধ্যে বিদ্যে জাহির না-করে সমুদ্রে ফেলে দিলেই গোল চুকে যেত! বিভীষণও একমত হয়ে বললেন, 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।'

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা বাঙালিরা দুনিয়ার সবকিছু নিয়ে মশকরা করার মতো বুকের পাটা আর হাস্যোজ্জ্বল মগজ রাখতাম বটে এককালে! কৃত্তিবাস থেকে ভারতচন্দ্র হয়ে সুকুমার অবধি ঠাকুরদেবতা নিয়েও আমাদের হাসাহাসির অন্ত ছিল না, আবার তার জন্য ভক্তিভাবও কিছু কমতি পড়ত না। তা সে বহুযুগ আগের কথা—বাদ দিন মশাই! আমরা এখন সিরিয়াস হয়ে গেছি, বুদ্ধিমান হয়ে গেছি, একেবারে অধ্যাপক হয়ে গেছি। কিন্তু আগে, বুঝলেন, পরমকরুণাময় পরমাত্মাকে শুধু ভয় পেতাম না আমরা। ভালোও বাসতাম খুব।

যাক—আর ঠাট্টা নয়। গম্ভীর হয়েই বলি, এই শেষবেলায় এসে সহসা—কেন জানি না—কৃত্তিবাস বেজায় দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। রাবণের কি সত্যিই মৃত্যু হল? আর কী আশ্চর্য, শুধু কবি নন, তাঁর হাতে পড়ে দেবতারাও দেখা গেল দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছেন, বলাবলি করছেন—'...রাবণের নাহিক প্রত্যয়। কতবার মরে বেটা, আরবার বাঁচে।' তা কথাটা একেবারে ফ্যালনা নয়, যার মাথা কেটে ফেললে ফের মাথা গজায়—তাকে মরার ব্যাপারেও সহসা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না বটে। কিন্তু তাই বলে খোদ কবিই যদি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তাহলে আমরা—গরিব পাঠকবৃন্দ যাই কোথা?

কিন্তু কথাটা হল, কৃত্তিবাসের এহেন দ্বিধার কারণ কী? তিনি নিজে জানাচ্ছেন, বাল্মীকি লিখেছেন যে, রাবণ রণস্থলে মহানিদ্রা করবেন। সরাসরি মৃত্যুর কথা তিনি বলেননি। কাজেই...

আরও সরেস উক্তিটি আছে এর পরেই। কোনও এক দেবতা জানাচ্ছেন—রাবণ তো অমরত্বের বর পাননি! আসলে বাল্মীকিমুনি পুরাণ পড়ে জানতে পেরেছিলেন—রাবণ কালেদিনে দুর্জয় হয়ে উঠবে। তাই ভয় খেয়ে তিনি রাবণের মৃত্যুসংবাদ লেখেননি, পাছে রাবণ চটে যান!

'ভয়ে মুনি রাবণের মৃত্যু নাহি লেখে।
কি জানি রাবণ রুষ্ট হয় পাছে দেখে।।'

এই যুক্তির পরে যে বাল্মীকির ধ্যানদৃষ্টি ইত্যাদি সবই প্রপঞ্চময় মায়ামাত্রে পর্যবসিত হয়, তাতে সন্দেহ নেই। রাবণ রামায়ণ পড়ে চটে যাবেন—এই ভয়ে ভীত বাল্মীকি তাঁর মৃত্যুর বর্ণনা এড়িয়ে যাচ্ছেন—এই কল্পনাটাই ভয়ানক!

কিন্তু বাস্তবেও কি বাল্মীকি-রচিত রামায়ণে রাবণের মৃত্যুসংবাদ প্রত্যক্ষভাবে বর্ণিত হয়নি—যা কৃত্তিবাসকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল?

কই, তা তো মনে হচ্ছে না!

সেই যে, মাতলি রামকে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করতে বললেন, আর তারপরেই :

'গতাসুর্ভীমবেগস্তু নৈঋতেন্দ্র মহাদ্যুতিঃ।
পপাত স্যন্দনাড়ূমৌ বৃত্রো বজ্রহতো যথা।।'

এইভাবে, মহাদ্যুতিমান, মহাবেগবান রাক্ষসরাজ রাবণ প্রাণত্যাগ করে বজ্রাহত বৃত্রাসুরের মতো রথ থেকে পড়ে গেলেন।

ওই যে, পঙক্তি শুরুই হল 'গতাসু' বলে! তবে নাকি নেই?

নাঃ, আছে। রাবণের মৃত্যুসংবাদ বাল্মীকি বেশ গোটা গোটা করেই লিখে গেছেন, অস্পষ্টতার বিন্দুমাত্র অবকাশ রাখেননি কোথাও। আমরাও এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম।

তা নয় হলাম। রাবণ নাহয় ম'লো, মানে এক্কেবারে মরেই গেল। কিন্তু রামের কী হবে? আমাদের নায়কটির?

ক্রমে তাঁর হাত থেকে যে সবকিছুই কেড়ে নিচ্ছেন কৃত্তিবাস—সে কথা কি আমরা খেয়াল করছি? দেখা যাচ্ছে, রামের ক্ষাত্রতেজের যা ভরকেন্দ্র—সেই রাবণবধের ক্ষেত্রে রামের কৃতিত্ব অতি সামান্যই অবশিষ্ট আছে আর। হনুমান এবং বিভীষণের হাজারো সক্রিয়তা, উপস্থিত-বুদ্ধি, সপ্রতিভতার পাশে ওই যৎসামান্য বীরত্ব নিতান্তই নিষ্প্রভ, নগণ্য। অন্যের কেড়ে-আনা মরণবাণ তাঁর ধনুক থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল—এইটুকুই রামের কর্ম।

এইমাত্র? এটুকুই রাম? নায়ক, মহাবীর রাম? এক ভক্তকে যিনি তারই মৃত্যুবাণ ছুঁড়ে বধ করেন? নিজের নায়কের হাত থেকে একে একে সকল অস্ত্রই যেন কেড়ে নিচ্ছেন কৃত্তিবাস, শিথিল আঙুল থেকে খসে পড়ছে সমস্ত কৃতিত্ব—এমন যদি আমাদের মনে হয়, দোষ দেওয়া যায় কি?

তাহলে সেই পরম-পুরুষের হাতে রইলই বা কী?

এরপরের লেখায় সেই কথাটিকে ছুঁয়েই এবারের মতো যাত্রা সমাপ্ত করব আমরা।

নায়ক থেকে পরমপুরুষ...

এর ঠিক আগের লেখাটিতেই আমরা দেখেছি, রামের জন্মেতিহাস বিবৃত করতে গিয়েই বাল্মীকি প্রথমবারের জন্য টেনে এনেছিলেন রাবণের প্রসঙ্গ। যজ্ঞফল নিতে-আসা দেবতারা কীভাবে বিষ্ণুকে রাজি করালেন দশরথের পুত্ররূপে জন্ম নিতে, তাও আমাদের জানা আছে। সেক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন অবিশ্যি আদালতে ওঠার আগেই তামাদি হয়ে যায়; তা হল—রাম কি সত্যিই অবতার? দেখা যাচ্ছে, আদিকবি সেই প্রশ্ন উত্থাপনেরই সময় দেননি। তার আগেই তিনি গোড়া ঘেঁষে কোপ মেরে রেখেছেন—স্বয়ং বিষ্ণুই রাম হিসেবে জন্ম নিয়েছেন, 'অবতীর্ণ হয়েছেন।' তিনি জন্মগত অবতার।

দু-একটি প্রশ্ন অবশ্য এরপরেও থেকেই যায়। বিষ্ণু কিন্তু শুধু রামরূপেই জন্মগ্রহণ করেননি; অর্থাৎ রাম একাই এ-যাত্রায় বিষ্ণুর অবতার নন। তিনি নিজেকে চার ভাগে বিভক্ত করে, দশরথকে পিতা হিসাবে স্বীকার করলেন। এই শ্লোকের অর্ধেকটা আপনারা আগের লেখাতেই পড়ে ফেলেছেন, আজ বাকি অর্ধেক সমেত পড়ে ফেললে ব্যাপারটা ভারি আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়াবে :

> *'ততঃ পদ্মপলাশাক্ষং কৃত্বাত্মানং চতুর্বিধং*
> *পিতরং রোচয়ামাস তদা দশরথং নৃপম।।'*

এবার নিশ্চয়ই গোল কেটে গেছে। পদ্মপলাশাক্ষ—অর্থাৎ বিষ্ণু নিজেকে চতুর্বিধ করে দশরথকে পিতা রূপে স্বীকার করে নিলেন। অর্থাৎ রাম একা নন, লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্ন—প্রত্যেকেই বিষ্ণুর অবতার! সে ক্ষেত্রে তো রামের বিশেষ কোনও বৈশিষ্ট্য আর অবশিষ্ট থাকে না; সমস্ত রামায়ণে যাঁর দেখা মেলা ভার—সেই শত্রুঘ্নও বিষ্ণুর অবতার, রামও তাই।

আর দ্বিতীয়তঃ, রামকে অবতার হিসাবে স্বীকার করে নিলে তাঁর যে বিপুল কর্ম—তাকেও লীলা বলে স্বীকার করে নিতে হয়। দেবতার তো জয় হবেই! তিনি পূর্ব হইতেই জয়ের জন্য নির্বাচিত! সে ক্ষেত্রে রামের এই বিপুল দুঃখভোগ, এই বিশাল উদ্যোগ, এবং এই প্রকাণ্ড কীর্তি—এর কোনওটারই কোনও পার্থিব তাৎপর্য অবশিষ্ট থাকে না। ও সবই ভগবানের লীলাখেলা। ব্যস—মিটে গেল।

কথা হল, সত্যিই মিটে গেল কি? আচ্ছা, সে আলোচনা নাহয় পরে করা যাবে। তার আগে দেখি, বাল্মীকির উত্তরসূরিরা রামের এই ঈশ্বরত্বকে কীভাবে দেখছেন।

কৃত্তিবাসের একটা বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই এতক্ষণে আপনারা বুঝে ফেলেছেন। রসিকতা করার ন্যূনতম সুযোগ পেলে কৃত্তিবাস তা ছাড়তে রাজি নন। মহাবীর বিচক্ষণ হনুমান এই কারণেই তাঁর 'শ্রীরাম চালি'-তে প্রায় কমিক রিলিফ হয়ে দাঁড়ান। এক্ষেত্রে রাবণের অত্যাচারের বিবরণ দিতে গিয়ে কৃত্তিবাস সেই একই কাণ্ড ঘটালেন।

দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের সময় ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতারা অনন্তশয্যায় নিদ্রিত বিষ্ণুকে বহু স্তব করে ডেকে তুললেন। রাবণের বিরুদ্ধে তাঁরা অভিযোগ জানাতেই বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হয়ে চক্র-হস্তে গরুড়ের পিঠে চড়ে চললেন রাবণকে বধ করতে। কিন্তু তাঁকে নিরস্ত করে ব্রহ্মা জানালেন, তিনিই রাবণকে এমন বর দিয়ে বসে আছেন, যার বলে নর ও বানর ছাড়া অন্য কারো হস্তে রাবণ-বধ সম্ভব নয়।

বিষ্ণু এর আগেও বহুবার এই কর্ম করেছেন; ফের স্বর্গসুখ ছেড়ে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করতে হবে শুনে দুঃখে তাঁর মাথা হেঁট হয়ে গেল। ভাবলেন—বর দেওয়ার বেলায় ব্রহ্মা বেজায় দড়, আর রক্ষা করার সময় এই বিষ্ণুকেই এগিয়ে আসতে হয় প্রত্যেকবার। কিন্তু এরপর বিভিন্ন দেবতাদের যে দুর্গতির বিবরণ শোনা গেল—তা শুনলে শুধু বিষ্ণু কেন মশাই—আপনার চোখেও জল আসবে! বলি?

সূর্যদেব হাতে অস্ত্র নিয়ে লঙ্কার দ্বাররক্ষার কাজ নিয়েছেন। ইন্দ্র মালা গেঁথে দেন। চন্দ্র ছত্র ধরেন। অগ্নিদেব রান্নাবান্না করেন। পবন মৃদুমন্দ বাতাস করেন। বরুণ জল এগিয়ে দেন, বসুন্ধরা ঘর মোছেন। মৃত্যুর দেবতা যম রাবণের ঘোড়ার ঘাস কেটে আনেন। শনিদেব কাপড়চোপড় কাচার দায়িত্ব পেয়েছেন। নারদ রাবণের সভাগায়ক নিযুক্ত হয়েছেন। আর স্বয়ং ব্রহ্মা—এইটে লিখতে গিয়ে আমি কল্পচক্ষে নিজেকেই দেখতে পাচ্ছি—রাবণের বাড়ির বাচ্চাদের পড়ানোর কাজ পেয়েছেন! 'জগতের কর্তা আমি ব্রহ্মা মহামুনি। পড়াই বালকগণে লঙ্কায় আপনি।'

(বলেছিলাম, মনে আছে—দেবতাদের নিয়ে ইয়ার্কি করতে বাঙালির তুল্য কেউ নেই? ভারতচন্দ্র লিখেছিলেন বটে—শিব ভিক্ষা করতে বেরিয়েছেন, এবং কেউ তাঁকে সাপ-খেলা দেখাতে বলেছে, কেউ জটা থেকে জল বের করে দেখাতে বলেছে, মায় এক হতভাগা গাল বাজিয়ে নাচতেও বলেছে! কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মৃত্যুর দেবতাকে দিয়ে রাবণের ঘোড়ার ঘাস কাটিয়ে কৃত্তিবাস সকলের তুলনায় চ গোলে এগিয়ে রয়েছেন!)

এইসব ভয়ানক দুঃখের কথা শুনে বিষ্ণুরও মন গলে গেল। স্বাভাবিক! তখন তিনি ব্রহ্মাকেই জিজ্ঞাসা করলেন—মর্তলোকের কোন বংশে জন্ম নেওয়া যায়। ব্রহ্মা তাঁকে দশরথের কথা বললেন। বিষ্ণু অবশ্য কৌশল্যাকেই মাতা হিসাবে বেছে নিলেন, স্বপ্নে দর্শনও দিলেন। কিন্তু যজ্ঞোত্থিত পুরুষের প্রদত্ত চরুর ভাগাভাগির ফলে নারায়ণ চার অংশে জন্ম নিলেন। 'এক অংশ নারায়ণ চারি অংশ হয়ে। তিন গর্ভে জন্মিলেন শুভক্ষণ পেয়ে।'

এরপর থেকে সমস্ত শ্রীরাম-চালি জুড়ে যে রামবন্দনা চলবে, তা রামকে দেবতা হিসাবে স্বীকার করেই। শুধু মানুষ নয়, দেবতারাও তাঁর জয়ধ্বনি করবেন বারংবার। আমরা ক্রমে জানতে পারব, রামনাম হল সকল কলুষ-কল্মষ দূর করার একমাত্র উপায়। রামনামের মহিমা অপার—এই নামের মহিমাতেই দস্যু রত্নাকর মহর্ষি বাল্মীকি হয়ে ওঠেন, তরণীসেন তাঁর রথের সর্বত্র এই পুণ্যনাম লিখে রাখেন, স্বয়ং কবির মতে—'রাম নাম জপ ভাই অন্য কর্ম পিছে। সর্ব-ধর্ম-কর্ম রাম-নাম বিনা মিছে।।' এমনকী শেষাবধি আমরা জেনে ফেলি

—খোদ রাবণও আগে থেকেই জানেন, রাম ও সীতা লক্ষ্মী-নারায়ণের অবতার। তিনি নিতান্তই বিষ্ণুলোকে যাওয়ার জন্য শত্রুরূপে রামের আরাধনা করে চলেছেন মাত্র।

অর্থাৎ, বাল্মীকি থেকে কৃত্তিবাসে আসার পথে ক্রমেই রাম অগ্রসর হতে থাকেন দেবত্বের পথে। ক্রমেই রামনাম অধিকার করে নিতে থাকে ব্যক্তি রামের বিপুল কর্মকাণ্ডের স্থান।

বেশ। আর তুলসীদাস? এ বিষয়ে তাঁর কী মত?

তুলসীদাস কৃত্তিবাসের চাইতেও এক ধাপ এগিয়ে থেকে শুরু করেছেন তাঁর রামচরিতমানস। এই গ্রন্থে রামই পরম, রামই একমাত্র ঈশ্বর। অপর দেবতারা তাঁর ভক্ত, তাঁরা তাঁর মহিমাকীর্তন করেন। কৃত্তিবাসের প্রভাব শিরোধার্য করেই তুলসী বর্ণনা করেন বাল্মীকির সেই তথাকথিত রামনামের সাধনার—'মরা মরা' বলতে বলতে তাঁর রামনাম উচ্চারণ করে পাপরাশি থেকে উদ্ধার পাওয়ার কাহিনি—যা আদৌ বাল্মীকি-রামায়ণে নেই। রামনামের মহিমার ব্যাপারেও তুলসীদাস কৃত্তিবাসের অনুসারী—কলিযুগে রামনামই কল্পতরুর মতো সকল কল্যাণ দান করে—'নামু রাম কো কলপতরু, কলি কল্যাণ নিবাসু।' এমনকী, স্বয়ং শিবের ইষ্টদেবতার নামও সেই রাম! 'সোই মম ইষ্টদেব রঘুবীরা'—এ কথা শিব নিজেই বলেছেন পত্নী সতীকে।

একেই বলা যেতে পারে রাম-পারম্যবাদ। ভুলে গেলে ঘোর অন্যায় হবে, তুলসীর সমকালে গোটা পূর্বভারতে থরথর করি কাঁপিছে ভূধর, শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসি—কারণ স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তখন প্রকট হয়েছেন। এর অনতিকাল পরেই প্রচারিত হবে কৃষ্ণের পারম্যবাদ; কৃষ্ণ অবতার থেকে হয়ে উঠবেন অবতারী! অর্থাৎ তিনিই পূর্ণব্রহ্ম—বিষ্ণুই বরং কৃষ্ণের শক্তিতে বলীয়ান! এই একই পথে হেঁটে তুলসী রামকে করে তুললেন পরম, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও তাঁর ভক্ত। তাঁকে সন্দেহ করে আত্মধিক্কার থেকে প্রাণবিসর্জন দেন শিবপত্নী সতী!

আর ঠিক এই পথে হাঁটতে হাঁটতেই আমরা ক্রমে হারাতে থাকি এক মহান পুরুষকে। হ্যাঁ, ত্রুটি তাঁরও আছে বইকি! সব ক্ষেত্রে তিনি নিখুঁত নন! আর তা নন বলেই তিনি একজন মানুষ। দোষে-গুণে মানুষ। উত্তর কোশল নামের এক ক্ষুদ্র জনপদের বিতাড়িত রাজপুত্র। ভ্রাতা আর স্ত্রীকে নিয়ে তিনি রাজসুখ ত্যাগ করেন পিতৃসত্য পালনের জন্য—যে প্রতিজ্ঞা তিনি করেনইনি, তাকে সত্য করে তোলার জন্য। না, ভুল বললাম। ভ্রাতা বা পত্নীকে নিয়ে তিনি গৃহত্যাগী হননি! একাই ঘর ছাড়তে চেয়েছিলেন তিনি। ভাই আর স্ত্রী তাঁর সঙ্গ নিয়েছিলেন তাঁর ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও। বারংবার তাঁদের তিনি নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। স্ত্রীকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, বনবাসে কত রকমের কষ্ট সহ্য করতে হয়। তবু, তাঁর চরিত্রেই এমন কোনও মহৎ আকর্ষণ ছিল—লক্ষ্মণ বা সীতা—কাউকেই তিনি নিবৃত্ত করতে পারেননি। তাঁরাও সেই একই শারীরিক কষ্ট সহ্য করার জন্য, হাজারো অসুবিধা সয়ে নেওয়ার জন্য যাত্রা করেছিলেন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বনের পথে। সহস্র সহস্র প্রজা তাঁর সঙ্গ নিয়েছিলেন বনের পথে, অতিবৃদ্ধ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাঁদের যজ্ঞলব্ধ ছত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গ নিলেন, যাতে যুবক রাজপুত্রটি একটু ছায়া পায়! রাতের অন্ধকারে তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে প্রায় পলায়ন করতে হল রামকে, যাতে তাঁরা অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, এটি অবতারের প্রতি ভক্তের শ্রদ্ধা নয়। এ হল একজন ভালো মানুষের প্রতি অন্য মানুষদের ভালোবাসা। আর কে না জানে—যা প্রেম, ভারতবর্ষে তাই-ই পূজা! প্রভু আমার, প্রিয় আমার! রাম শুধু প্রভু ছিলেন না তো! প্রিয়ও ছিলেন। তারপর ক্রমে তাঁর অবয়বে পরিবর্তন এল। তিনি প্রিয় থেকে প্রভু হলেন।

নায়ক থেকে পরমপুরুষ হলেন। মানুষ থেকে অবতার হলেন। বাল্মীকির রাম ভারতের নতুন ঈশ্বর হয়ে উঠলেন।

না, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যুগে যুগে আমরা, ভারতবর্ষের মানুষ—এইভাবেই দেবতাকে প্রিয় আর প্রিয়কে দেবতা বানিয়ে তুলেছি; এ আমাদের শাশ্বত খেলা। আর এই একটি খেলায় আমাদের ক্লান্তি

নেই। মহৎ মানুষকে দেবত্বদান সারা পৃথিবীর প্রাচীন জাতিগুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু স্বয়ং বাল্মীকি-সৃষ্ট রাম এ বিষয়ে কী বলছেন?

উত্তরকাণ্ডকে হিসেবের বাইরে রেখে যদি আমরা বাকি ছয় কাণ্ডের কথা মাথায় রাখি, তাহলে কিন্তু এক বিচিত্র উত্তর আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

আগেই আমরা দেখেছি—বাল্মীকিও রামের জন্মেতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবেই বলে দিয়েছেন—রাবণ-বধের জন্যই বিষ্ণু স্বয়ং ব্রহ্মা ও অপরাপর দেবতাদের অনুরোধে মানুষ হিসাবে জন্ম নিচ্ছেন। অর্থাৎ জন্মের পূর্বেই ঘোষিত হয়েছে তাঁর দেবত্ব, বা সঠিকভাবে বললে, তাঁর অবতারত্ব। কিন্তু অদ্ভুতভাবে, এর পর থেকে তাঁর মধ্যে আর ঐশ্বরিকভাবের বিন্দুমাত্র প্রকাশ দেখি না আমরা। দেখি একজন সাধারণ মানুষের বড় হয়ে-ওঠা—সাধারণ মানবিক বৃত্তিগুলির অসাধারণ বিকাশ—বীরত্ব, পিতৃমাতৃভক্তি, তাঁদের সেবা করা, প্রজাদের প্রতি ভালোবাসা, ভ্রাতাদের প্রতি স্নেহ, স্ত্রীর প্রতি প্রেম...

এর একটিও ঐশ্বরিক নয়। দেবতারা পিতামাতার সেবা করেন না, তাঁদের পরিবার থাকে না, পিতার প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্য রাজ্য বা রাজত্বত্যাগ করেন না। এসব মানবিক প্রবৃত্তি, যার পূর্ণতম, তুঙ্গতম প্রকাশ আমরা দেখতে পাব রামের মধ্যে। তবু বলব, এমন কিছু বিরল নয় এই গুণ! সর্বস্বান্ত হয়ে বাপের চিকিৎসা করানো ছেলে বা মেয়ে আজকের দিনেও একেবারে অমিল হয়নি। এর ভিত্তিতে তাঁকে আর যাই হোক, দেবতায় উত্তীর্ণ করা যায় না। তাড়কা-বধ বা মারীচ-বিতাড়ন তাঁর বীরত্বের পরিচায়ক। দেবত্বের নয়।

কিন্তু বনবাসের অন্তিম পর্ব থেকেই বদলে যেতে থাকে রামের চরিত্র। ক্রমে নিজেকে ছাপিয়ে ওঠেন তিনি, এবং তা মনুষ্য হিসাবেই। নিজের স্বার্থে বালীকে বধ করেন তিনি অন্তরাল থেকে; অন্যায় করেন। এবং কী আশ্চর্য, বাল্মীকি রামের হয়ে কোনও যুক্তি দিতে এগিয়ে আসেন না! রাম নিজের পক্ষে যে সব অজুহাত দিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করেন, তাও খুব টেকসই নয়। এবং আমরা আবার মনে মনে ভাবতে ভাবতে চলি—না হে! এ ঠিক ঠাকুর নয়। আমাদের মতোই, এমনিই মানুষ। সীতার বিরহে উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করেন তিনি। প্রিয়ার বিরহে কষ্ট পান আমাদের মতোই। আমরা ফের ভাবি—উহুঁ! এ তো মোটেই তেমন দেবতা নয় হে!

তারপর তিনিই সুগ্রীবকে রীতিমতো ভয় দেখিয়ে গড়ে তোলেন এক বিপুল সেনাবাহিনী। সমুদ্র পার হয়ে ঘিরে ফেলেন রাবণের দুর্ভেদ্য দুর্গ। দক্ষ সেনাপতি হিসেবে, রণোন্মাদ যোদ্ধা হিসেবে, মহাবীর হিসেবে, এবং সর্বোপরি একজন সার্থক অসমসাহসী নেতা হিসেবে এইবার দেখা দিলেন রাম—আবার বলি—উত্তর কোশল নামের এক ছোট্ট রাজ্যের বিতাড়িত রাজপুত্র। নিজেকে ছাপিয়ে উঠছেন তিনি ক্রমাগত। কতটা? যতটা উত্তীর্ণ হতে পারলে রাবণকেও সম্মুখযুদ্ধে, ন্যায়যুদ্ধে বধ করা যায়। কোন রাবণ? সেই রাবণ—যাঁর ভয়ে দেবতারা সন্ত্রস্ত, যাঁর ভয়ে সমুদ্র স্তিমিততরঙ্গ হয়ে যায়, বায়ু ধীরে প্রবাহিত হয়। সেই রাবণ—যিনি কৈলাসগিরিকে হাতের জোরে প্রকম্পিত করেছিলেন, যিনি যমের সদনে গিয়ে স্বয়ং মৃত্যুর দেবতাকেও পরাজিত করে যমলোক জয় করে এসেছেন। রাম সেই যমকে পরাজিত করা রাবণকেও পরাজিত করেছিলেন। কৃত্তিবাসের সেই অত্যন্ত বিখ্যাত পংক্তিগুলো মনে করুন :

শমনদমন রাবণরাজা
রাবণদমন রাম।
শমনভবন না হয় গমন
যে লয় রামের নাম।।

আজ্ঞে হ্যাঁ, বাল্মীকির রাম একজন সার্থক নায়ক। দোষে-গুণে, সাফল্যে-ব্যর্থতায় এমন একজন নায়ক—যাঁর আশ্চর্য কীর্তি, যাঁর অসামান্য উত্থানের কাহিনি আমাদের যুগ যুগ ধরে অনুপ্রাণিত করে এসেছে; বলে

গেছে—রাম যদি পারেন, তাহলে আমিও পারব। রাম আমাদের শিখিয়েছেন—সাহস করে, বুকে বল এনে নিজের ক্ষমতাকে ছাপিয়ে যেতে হয়। তবেই সাফল্য আসে। তখনই মানুষ নিজের জীবনের চাইতেও বড় হয়ে ওঠে। পুরুষ থেকে পরমপুরুষ হয়ে ওঠে। আমরা প্রত্যেকে সেই সম্ভাব্য পরমপুরুষ। শুধু ওই কলজেখানা চাই। ওই আত্মবিশ্বাস—যার জোরে তিনি সুগ্রীবকে অভিভূত করতে পারেন, লক্ষ্মণ বা হনুমানের সম্পূর্ণ আনুগত্য আদায় করে নিতে পারেন। তাহলেই আমরাও পারি আপাতদৃষ্টিতে যা অসম্ভব—তাকেও সম্ভব করে তুলতে। রাবণকে বধ করতে। প্রিয়াকে ফিরে পেতে। আর তার জন্য অবতার হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

প্রমাণ?

প্রমাণ বরং রাম নিজেই দিয়ে যান!

রাবণ মৃত। যুদ্ধ শেষ। সীতা ফিরে এসেছেন রামের সামনে। স্বামীর অকারণ কটূক্তিতে তিনি এতটাই ক্ষুব্ধ যে, লক্ষ্মণকে তিনি আদেশ দিলেন চিতা প্রস্তুত করতে—তাঁর আর জীবিত থাকার ইচ্ছা নেই। আগুন জ্বলে উঠল। সীতা সেই অগ্নিতে প্রবেশ করলেন।

হেনকালে সমস্ত দেবগণ একযোগে আবির্ভূত হয়ে রামকে বললেন, স্বয়ং সর্বজ্ঞ দেবতা হয়েও রাম নিষ্পাপ সীতাকে কীভাবে এমন অকরুণ বাক্য বলে অগ্নিদাহে সমর্পণ করতে পারেন?

এর উত্তরে রাম যা বলেছিলেন, তা এক অত্যাশ্চর্য সংলাপ; বিশ্বসাহিত্যে এর জুড়ি মেলা ভার।

> *'আত্মানং মানুষং মন্যে রামং দশরথাত্মজম*
> *সোহহং যশ্চ যতশ্চাহং ভগবাংস্তদ্ব্রবীতু মে।।'*

'আমি নিজেকে দশরথপুত্র রাম বলেই জানি। এবার আপনারাই বলুন—আমি কে?'

এই আশ্চর্য প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা রামের বিস্তর স্তুতি করেছিলেন, অক্ষয় অজর ব্রহ্ম, শার্ঙ্গধন্বা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু, ইত্যাদি ঢের ভালো ভালো কথা বলেছিলেন; এ-ও বলেছিলেন—রামের অন্ত দেবতারাও জানেন না।

কিন্তু এইসব স্তব রামকে যে খুব একটা প্রভাবিত করেছিল, তা তো মনে হয় না! তিনি একটু পরেই দশরথের কাছে বর চান—তিনি যেন কৈকেয়ী এবং ভরতকে ক্ষমা করে দেন। ইন্দ্রের কাছে বর চান—যুদ্ধে নিহত বানরেরা যেন প্রাণ ফিরে পায়। অর্থাৎ, আপন স্বরূপ জানতে পারার পরেও তাঁর আচরণ দেবোচিত নয়! নিতান্তই মনুষ্যোচিত! এবং ঘোর 'রামোচিত'-ও বটে; কারণ পূর্বের মতোই এখনও তিনি নিজের নয়, অন্যের জন্য ভিক্ষা চাইছেন দেবতা ও গুরুজনদের কাছে; একদিন যেমন পিতার করা প্রতিজ্ঞাবাক্য পালন করার জন্য তিনি গৃহত্যাগী হয়েছিলেন!

আর ঠিক এইভাবে তিনি থেকে যান—স্বেচ্ছায় থেকে যান—দশরথপুত্র রাম হয়েই। এইটুকুই তাঁর কাছে তাঁর নিজের পরিচয় হয়ে থেকে যায় আজীবন। মানুষ হয়েই তিনি সন্তুষ্ট, আমরাও। কারণ, মানুষই ভুল করে। ভুল করার অধিকার আছে তার। দেবতারা নির্ভুল যে! কিন্তু সেইজন্যই আমরা তাঁকে শুধু প্রণাম করি না। তাঁর কাহিনি থেকে শিক্ষা নিই। প্রাণিত হই। নিজেকে, নিজের সাধ্যকে অতিক্রম করে যাওয়ার সাধনায় মন দিই।

অবতার রামচন্দ্রকে পুজো করে, ভক্তিপুষ্পে আচ্ছন্ন করে ঠাকুরঘরে বন্দী করে দিলে তাই সেই অনন্যসাধারণ মানুষটির প্রতি অন্যায় করা হবে বোধহয়। তার চেয়ে ঢের ভালো হয় একবার বাল্মীকি-বিরচিত রামের জীবনকথাটা ভালো করে পড়ে দেখলে।

কারণ তা একটা অভিযাত্রাকে দেখায়। মানুষ থেকে পরমপুরুষ হয়ে-ওঠার যাত্রাপথের গল্প বলে তা। বলে—চেষ্টা করো, লড়ে যাও! অন্যকে দোষ দিয়ে, অজুহাত তৈরি করে লাভ নেই! তোমার সবটুকু দিয়ে লড়ে

যাও তোমার নিজস্ব যুদ্ধক্ষেত্রে। রাবণের সাধ্য কী, তোমাকে হারায়!

সর্বস্ব পণ করে যে যুদ্ধ করে, জয় তারই করায়ত্ব হয়। রামের যুগেও হত, আজও হয়।

রাম আমাদের পথ দেখাচ্ছেন যে! আজও!!

গ্রন্থফল

পুরোনোকালে সব বইয়ে একটা খাসা গ্রন্থফল থাকত। সেই চালির শেষে যেমন লেখা থাকত—এই বই পড়লে 'ইহলোকে সুখী, অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন।' বাল্মীকির রামায়ণেও আছে :

'ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
যঃ পঠেদ্রামচরিতং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।'

যে মানুষ এই পবিত্র, পাপনাশক, দ্বিতীয় বেদ-স্বরূপ রামকথা পড়েন, তিনি সকল পাপ থেকে মুক্তি পান।

'বাল্মীকির রামায়ণে নেই' বইটা পড়ারও একটা ফল আছে। এই বই যে-কোনও গল্প শুনেই 'ও মা, তাই নাকি!' বলে গালে হাত দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকার হাত থেকে বাঁচায়। তার বদলে প্রশ্ন করতে বলে—'এসব কোথায় আছে? কোন বইতে?' 'ছোটমামার আপন ভায়রাভাইয়ের মেজো শালার এক বন্ধু নিজে আমাকে বলেছে'—এই জাতীয় উৎসের হাত থেকে উদ্ধার করে।

এইবার, সেই সূত্রে আপনি যদি আমাকেও সন্দেহ করতে আরম্ভ করেন, এবং সেই সন্দেহের বশে পড়ে ফেলেন সেই সব মূল গ্রন্থ—যাদের কথা আমি উল্লেখ করেছি...

হেঁ হেঁ...তাহলেই এই গ্রন্থের গ্রন্থকার তাঁর নিজের গ্রন্থফলটি লাভ করবে আর কি।